ঔপনিবেশিক বাংলায় ছোট শহরে মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ ও দূষিত 'জল সঞ্চালন' পরিকাঠামো ও পৌর নাগরিকতায় তার প্রভাব: ১৮৭২ – ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলা অনুষদ) পিএইচ. ডি উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত গবেষণা নিবন্ধ

মালিনী সিদ্ধান্ত

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অনুরাধা রায়

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

Certificate

Certified that the thesis entitled "ঔপনিবেশিক বাংলায় ছোটো শহরে মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ ও দূষিত 'জল-সঞ্চালন' পরিকাঠামো ও পৌর নাগরিকতায় তার প্রভাব, ১৮৭২-১৯০৭" submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts (History) at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Prof. Anuradha Roy, professor, Department of History, Jadavpur University.

Neither this thesis, nor any part of it has been submitted before, for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Malini Siddhanta

Date of Registration: 14.7.14

Countersigned

Prof. Anuradha Roy

Supervisor

Professor

Department of History

Jadavpur University

Kolkata-700032

প্রাক্-কথন

স্নাতক এবং বিশেষত স্নাতকোত্তর স্তরে নাগরিকতার বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে আগ্রহ জাগে। স্নাতকোত্তর স্তরে আধুনিক ভারতের সামাজিক ইতিহাস পড়তে গিয়ে এবং এর পাশাপাশি পাশ্চাত্ত্যের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখি, ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে ভারতে নাগরিকতার ধরন বেশ বিচিত্র এবং জটিল। নাগরিকতার বিভিন্ন রূপ নিয়ে বহু আলোচনা হলেও দেখি মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে নিত্যদিনের কিছু শহুরে অভ্যাস এবং তার সঙ্গে শহরবাসীর অভিযোজিত হওয়ার মাধ্যমে নাগরিকতার এক নতুন রূপ, 'পৌর নাগরিকতা' যে ভাবে প্রকাশিত হল, তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। অন্য দিকে, 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা' নির্মাণের বিভিন্ন প্রকল্পে দেশীয় নাগরিকদের মতামত-দাবিদাওয়ার একটা ছাপ থেকে গিয়েছিল এবং তাঁরা নিজেরাও এই প্রক্রিয়ার অংশীদার হয়ে উঠছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির কার্যক্রমের মধ্যে এই বিষয়টি বেশ পরিষ্কার। গবেষণায় এই বিষয়টি বিশদে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সমগ্র বিষয়টি, অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি এবং মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক 'পৌর নাগরিকতা' যে সমরূপী ছিল না, এই বিষয়টি বোঝাতে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার সদর শহরকে চয়ন করা হয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষার বিষয় হিসেবে। মূলত মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশনের পরিষেবার মাধ্যমে সমগ্র বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেছি। কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শহর জুড়ে জলের সুষ্ঠু সঞ্চালন ঔপনিবেশিকদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, ফলে মিউনিসিপ্যালিটির কার্যাবলীতেও জলের ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। আরও কিছু জেলার সদর শহরের মিউনিসিপ্যালিটির কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করলে হয়ত বিষয়টি আরও পূর্ণতা পেত। ছাপার ভুলসহ একাধিক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থেকে গিয়েছে, যার জন্য গবেষক অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি পরে এই কাজ পূর্ণতর রূপ লাভ করবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরিচিত বহুজনের থিসিসের 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' মুগ্ধ চিত্তে পড়েছি, কিন্তু সত্যি বলতে আমার এই গবেষণা আদৌ কৃতজ্ঞতা স্বীকার লেখার পর্যায় পৌঁছবে কি না এই বিষয়ে বরাবর সন্দিহান ছিলাম।

এই গবেষণা এবং গবেষক যাঁর কাছে চির ঋণে আবদ্ধ, তিনি হলেন গবেষণার পথ প্রদর্শক অধ্যাপক অনুরাধা রায়। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরেই যাঁর ক্লাস নাগরিকতাকে বিভিন্ন ভাবে বোঝার আগ্রহকে উস্কে দিয়েছিল। এই গবেষণায় তাঁর স্নেহের পরশ এবং পরামর্শের ছাপ সর্বত্র। ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন সংকটকালে গবেষণার প্রতি রীতিমত অযত্ন যিনি ধৈর্য্য ধরে সহ্য করেছেন, আবার কোনও এক অজানা চুম্বকের সাহায্যে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছেন। শুধু এইটুকু বললে অবশ্য অনুরাধাদি সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। আর এই গবেষণা এবং গবেষকের জীবনকে উনি যে ভাবে প্রভাবিত করেছেন, তা ঠিক সমস্তটা ভাষায় প্রকাশ করার মতোও নয়। শুধু বিনম্র চিত্রে এই শিক্ষিকাকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই।

নাগরিকতার বিবিধ রূপ এবং শহরের ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহ তৈরি হয়েছিল, আর এক শিক্ষকের সাহচর্যে। তিনি হলেন ডঃ সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অধ্যাপক হিমাদ্রিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়শই গবেষণার গতিবিধি বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন এবং নিজের সুচিন্তিত মতামত জানিয়েছেন, তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষককেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ, কখনও না কখনও কিছু না কিছু তাঁদের থেকে শিখেছি। এখনও শিখে চলেছি।

গবেষোণার বিষয়টিকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিতে, বলা ভাল ছোট শহরের নাগরিকতার ধরন বোঝার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন ডঃ ঋতজ্যোতি

বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্কাইভের ব্যবহার অত্যন্ত যত্ন এবং সতর্কতার সঙ্গে শিখিয়েছিলেন তিনি। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে ইতিহাসের 'Discourse' এবং বহুমাত্রিক জটিল রূপ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন আমার এই অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ও শিক্ষক। তাকেও সর্বান্তঃকরণে আমার কৃতজ্ঞতা।

এর পরেই বলতে হয় অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। অভিজিৎ-এর নিরন্তর প্রায় কাবুলিওয়ালাদের মতো তাগাদা না থাকলে হয়তো গবেষণার কাজ সময়ে শেষ করা সম্ভব হত না। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে কী ভাবে গবেষণাটিতে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেই বিষয়েও সুচিন্তিত মতামত দিয়েছে অভিজিৎ। অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অভিজিৎ সাধুখাঁ, অধ্যাপিকা শাশ্বতী রায়-এর সঙ্গে একত্রে পড়াশোনা ও তার বাইরে নির্ভেজাল আড্ডা-খাওয়াদাওয়ার প্রভাবও হয়তো গবেষণাটিতে আছে। অধ্যাপক মুক্তিপদ সিন্‌হা গবেষণার নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতিগত জটিলতা কাটাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন এবং নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন। তাঁকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইতিহাস বিষয়টিকে তার উৎসগত এবং মৌলিক রহস্য নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিলেন অধ্যাপক অনীক সামন্ত। গবেষণার বিভিন্ন পর্বে একাধিক ভাবনা ধার দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। শব্দের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে ইতিহাসের ক্রমপর্যায়কেও ধরা যায়, এই শিক্ষাও তাঁর থেকেই পাওয়া।

গবেষণাটি যেহেতু মূলত আর্কাইভের নথি নির্ভর। তাই ভবানী দত্ত লেনের WEST BENGAL STATE ARCHIVES-এ একটা দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়েছে। এখানকার দুই সংলেখ্যাগারিক বিদিশা দত্ত এবং শর্মিষ্ঠা রায় বিভিন্ন ফাইল খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন। বিষয় অনুযায়ী যথাযথ ফাইল পেতে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। এঁদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থগারিক বনানী রায়কে। এ ছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক-সহ অন্য সব গ্রন্থগারিককে কৃতজ্ঞতা ।

বিগত পাঁচ বছরের চাকরি জীবনে গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১ এবং লেডি ব্র্যাব্রোর্ন কলেজে শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছি। এই দুই কলেজের সহকর্মীদের বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই। দুই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অকুণ্ঠ ভালবাসার ঋণ অবশ্য ধন্যবাদ জানানোর ঊর্ধ্বে।

এর পর পরিবারের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানানোর পালা। তাঁদের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদজ্ঞাপনটা খুব ক্লিশে শোনায়। বাবার (ডঃ উজ্জ্বল কুমার সিদ্ধান্ত) প্রশ্রয়েই নিজের ইচ্ছে মতো বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছি। আর মায়ের (শ্রীমতী ইন্দ্রাণী সিদ্ধান্ত) থেকে একনিষ্ঠ কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প যে কোনও কিছু হয় না, সেই পাঠ পেয়েছি। পিসিমণি (ডঃ অলকা সিদ্ধান্ত) পরিবারের প্রথম পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপক। তাই এই দৃষ্টান্ত বরাবর অনুপ্রেরণার কাজ করেছে। আর আমার দিদিমা (আম্মা) শ্রীমতী দীপালি মুখোপাধ্যায়ের কথাও বলতে হয়। আমার প্রতি যাঁর ছিল বরাবরের প্রশ্রয়। তিনি জীবিত থাকলে ভীষণ আনন্দিত হতেন। কারণ নিজে মেধাবী ছাত্রী হয়েও তিনি পারিবারিক ও সামাজিক কারণে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাননি। আমার আরও দুই মা-বাবা শ্রীমতী সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও বিশেষ ভাবে বলতে হয়। পড়াশোনার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁদের একমাত্র নাতনিকে প্রতিপালন-সহ যাবতীয় সাংসারিক দায়দায়িত্ব তারা হাসিমুখে পালন করেছেন। অধীর আগ্রহে চেয়ে থেকেছেন এই গবেষণার সমাপ্তির দিকে। একাধিক বার গবেষণাটির বানানের ত্রুটি শুধরে দিয়েছেন। গবেষণার শুরুর দিন থেকে শেষ অবধি ঋতপ্রভ বন্দ্যোপাধ্যায় যে একই রকম ভাবে সঙ্গে ছিলেন, এ কথা না বললেই নয়। ঋতপ্রভ ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলে কম্পিউটারে গবেষকের অতিশয় সীমিত জ্ঞানের কারণে বহু লেখা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেত। এ ছাড়া

গবেষণা সন্দর্ভটি তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পড়ে, বিভিন্ন বানান ও অন্যান্য ত্রুটি সংশোধন করতে সাহায্য করেছেন। আমার বোন সোহিনী, সব সময় নিজের থেকে বেশি বিশ্বাস রেখেছে আমার ওপর। আমার ক্ষমতার প্রতি তার অমূলক অন্ধবিশ্বাস আমায় বাধ্য করেছে একাগ্র চিত্তে এই গবেষণা সমাপ্ত করতে। এরপর জীবনে নবাগতদের পালা। অভিজ্ঞান আমার জীবনের পরশপাথর স্বরূপ। তার নিষ্পাপ আঁকড়ে ধরা, নিশ্চুপ চাউনি আমাকে বহু বাধা কাটিয়ে ওঠার প্রেরণা জুগিয়েছে। এরপর বাকি থাকে ঋতি। ঋতির কথা কী-ই বা বলব, সে আমার ‘কান্না-হাসির ফোড়নদার’। এক সঙ্গে এখনও বহু পথ চলা বাকি।

অধ্যায় সূচি

প্রাক্‌কথন		I
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		II-V
ভূমিকা		১-২৫
প্রথম অধ্যায়	ইউরোপে স্বাস্থ্যরক্ষার উদারনৈতিক বিধানের সূচনা: নাগরিক প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণের পথ	২৬-৮১
দ্বিতীয় অধ্যায়	উপনিবেশের প্রতিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিধান	৮২-১০৯
তৃতীয় অধ্যায়	দক্ষিণবঙ্গের ছোটো শহরের নাগরিকতা ও মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ: কলকাতার প্রতিতুলনায় বর্ধমান ও বহরমপুর	১১০-১৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	শহরের জল সঞ্চালনে দূষিত জল নিষ্কাশন: কলকাতার প্রতিতুলনায় কৃষ্ণনগর	১৬০-১৯১
পঞ্চম অধ্যায়	উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি শহর দার্জিলিংসঞ্চালন এর জল-: যেখানে জল প্রবল বেগে নিম্নমুখী	১৯২-২৩৪
উপসংহার		২৩৫-২৫১
গ্রন্থপঞ্জি		২৫২-২৬০

ভূমিকা

"The Primary need of city-life is sanitation. Cities are far more crowded than rural areas and this very fact demands organization of special measures of sanitation. The city-government may plan these measure but no city-government can carry out effective measures of public hygiene in a large and crowded city unless and until individual householders of it actively and religiously co-operate with the agencies of the Corporation in the execution of these plans. This co-operation can never be forced. It must be voluntary to be effective."[1]

---Bipin Chandra Pal

বিপিন চন্দ্র পাল, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ অবধি Inspector of License হিসেবে কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি করেন। এই সময় তাঁর মতো চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাকেও 'Civics and Civic Idealism', 'Citizen and City Government' ইত্যাদি বিষয়ে সরব হতে দেখি। 'The Calcutta Municipal Gazette'-এ তিনি এই বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। 'Civic and Spiritual life'-এর মেলবন্ধনের ধারণাও দেখা যায় তাঁর লেখায়। সিলেট থেকে আগত বিপিন চন্দ্র পালের মতো জাতীয়তাবাদী নেতার পক্ষে ব্রিটিশদের তৈরি কলকাতা শহরে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া নেহাত সরল ছিল না। সেই শহরের শহুরে নাগরিক হয়ে ওঠার পথে কলকাতা কর্পোরেশনের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্ব-পরিচালনার কর্মসূচীতে তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে একাত্ম হওয়ার প্রস্তুতি উল্লেখের দাবি রাখে।

[1] Bipin Chandra Pal, The Calcutta Municipal Gazette, Ed. By Arun Kumar Roy, Information & public Relation Department Kolkata Municipal Corporation, Kolkata, 2010, page-23

শহরে বসবাসের একাধিক পূর্বশর্তের মধ্যে বিপিন চন্দ্র পাল সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন শহরের ‘sanitation’ বজায় রাখার ওপর।

শহরের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ‘sanitation’-এর ধারণার বিশেষ প্রয়োগ

‘sanitation’ শব্দটি ইংরেজি ভাষায় বেশ নবাগত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই শব্দটির প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটে।[2] অক্সফোর্ড ডিক্সেনারি অনুযায়ী ‘sanitation’ শব্দের অর্থ হল "Conditions relating to public health, especially the provision of clean drinking water and adequate sewage disposal."[3] ইংরেজি ভাষায় ‘sanitation’ শব্দটির নবাগমন একটি প্রায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। উনিশ শতক থেকেই ইংল্যান্ডে Edwin Chadwick-এর নেতৃত্বে ‘sanitation’ ক্রমশ একটি আন্দোলনের রূপ পায়। শিল্প-বিপ্লব, শহরের জন-সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, প্রভৃতি আরও নানান কারণ অবশ্য আগে থেকেই একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। শহরের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ‘Sanitation’ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। শহরের নান্দনিক সৌষ্ঠব, জল-আলো-বাতাসের সুষ্ঠু পরিচালনা, শহরে বিভিন্ন পরিষেবার পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সার্বিকভাবে এগুলি পরিচালনার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডের এক্তিয়ার নতুন ভাবে নির্ণিত হয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ধারণা সমস্ত ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিবর্তনের পথ পেরিয়ে ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণিকেন্দ্রিক সামাজিক চিকিৎসার রূপ প্রাপ্ত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা কেবল রোগীর ব্যক্তিগত রোগের উপসম নয়, বরং স্বাস্থ্যরক্ষাকে ক্রমশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণা থেকে সামগ্রিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হতে থাকে। সামাজিক চিকিৎসার ধারণায় শহরে বাতাস, আলো এবং জলের অবাধ সঞ্চালনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়।[4] শহর পরিচালনার

---

[2] languages.oup.com

[3] Ibid

[4] Michel Foucault, *Power: Essential Works Of Foucault 1954-1984,* The Birth Of Social Medicine, Penguin, UK,P-149

ভার অর্পিত হয় মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপর। মধ্যযুগের ইউরোপে শহর পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত মিউনিসিপ্যালিটির ওপরেই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শহরের সার্বিক স্বাস্থ্যরক্ষার ভার অর্পিত হয়।[5]

সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রক্রিয়া গড়ে ওঠার পথে ইংল্যান্ডের এই ব্যবস্থা 'জনহিতকর' কর্মকাণ্ড, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যবস্থার এক মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিল। শহরগুলিতে সুস্বাস্থ্যের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা--- সব মিলিয়ে সামাজিক চিকিৎসা আর শুধুমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় থাকে না। এর মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে। চিকিৎসকদের পাশাপাশি প্রযুক্তিবিদরাও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এর সঙ্গে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। সুতরাং সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদে শহরগুলির ব্যবস্থাপনার কিছু পরিবর্তন এবং নাগরিক অভ্যেস বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

এই সময় থেকে ইংল্যান্ডের শহরগুলি জনপরিসরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে থাকে। সামাজিক চিকিৎসার বিকাশ, শহরের বাতাবরণ পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে শহর পরিচালনার 'কর্তৃপক্ষ' ও তার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া 'নাগরিকত্ব' উদারনীতির স্বাধীন চলাচলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। শহরগুলি উদারনীতির চলন এবং তার পূর্বশর্ত নির্মাণের বাস্তব রূপ হয়ে উঠল।[6] উদারনীতিবাদ ফলপ্রসূ হয়ে ওঠার জন্য তথ্য, বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যবস্থার স্বাধীন চলাচলের প্রয়োজন ছিল, যাতে 'সাবজেক্ট'-রা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে 'স্বনিয়ন্ত্রিত' বলে নিজেদের মনে করতে পারে। শহরকে উদারনীতির সচল কক্ষপথ হিসেবে বেছে নেওয়া হল; কারণ পশ্চাৎপদতার বিপ্রতীপে অগ্রগতির তত্ত্বটি এর সঙ্গে বেশ খাপ খায়।

---

[5] Henri Pirenne, '*Economic And Social History Of Medieval Europe*', Routledge, London1936, Page-202

[6] Patrick Joyce, *The Rule of freedom Liberalism and the Modern City*, Verso, UK, 2003, Page-14

এই সময়ে শহরগুলিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে ‘দেহ’ হিসেবে দেখা হতে থাকে। এই ভাবে শহরকে ঘিরে এক ধরনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা মেলবন্ধন ঘটে দেহগত চিন্তায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তরফ থেকে শহরের দেহের মধ্যে ক্রমাগত তরল পদার্থের সঞ্চালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রকারান্তরে এটি উদারনীতিবাদ প্রসূত ‘স্বাধীন চলাচল’-এর ধারণার সঙ্গেও মিলে যায়।

Patrick Joyce(প্যাট্রিক জয়েস) উদারনীতিবাদের বাস্তব চলনের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন উদারনীতিবাদ ঠিক প্রত্যক্ষ বা এলোমেলো পরিচালনায় বিশ্বাসী নয়, তা বরং অপ্রত্যক্ষ--স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়, অথচ জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যতাকেই সে তার সঞ্চারপথ হিসেবে বেছে নেয়। ধরা যাক ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে বাড়িতে জল সরবরাহের কথা। স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ বিচরণে আপাতভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির এই বিন্যাসের কোনও যোগাযোগ নেই। অথচ, বস্তুগত এই প্রাযুক্তিক পরিকাঠামো ‘সামাজিক অবস্থা’-র নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। উদারনীতিবাদ প্রসূত ব্যক্তির বা বস্তুর স্বাধীন চলাচল কতটা ‘স্বাধীন’ আর কতটা অদৃশ্যভাবে ‘নিয়ন্ত্রিত’ সেই নিয়ে ভাবনার অবকাশ থেকে যায়। জল সরবরাহ ও অন্যান্য স্যানিটেশনের ব্যবস্থা ‘সামাজিক ব্যবস্থা’-র মধ্যে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থার থেকেও ক্রমশ হয়ে ওঠে ‘সামাজিক ব্যবস্থা’-কে বোঝার সমরূপক। প্রকৃতি এবং পরিবেশ, জীব জগৎ এবং জড় জগৎ-এর মধ্যে এমন একটা সমন্বয়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় যা মানুষকে ‘normal behave’ করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে অবশ্য, ‘সামাজিক’-কে নিয়ন্ত্রণ করার এই ‘প্রাকৃতিক’ (প্রাযুক্তিক?) ব্যবস্থাগুলিকে ‘স্বাভাবিক’ হিসেবে প্রতিভাত করার কাজটি নেহাত সহজ ছিল না।

এক্ষেত্রে দু’টি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিকে ব্যক্তিগত পরিসরে অদৃশ্য নজরদারি বজায় রেখে ব্যক্তির অজান্তেই ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্যদিকে, উদারনীতিবাদের

‘স্বাধীন’ সঞ্চালনের বাতাবরণটি বজায় রাখা। মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটি এই দায়িত্ব পায়।

রোগ মোকাবিলা করার ওজরে শহরকে ক্রমশ বহমান, জঙ্গম এবং সঞ্চালনের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হতে থাকে। তরল পদার্থের প্রবহমানতার সঙ্গে শহরের ‘দেহ’ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়। শহরের স্যানিটেশনকে ঘিরে ‘হাইড্রলিক সিটি’-র ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশ আর প্রতিবেশ কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের নজরে আলাদা কোনও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে না, বরং সামগ্রিক প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হয়ে ওঠে। সঞ্চালনের মাধ্যম হিসেবে ড্রেন, জলের পাইপ এবং বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রগুলি খুব গুরুত্ব পায়। তাই মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং দূষিত জল নিষ্কাশনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

স্বদেশে প্রযুক্ত হওয়ার পর, এবারে উপনিবেশে প্রয়োগের পালা। ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বিস্তৃত দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে পরিবেশ এবং প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণ বেশ দুরূহ এবং জটিল। এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি ইউরোপের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এমনকি ভারতের ভিতরেও বিভিন্ন জায়গার ভৌগোলিক অবস্থা বিভিন্ন রকম। ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে এখানে রোগের ধরনও অন্যরকম। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে এখানে জলের মুক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করার কাজ ইউরোপের থেকে বেশ অন্যরকম। এছাড়া এই ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত আছে আরও একাধিক বিষয়। উপনিবেশের প্রতি ঔপনিবেশিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে এর রদবদল, এছাড়া পরিস্থিতি-উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা। প্রকল্পগুলি নির্মাণের পরে তার সঙ্গে দেশীয় জনতার গ্রহণ-বর্জন-মানিয়ে নেওয়াও বেশ একটি দীর্ঘ জটিল প্রক্রিয়া।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতির স্বার্থে শহরের প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণ, বিভিন্ন পরিষেবার প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং দূষিত জল নিষ্কাশনের পরিচালনার ভার মিউনিসিপ্যালিটির ওপর ন্যস্ত হয়। ঔপনিবেশিক নগরের ইতিহাসে সংযোজিত হয় একটি নতুন অধ্যায়। পরিবর্তন আসে মিউনিসিপ্যালিটির বাসিন্দা শহরবাসীদের নাগরিকতার ধরনেও। পরিষেবার অভ্যেসে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে থাকে শহরবাসী। পরিষেবার প্রকল্পগুলি পরিচালনার সঙ্গেও একাত্ম হয়ে উঠতে থাকে তারা। মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় এক নতুন নাগরিক সচেতনতা। রাজনৈতিক নাগরিকতা বা Civil Citizenship - এর পাশাপাশি গড়ে ওঠে মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক 'পৌর নাগরিকতা'। এই গবেষণায় বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং দূষিত জল নিষ্কাশনের পরিকাঠামো নির্মাণ ও মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে এর পরিচালনার মাধ্যমে কীভাবে এই 'পৌর নাগরিকতা' গড়ে উঠল তা দেখানোর চেষ্টা করা হবে। 'পৌর নাগরিকতা' গড়ে ওঠার জটিল, বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময় সঞ্চারপথ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার সদর শহর এবং উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং শহরটির জল সরবরাহ প্রকল্প ও ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাসের ইতিহাসের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা হবে ।

পৌর নাগরিকতা গড়ে ওঠার বিস্তৃত সঞ্চারপথ

মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ড নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির নাগরিকদের অভিযোগ এবং মতামতের অন্ত নেই। আজও আমরা যদি সংবাদপত্রের চিঠিপত্রের বিভাগটি ভালো করে লক্ষ করি, তাহলে দেখব হয় জলের ঘাটতি, বা নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়া নিয়ে একাধিক চিঠি। এই অভিযোগগুলিকে কিন্তু আমরা মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার সঙ্গে একাত্মতার নজির হিসেবেও দেখতে পারি। আর এই পরিষেবাগুলি গড়ে ওঠার আদিপর্বে এর সঙ্গে শহরবাসীর গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার ইতিহাস আলোচনা করলে 'পৌর নাগরিকতা'-র বিশিষ্ট বিন্যাস এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

আবার বিপিন চন্দ্র পালের মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত লেখালেখির কথাতেই ফিরে যাওয়া যাক। ১৯২৭-১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে 'The Calcutta Municipal Gazette'-এ লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। আমাদের আলোচনার সময়কাল অবশ্য এর প্রায় দুই দশক আগে, পরিষেবার পরিকাঠামো নির্মাণ প্রক্রিয়া অবধি। কিন্তু এর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়া পৌর নাগরিকের মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা নেহাত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিপিন চন্দ্র পাল একদম গোড়া থেকে মিউনিসিপ্যালিটির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য বিপিন চন্দ্র পালের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শের কথাও মাথায় রাখা উচিত। কারণ খুব স্বাভাবিক ভাবেই এর ঊর্ধ্বে তিনি উঠতে পারেননি। চরমপন্থী ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী বিপিন চন্দ্র পাল খুব স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতার মিউনিসিপ্যাল পরিষেবাকে সম্পূর্ণ ব্রিটিশদের মস্তিষ্কপ্রসূত বলে মানতে চাননি। এর একটা ভারতীয় শিকড় খোঁজার চেষ্টা করেছেন। আবার একই সঙ্গে শহর যে প্রচলিত গ্রামজীবনের থেকে আলাদা, তাই এখানে বসবাসের ক্ষেত্রে যে অন্যরকম নিয়ম মেনে চলতে হবে, এই প্রয়োজনীয়তার তাগিদ থেকে মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত লেখাগুলির অবতারণা। এর সঙ্গে আবার একটা পর্যায়ে তিনি আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গও অবতারণা করেছেন।

বিপিন চন্দ্র পাল বলেন গ্রামীণ জীবনযাপনের আদর্শ, নিয়মনীতি অবশ্যম্ভাবী ভাবে শহরের থেকে আলাদা। শহর গ্রামের থেকে অনেক বেশি ঘিঞ্জি। শহরে বহু জায়গার বহুরকমের লোকের বসবাস। তাদের জীবনযাত্রার ধরনও বিভিন্ন রকম। বিবিধের এই সমাবেশের জন্যই শহুরে জীবনযাপন পরিচালনার জন্য শহরে সুপরিকল্পিত শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো প্রয়োজন হয়। এর পাশাপাশি অবশ্য সুষ্ঠু নাগরিক জীবনযাপনের জন্য নাগরিকদের তরফ থেকেও কিছু নাগরিক অভ্যেস বা 'civic sense' গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।[7] বিষয়টি ভেবে দেখার মত। কলকাতা শহরের মতো সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সৃষ্ট শহরে বসবাসের খাতিরে

[7] Ibid, page-16

নাগরিক জীবনকে বিশেষ ধরণের শাসনতান্ত্রিক নিগড়ে বাঁধা এবং এই শাসনতান্ত্রিক বিধানের পাশাপাশি কিছু নাগরিক অভ্যেস রপ্ত করার কথা বলেন তিনি। গ্রাম জীবনের থেকে শহুরে জীবন যে কিছু নাগরিক অভ্যেস এবং শাসনতান্ত্রিক বিধানের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে গেছে, একথা অনস্বীকার্য। সুতরাং শহরবাসীদের নাগরিকত্বে কিছু 'পৌর অভ্যেস'-জনিত স্বাতন্ত্র্যের সূচনা হয়েছিল, একথা বলাই যায়। 'পৌর নাগরিকতা' বিকাশের দ্যোতক হিসেবে একে ধরলে ভুল হবে না।

বিপিন চন্দ্র পাল অবশ্য শহুরে নাগরিকদের মধ্যে পৌর অভ্যেস বা 'civic sense' গড়ে ওঠার ধরন নিয়ে বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এও হয়ত 'পৌর নাগরিক' সচেতনতা গড়ে ওঠার একটি পর্যায়, যেখানে পৌর নাগরিকদের মধ্যে থেকেই এর সম্ভাব্য 'সঠিক' বিকাশ সম্বন্ধে নানারকম মতামত উঠে আসছে।

বিপিন চন্দ্র বলেন, "The new municipal legislation have created very definite municipal rights and has vested the ultimate authority in the administration of our cities more or less entirely upon the rate-payers. There is a growing concern among the more intelligent or cunning of our rate-payers of their rights, but, frankly speaking, these have not as yet developed a corresponding sense of the serious responsibilities which these rights carry with them." [8] সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবাগুলির ভোক্তা হয়ে ওঠার পাশাপাশি কিছু নাগরিক সচেতনতা গড়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

[8] Ibid,page-17

সার্বিক ভাবে এই বোধের বিকাশের জন্য তিনি আরও বিস্তারিত আলোচনায় যান। তিনি সামগ্রিক শহরের প্রেক্ষিতে নাগরিকের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শহরকে দেহের সঙ্গে তুলনা করেন।

বিপিন চন্দ্র বলেন, "The City must be looked upon as one body, the different families and homes comprised within it being limbs and organs of this city organism, and every citizen must be made to realise it that whatever affects a single home in the city is likely to affect all the other homes as well. The consciousness that my health and happiness depend upon the health and happiness of my neighbours as much as their health and happiness depend upon mine, must create a sense of organic kinship between me and them."

এখানে দু'টি বিষয় লক্ষ করার মতো। প্রথমত, শহরকে একটি জীবিত দেহ-এর সঙ্গে তুলনা করা। এই প্রবণতা ইউরোপেও ছিল। প্যাট্রিক জয়েস দেখিয়েছেন উদারনীতিবাদ প্রসূত স্বাধীন চলাচলের তত্ত্বের সঙ্গে, শহরকে একটি দেহ হিসেবে কল্পনা করে একে স্বাধীন চলাচলের কক্ষপথ হিসেবে কল্পনা করার ইতিবৃত্ত। বিপিন চন্দ্র পালের লেখাতেও শহরকে অবিচ্ছিন্ন একটি দেহ হিসেবে দেখার প্রয়াস লক্ষ করা গেল। দ্বিতীয়ত, বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর লেখায় শহরের অধিবাসী সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করেন। তা হল 'organic kinship' তৈরির ধারণা। তিনি বিশেষত কলকাতার মতো নতুন তৈরি হওয়া শহরের বাসিন্দাদের ধরন আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, যে এই শহরের বাসিন্দারা সকলেই নবাগত। গ্রামে কৃষিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের বসবাস। যেখানে আত্মীয়তার বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ়। আর প্রজন্ম পরম্পরায় এখানে বসবাস করতে করতে নিজেদের অজান্তেই গ্রামের সঙ্গে

তৈরি হয়েছে মানসিক একাত্মতা।[9] পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বসবাসের দীর্ঘদিনের প্রথা তৈরি হয়ে আছে, যা সামগ্রিক ভাবে পরিবেশ এবং প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। শহরে এই রকম স্বাভাবিক আত্মীয়তার বন্ধন না থাকাতে সচেতন ভাবে 'organic kinship' গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি।

কিন্তু শহরগুলির স্বশাসন বা শহরে বসবাসের 'civic sense' এর ভিত্তি যে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক, একথা সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নিতে কোথায় যেন একটা দ্বিধা কাজ করেছে বিপিন চন্দ্র পালের জাতীয়তাবাদী চরমপন্থার সত্তায়। তিনি বলেছেন মেগাস্থিনিসের পাটলিপুত্র বর্ণনায় শহর পরিচালনার সংগঠনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এছাড়া অন্যান্য গ্রন্থেও 'পৌর'-র উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের এই সংগঠনগুলির থেকে ভারত একেবারেই বিচ্যুত হয়ে গেছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবার James Mill(জেমস মিল) বর্ণিত জাতীয়তাবাদীদের অত্যন্ত পছন্দের 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ'-এর তত্ত্বের অবতারণা।

মিল বলেন, "In this general process of decadence and the breakdown of our ancient life and institution, all our ideals were either completely lost or overwhelmed by un-understood and un-appreciated forms and formularies of medieval socio-religious instititions and practices."[10]

শহরে তৈরি হওয়া নতুন প্রতিবেশিত্বের ধারণা যাকে বিপিন চন্দ্র পাল 'organic kinship' বলেছেন, এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটতে পারে আধ্যাত্মিককতার বাতাবরণে---এরকম মতামতও তিনি দেন। বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে ব্যক্তি মানবের একাত্মতার যোগসূত্রেই তো আধ্যাত্মিকতার সূচনা। সচেতন প্রয়াসে জাগতিক দুনিয়া এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের মাঝে নিজেকে হারিয়ে

[9] Ibid,page-18

[10] Ibid,page-16

ফেলাতেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ। এই আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমেই তাই সামাজিক সম্পর্ক বিন্যাসের চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভব।[11] গ্রামের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক বিন্যাসের এই চেতনা দীর্ঘদিনের একত্র বসবাসের ফলে প্রজন্ম পরম্পরায় অসচেতন ভাবেই চলে আসছে। কিন্তু সরল গ্রামীণ জীবনযাপনের থেকে জটিল শহুরে জীবন সামাজিক বিবর্তনের একটি জটিল পর্যায়কেই চিহ্নিত করে। আর এখানেই ক্রমশ জড়িয়ে যায় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ , আত্ম-বিন্যাসের প্রসঙ্গ।

বিপিন চন্দ্র পাল বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "The City-life is admittedly artificial as the rural life obviously natural. But the natural life is unconscious life. Artificial life is more or less conscious life. And the city-life being generally a conscious life and, therefore, more or less self-regulated and self-organised, it offers certainly much greater help to the development of man's higher or spiritual life than the social life in the village. To make the highest possible use of the opportunities of the city-life, we have to organise it, regulate it, build it up with our conscious and considered effort, so that the city where we live may be – within the inevitable limitations of its natural or physiographical conditions of heat and moist and of the social traditions and mental habits of the citizens— a perfect embodiment of the dream of our poets and the thought of our philosophers."

[11] Ibid,page-688

সুতরাং শহরে বসবাসের ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-বিন্যাসের একটা অনুষঙ্গ থেকে যাচ্ছে, বিপিন চন্দ্র পালের লেখায় তা বেশ পরিষ্কার। এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-বিন্যাস ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে আদৌ সম্ভবপর ছিল কি না, এই নিয়ে ঈশিতা পাণ্ডে, জ্ঞান প্রকাশ এবং পার্থ চ্যাটার্জির একটি বিতর্ক আছে, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেখানে ঈশিতা পাণ্ডে দেখাচ্ছেন অন্তত 'sanitation' রক্ষা এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আত্ম-জ্ঞান, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-বিন্যাস ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলেই প্রতিফলিত হয়েছিল। বিপিন চন্দ্র পালের লেখাতেও আমরা এই জাতীয় বক্তব্য পাচ্ছি।   সচেতন প্রয়াসে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-বিন্যাসের মাধ্যমে সামাজিকের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রয়াস এবং নাগরিক জীবনের প্রাথমিক চাহিদা 'sanitation' বজায় রাখার দাবি প্রকারান্তরে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার ভোক্তা শহরবাসীর নাগরিক অভিধায় এক বিশেষ পর্যায়কেই চিহ্নিত করছে। বিপিন চন্দ্র পালের শহরে বসবাসের এই বিশেষ 'সচেতন' 'আত্ম-নিয়ন্ত্রণ' এবং 'আত্ম-বিন্যাস'-এর প্রয়াস পৌর নাগরিকত্বের একটি বয়ানকেই তুলে ধরেছে।

ব্যঙ্গময় বঙ্গে 'বসন্তক' ও পৌর নাগরিকতা

এবার বরং একটু 'লঘু চিত্তে' শহরের 'sanitation' বজায় রাখার প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে অভিমত বোঝার চেষ্টা করা যাক। সঙ্গে দেখা যাক পৌর নাগরিকতা গড়ে ওঠার ধরন।

প্রাণনাথ দত্ত এবং গিরীন্দ্রনাথ দত্ত দুই ভাই। এঁরা ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বেশ একখানা কার্টুনে ভরা সরস ব্যঙ্গ পত্রিকা প্রকাশ করে বসলেন। পত্রিকাটির নাম *'বসন্তক'*। এদের মধ্যে একভাই প্রাণনাথ দত্ত আবার সরাসরি মিউনিসিপ্যালিটি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে করদাতাদের ভোটাধিকার আন্দোলন করেন ও জয়লাভ করেন।[12]

[12] https:// www.ub.uni-heidelberg.de/Englisch/fachinfo/suedasien/zeitschriften/bengali/overview.html

'বসন্তক'-এর একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল মিউনিসিপ্যালিটির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা, ব্যঙ্গের ছলে। কখনও গদ্যে, কখনও বা পদ্যে। মিউনিসিপ্যালিটির নানা রকম কর্মকাণ্ড...জল সরবরাহ, ড্রেন ব্যবস্থা নির্মাণ, শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে *'বসন্তক'* আলোচনা করেছে। তারা অবশ্য ব্যঙ্গের ছলেই ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ উন্মোচন করেছে। তাদের বক্তব্যের মূল কথাই হল, কলকাতা শহরের এই ঝাঁ চকচকে রূপ, কল খুললেই জল, সবই কিন্তু শহরের সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায়; যার বোঝা নেহাত কম নয়। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, তার স্বরূপ নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে ক্রমশ এক ধরণের সচেতনতা তৈরি হচ্ছিল এবং তা ক্রমশ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠছিল--- এই বিষয়টি লক্ষ করার মতো।

এখন বরং *'বসন্তক'* কীভাবে মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতামত ব্যঙ্গের ছলে কখনও বা কার্টুনের মাধ্যমে পরিবেশন করত সেই বিষয়ে খানিক আলোকপাত করা যাক। *'বসন্তক'* মাসিক পত্রিকাটি তার একটি সংখ্যায় 'কলকাতার সুখ' বলে একটি পদ্যে মিউনিসিপ্যালিটির নানান কর্মকাণ্ডের একটি ব্যঙ্গাত্মক রূপ তুলে ধরে। জল সরবরাহ সম্বন্ধে *বসন্তক*-এর বক্তব্য---

"...এমন নির্মল জল,

কাশীতেও কে পায়।

বুঝি, মন্দাকিনী স্বর্গ হ'তে

এলেন ধরায়।।

সব, জলের জন্য জ্ব'লে মর্‌তো,

করতো হাহাকার।

সিদ্ধির গোলা পচা জল

করত ব্যবহার।।

তাতে ওলাউঠা দেবীর বড়

হ'ত কেরামত।

ঘরে ঘরে কান্নাকাটি,

খুলতো যমের বাড়ির পথ।"

পদ্যের প্রথম পর্বে কলকাতা শহরের নর্দমার গুণ কীর্তনেও একই রকম পঞ্চমুখ 'বসন্তক'---

" ...যত, মশা মাছি পোকা মাকড়,

গেল পলাইয়ে।।

এখন, মহাসুখে নিদ্রা হয় কলকাতা নগরে।

যেমন, পশ্চিমেতে ফল্গু নদী

অন্তঃশিলা বয়।

সেরূপ, নর্দমা সব রাস্তার নীচে,

গুপ্ত ভাবে রয়।।"

এর পরেই অবশ্য তার পাঠককুলকে এক চরম বাস্তব প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে *'বসন্তক'*---

"...এত সুখ কিন্তু যখন

টেক্স দিতে হয়।

এত সুখের শহর তখন মাথার উপর রয়।।

সুখের চেয়ে অস্বস্তি ভাল,

কি বলিব আর।

ওরে, ছেড়ে দে রে কেঁদে বাঁচি,

সৈতে নারি আর।।

মিউনিসিপ্যালিটির পায়

শত নমস্কার।।”

শহরবাসী বাঙালি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে শহরবাসীর ভোটদানের অধিকারের সপক্ষে লড়াইয়ে সামিল হচ্ছেন। করের বোঝা নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন।মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবাগুলির সঠিক পরিচালনা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য থাকলেও সুবিধাগুলিকেও ঠিক অস্বীকার করতে পারছেন না। আবার অন্যদিকে, মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে শহরবাসী জনপরিসরে আলোচনার বিষয়বস্তু করে ফেলেছেন। কখনও ব্যঙ্গের ছলে, কখনও কার্টুনের মাধ্যমে আবার বিপিন চন্দ্র পালের মতো নাগরিক বোধ তৈরি হওয়া প্রসঙ্গে যথেষ্ট ভাব-গম্ভীর আলোচনাও আমরা দেখতে পেয়েছি। এই সমস্ত কিছুই একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। মিউনিসিপ্যালিটি প্রায় শহরবাসীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। নাগরিক অভিধায় ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছিল বিষয়টি। রাজনৈতিক নাগরিকত্ব ‘civil citizenship’-এর পাশাপাশি মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক এক স্বতন্ত্র নাগরিক আত্মপরিচয় গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। যাকে আমরা পৌর নাগরিকত্ব বলে চিহ্নিত করেছি।

মিউনিসিপ্যালিটি, পৌর নাগরিকতা ও বিভিন্ন ‘বাধা-বিপত্তি’

শহর জীবনের প্রধান এবং প্রাথমিক চাহিদা যে ‘sanitation’ রক্ষা এই কথা মোটামুটি ঔপনিবেশিক প্রভুদের দৌলতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহরবাসী বাঙালির মজ্জায় প্রবেশ করে গিয়েছিল। হঠাৎ মিউনিসিপ্যালিটির ওপর এই ভার অর্পিত হল কীভাবে তারও একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। আমরা ইউরোপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে মহামারীর প্রকোপ, শিল্প-বিপ্লবজনিত কারণে শহরগুলির প্রবল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে এই বিষয়ে খানিক ধারণা পেতে পারি (প্রথম অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা

আছে)। ক্রান্তীয় উষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ভারতের জলবায়ুর সঙ্গে ব্রিটিশদের মানিয়ে নিতে বেশ অসুবিধা হত। তারা অচিরেই বিভিন্ন রোগের কবলে পড়ত এবং প্রাণ হারাত। এছাড়া ‘বর্ধমান জ্বর’ ইত্যাদি আরও নানান মহামারীর ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। নিজেদের দেশের মতো অন্তত তাদের শহরকেন্দ্রিক অবস্থানকে তারা স্বাস্থ্যসম্মত করতে চেয়েছিল। বিশুদ্ধ আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং বর্জ্য পদার্থ-দূষিত জল ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাশনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এই পরিষেবাগুলি পরিচালনার দায়ভার অর্পিত হয় মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপর। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে Calcutta Municipal Consolidation Act –এর মাধ্যমে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তৈরি হয়। এরপর একে একে অন্যান্য জেলা সদরেও মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। দীর্ঘদিনের চলে আসা মফস্বলগুলোর নাগরিক জীবনেও এক বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয়। অভ্যেসগুলো ক্রমশ বদলে যেতে থাকে। এতদিনের পরিচিত জলের উৎসগুলি ক্রমশ স্বাস্থ্যহানিকর বলে চিহ্নিত করা হয়, সময় মেপে মিউনিসিপ্যালিটির কলের জলে সারা দিনের কাজ সারার অভ্যেস রপ্ত করা নেহাত কম কথা নয়। এরপর বাড়ির পাশে মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেনের মাধ্যমে দূষিত জল অপসারণের পালা। সব মিলে শহরের অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গে এক বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত করেছিল মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার প্রকল্পগুলি। প্রকল্পগুলি শুনতে একরকম মনে হলেও অঞ্চল, রীতি-নীতি, ভৌগোলিক পরিস্থিতি, ঔপনিবশিকদের তরফ থেকে শহরের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুদান মঞ্জুর প্রকল্পগুলির কার্যকারিতায় যথেষ্ট বৈচিত্র রচনা করেছিল। শহর ভেদে শহরবাসীর এই প্রকল্পগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার সঞ্চার পথও ছিল বহুধা বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের অনুধাবন বর্তমান গবেষণার বড় উদ্দেশ্য।

ঔপনিবেশিকদের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির স্বার্থে এই উদারনৈতিক প্রকল্পের প্রভাব কলকাতা এবং তার পাশাপাশি মফস্বলের প্রচলিত জীবন-যাত্রার ধরনকে ক্রমশ পাল্টিয়ে দিচ্ছিল।

ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান এমন ভাবে জনমানসে প্রথিত হয়ে গিয়েছিল যে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার প্রকল্পগুলির সঙ্গেই ক্রমশ তারা মানিয়ে নিতে শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল বহু। আজও মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা নিয়ে বহু সমস্যা আছে। কিন্তু সমস্যাগুলি যেন একভাবে প্রকল্পগুলির সঙ্গে একাত্মতারই চিহ্নক হয়ে উঠেছে। যেমন শহরে সমপরিমাণ কর প্রদান করেও সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা সমান ভাবে জল পান না এই অভিযোগ বহুদিনের। গঙ্গার তীরবর্তী শহরের বাসিন্দারা গঙ্গানদী ব্যতিত অন্য জলের উৎস থেকে জল সরবরাহ প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। চাপে পড়ে ঔপনিবেশিক সরকারকে এই দাবি মেনে নিতে হয়। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি সরবরাহিত জলের গুণগত মান নিয়েও স্যানিটারি কমিশনের প্রশ্নের মুখে পড়তে হত মিউনিসিপ্যালিটিকে। সরকারি তরফে কর বৃদ্ধির দাবি উঠলেই শহরবাসীদের তরফ থেকে প্রতিবাদ উঠে আসতে থাকে। বিশ শতকের শুরুর দিক থেকে দক্ষিণবঙ্গের শহরগুলির ক্ষেত্রে নদীর জল পরিবহণের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং উত্তরবঙ্গের শহরের ক্ষেত্রে ঝর্ণার জল কমে যাওয়া একটি বড় রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে। ড্রেন ব্যবস্থা বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বহু ধরনের সমস্যা। এমনিতেই দক্ষিণবঙ্গের নিম্ন-গাঙ্গেয় অঞ্চলে ভূমির ঢাল কম। সেখানে শহরগুলিতে ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাস করতে গেলে বহুবিধ বাস্তব সমস্যা। প্রথমত, যদি নতুন করে ড্রেন খনন করতে হয় জমি অধিগ্রহণের একটা প্রসঙ্গ চলে আসছে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ বনাম মিউনিসিপ্যালিটির স্বার্থের একটা ক্ষেত্র রচিত হচ্ছে। এরপরে ড্রেনগুলি কী রকম হবে--- কাঁচা, সিমেন্টে বাঁধানো, ঢাকা না খোলা--- এই সংক্রান্ত নানান মতামত। তারও পরের যে প্রশ্ন চিহ্নটি থেকে যাচ্ছে, তা ড্রেনগুলিকে শহরের বাইরে কোথায় নিক্ষিপ্ত করা হবে? এই সমস্ত স্বার্থের সংঘাত, প্রারম্ভিক সমস্যা কাটিয়ে ড্রেন বিন্যস্ত হওয়ার পরেও শহরের জল জমার সমস্যা চিরন্তন। একে ঘিরে শহরবাসীর জীবনযাত্রার ভোগান্তিও অনন্ত।

সার্বিক ভাবে মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং দূষিত জল নিষ্কাশনের পরিকাঠামোর বিভিন্নতা, এই পরিকাঠামোগুলিতে অভ্যস্ত নগরবাসীর জীবনযাত্রা, বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাগরিক অভিযোগ---এই সব কিছুকে কেন্দ্র করে মিউনিসিপ্যালিটিবাসী ঔপনিবেশিক প্রজাদের 'রাজনৈতিক নাগরিকত্ব' এবং 'civil citizenship'-এর পাশাপাশি মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক পৌর নাগরিকত্বের সূচনা হয়েছিল। পরিষেবাগুলিকে কেন্দ্র করে কীভাবে এই 'পৌর নাগরিকতা' আবর্তিত হল, তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণাটিতে। পরিষেবার প্রকল্প বিন্যাসের বিভিন্নতা, বাস্তব সমস্যার বিভিন্নতা, ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্নতা, বরাদ্দ অর্থের তারতম্যর কারণে এই 'পৌর নাগরিকতা'-র জটিল-বৈচিত্র্যময় বিন্যাসকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই যে শহরগুলিকে চয়ন করা হয়ছে, তার মধ্যে এই বিভিন্নতার বিষয়টি যেন প্রকাশ পায় সেই দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সংশয় ও সাঙ্গীকরণের সমাহারে নির্মিত পৌর নাগরিকতা: পূর্ববর্তী গবেষণার প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণার অবস্থান

'পৌর নাগরিক' অভিধায় আঞ্চলিক, নিজেদের শহরের মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক একটি স্বতন্ত্র সচেতনতার উপস্থিতি আমরা লক্ষ করব। কিন্তু ঔপনিবেশিকদের এই মিউনিসিপ্যালিটি নির্মাণের 'জনহিতৈষী', 'উদারনৈতিক' প্রকল্প যে আসলে শোষক শাসকদের শাসনেরই আরেকটা মুখোশ, এই সচেতনতাও তাদের মধ্যে ভালো মতোই ছিল। 'বসন্তক' নামক যে ব্যঙ্গ পত্রিকাটির কথা কিছু আগে উল্লেখ করেছি, তার থেকে একটি ব্যঙ্গ নাটিকার সংলাপ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি বোঝা আরও সহজ হবে। নাটিকাটির দু'টি চরিত্র। বসন্তক নিজে একটি চরিত্র, দ্বিতীয় চরিত্র মিউনিসিপ্যালিটির জনৈক সভ্য। কলকাতা শহরের ড্রেন নির্মাণের প্রেক্ষাপটে নাটিকাটির সূত্রপাত।

''বসন্তক: ড্রেনেজ উপলক্ষে কলকাতাটাকে একেবারে ফোঁপ্‌রা কোরে ফেল্লে।

সভ্য: হুঁ ইংলিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে প্রজাদের একরকম রামরাজ্য ব'ল্লেও বলা যায়।

বসন্তক: প্রজাদের সুখ হ'ত, যদি কোন রকম অত্যাচার না থাক্‌তো।

সভ্য: কি জানেন! আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের মনের মত হওয়া খুব দুষ্কর; এঁদের কিছুতেই আর মনের তৃপ্তি হয় না। ইংরাজেরা যেরূপ সুশৃঙ্খলাতে রাজ্য ক'চ্চে, এমন কস্মিনকালে কোন রাজাই পারে না, বিশেষতঃ প্রজার সুখের দিকে দৃষ্টিপাত এত কার ছিল? ইংরাজের রাজ্য অবধি বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা, রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি সকল বিষয়ের কত উন্নতি, কত সুবিধা হয়েছে; দেখুন পাব্‌লিক ওয়ার্ক্‌স্‌ ও মিউনিসিপ্যাল্‌টী পথ, ঘাট, বাড়ী ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত রয়েচে, তা এর প্রতি কারো লক্ষ্য নাই। আমাদের জেতেরই স্বভাব দোষ অনুসন্ধান করা, গুণের পক্ষপাতী কেউই নয়।

বসন্তক: এতে আর উপকার করা কই হ'ল গবর্ণমেন্ট তো আর নিজের ব্যয়ে এই সকল সম্পন্ন ক'চ্চেন না? এতো "পরের ধনে পোদ্দারী করা"।"

নাটক আরও এগোতে থাকে...

শুধু *বসন্তক* বলে নয়, মোটের ওপর সেযুগের বাংলা লেখালিখিতে মিউনিসিপ্যালিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল। করদাতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনার বাসনা এদেশীয়দের মনে ছিল। কিন্তু বিদেশি প্রভুর আয়ত্তাধীন মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে সংশয়ও কম ছিল না। তাই, দেখি, মিউনিসিপ্যালিটি-নির্ভর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন যেমন অনেকের কাছে স্বাধীনতার মায়ামোহ সৃষ্টি করেছিল, তেমনি এই মোহ নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপও কম হয়নি। যেসব ভদ্রলোক সাহেব প্রভুদের সহযোগী হয়ে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হতে চান, ভোটে দাঁড়াতে চান তাঁদের নিয়েও ব্যঙ্গ হয়েছে প্রচুর। মূলগতভাবে এসব হল মিউনিসিপ্যালিটির উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ নিয়েই সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গরচনা 'হনুমদ্‌বাবুসংবাদ' থেকে শুরু করে গিরিশচন্দ্র

ঘোষ বা অমৃতলাল বসুর কবিতায় আমরা এর পরিচয় পাই। ঔপনিবেশিক প্রভুদের সদিচ্ছায় সন্দেহ করে তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করেছেন অমৃতলাল বসু ---

“পর্বতে রাজতে গোরা, পীড়িতং পুষ্পসৌরভে

ড্রেনাঘ্রাণে বর্ধিতং বঙ্গ শ্রীমুন্সীপাল গৌরবে।” (‘চাণক্য শ্লোক’)

সুতরাং ঔপনিবেশিকদের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় যেমন শহরবাসীর মধ্যে ছিল, তেমন ছিল মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়া, পরিষেবার সুষ্ঠু পরিচালনাকে ঘিরে নানারকম দাবি-দাওয়া। এই সব কিছুকে আলিঙ্গন করেই শহরে মিউনিসিপ্যালটিবাসীদের ‘পৌর নাগরিক’ আত্মপরিচয়ের বিকাশ।

বিপিন চন্দ্র পালের ‘The Calcutta Municipal Gazette’-এর লেখাগুলি বা ‘বসন্তক’ ব্যঙ্গ পত্রিকাটির মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে লেখাগুলিকে সচেতন, একান্ত মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক ‘পৌর নাগরিকতা’-র প্রকাশ হিসেবে দেখতেই পারি। সুতরাং ঈশিতা পাণ্ডে-এর দাবি অনুযায়ী অন্তত ‘sanitation’ রক্ষা এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে আত্ম-জ্ঞান, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-বিন্যাস ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলেই প্রতিফলিত হয়েছিল, এই বক্তব্য মেনে নিতে অসুবিধা থাকার কথা নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উপনিবেশে প্রজাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলেও ‘আত্মতা’-র একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল।

ঈশিতা দুবে তাঁর বই *‘Medicine, Race and Liberalism in British Bengal symptoms of Empire’*-বইতে এই আত্ম-জ্ঞান, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-বিন্যাসের বিষয়টি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চিকিৎসা ব্যবস্থা বিন্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন। সামাজিক চিকিৎসাব্যবস্থা বিন্যস্ত করার স্বার্থে প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণ বা মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ড বইটিতে আলোচিত হয়নি। রজতকান্ত রায় তাঁর *‘Urban Roots of Indian Nationalism:*

Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta city Politics, 1875-1939' বইতে দেখিয়েছেন কীভাবে মিউনিসিপ্যালিটিতে অংশগ্রহণ, ক্ষমতার বিন্যাস, শহরকেন্দ্রিক রাজনীতি, সার্বিক ভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিত রচনা করেছিল। কিন্তু তিনি মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত পরিষেবার বিষয়টি কীভাবে শহরবাসীকে প্রভাবিত করেছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেননি। কৌস্তুভমণি সেনগুপ্ত তাঁর 'Planned Spaces, Intimate Places: Ordering A City And Creating A Neighbourhood In Colonial Calcutta' নামক অপ্রকাশিত গবেষণায় দেখিয়েছেন, কলকাতা শহরে মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ বা ড্রেনের পরিকাঠামো নির্মাণের ভিত্তিতে কীভাবে শহরের স্থানিক পরিসরের পুনর্নির্মিতি হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে নাগরিকতার সংযোগ বিষয়টি তিনি আলোচনার মধ্যে আনেননি। কলকাতা শহর ছাড়া মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির পরিকাঠামো নির্মাণ নিয়েও তিনি আলোচনা করেননি। আমরা যদি মফস্বল শহরগুলির কথা বিবেচনা করি, তবে কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ ও মহামারী প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক উদ্বেগ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ সামন্ত-র *'Living With Epidemics in Colonial Benal'* বইটির কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি বা এর পরিষেবা সংক্রান্ত আলোচনা এখানে নেই। আবার দার্জিলিং শহর সম্পর্কে Queeny Pradhan তাঁর *'Empire in the Hills: Simla, Darjeeling, Ootacamund, and Mount Abu, 1820-1920'* বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কীভাবে হিল স্টেশনগুলি ঔপনিবেশিক প্রভুদের পছন্দের বাসস্থান হয়ে উঠেছিল সেই নিয়ে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই আলোচনায় জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়টি নেই।

এই গবেষণায় মূলত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশনের পরিষেবার বৈচিত্র্য তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবাকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক নাগরিকতা তথা নাগরিকতা'-র

বিকাশকেও চিহ্নিত করার প্রয়াস করা হয়েছে। মূলত আর্কাইভের নথির ওপরেই ভরসা করে পরিষেবার প্রকল্প বিন্যাসের বিচিত্র সঞ্চারপথটি তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে গবেষণাটিতে। সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির নাগরিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, পাওয়া-না পাওয়া, প্রতিবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বিকশিত হতে থাকা শহরবাসীর 'পৌর নাগরিক' আত্মপরিচয় সম্বন্ধেও আলোচনা থাকবে।

এদেশে মিউনিসিপ্যালিটি ও তার পরিষেবার আদি ইতিহাস মোটের ওপর ঔপনিবেশিক প্রভু ও এদেশীয় প্রজার সম্পর্কের কাঠামোতে বিধৃত। কিন্তু প্রভু ও প্রজা দু'দিকেই বহু স্তর ছিল এবং ছিল তাদের মধ্যে টানাপোড়েন---স্বার্থ ও নীতি দু'দিক দিয়েই। আমাদের আলোচনায় এই টানাপোড়েনগুলি বুঝে নিয়ে সামগ্রিক ভাবে বিষয়টির জটিলতা উদ্ঘাটনের প্রয়াস আছে। মিউনিসিপ্যালিটিতে বিদেশি শাসক বনাম ভারতীয় প্রতিনিধিদের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি শাসকদের মধ্যে স্থানীয় ও অধিস্থানীয় দ্বন্দ্ব, পৌর প্রশাসকদের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য, প্রশাসকদের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদদের মতপার্থক্য, পৌর-প্রশাসক বনাম সাধারণ নাগরিকদের সংঘাত, আবার সাধারণ নাগরিকদের নিজেদের মধ্যেও ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি আমাদের আলোচনায় ধরা পড়েছে।

গবেষণার অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্তসার

গবেষণাটি মূলত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পাঁচটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়টি কীভাবে আলোচিত হল, অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্তসারের মাধ্যমে তার একটি ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

প্রথম অধ্যায়: ইউরোপে স্বাস্থ্যরক্ষার উদারনৈতিক বিধানের সূচনা: নাগরিক প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণের পথ

এই অধ্যায়টিতে মূলত দেখানোর চেষ্টা করেছি, আঠারো-উনিশ শতক থেকে ইউরোপে কীভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মহামারী রোধ করার জন্য নানা রকম ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। নতুন চিন্তা-

ভাবনায় 'রোগ' শুধুমাত্র আর ব্যক্তির দেহগত বিষয় থাকে না। তা ক্রমশ সামাজিক চিকিৎসাতে রূপান্তরিত হয়। সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থার রূপটি ইউরোপে এক এক দেশে বিবর্তনের পথ পেরিয়ে ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণিকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার রূপ নেয়। রোগের প্রতিবিধান এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষার চাবিকাঠি যে শুধু ব্যক্তির দেহগত বিষয় নয়, এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বরং নিরোগ দেহ গঠনের শর্ত হিসেবে গুরুত্ব পায় শহর জুড়ে জল-আলো-বাতসের সুষ্ঠু সঞ্চালন। চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশ শুধুমাত্র ডাক্তারদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় থাকে না। বরং এক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। ইংল্যান্ডে শহরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য 'sanitation' ক্রমশ আন্দোলনের রূপ পায়। শহর জুড়ে নানা রকম পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে তোলার কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এই পরিষেবাগুলির পরিচালনার ভার নানা পথ পেরিয়ে এসে অর্পিত হয় মিউনিসিপ্যালিটির ওপর। লন্ডন শহরের দৃষ্টান্তে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, মধ্যযুগীয় মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপরে কীভাবে শহরের বিভিন্ন পরিষেবা পরিচালনা করার নতুন ভার অর্পিত হয়েছিল। এই ভাবে পাশ্চাত্যে রোগ এবং স্বাস্থ্যরক্ষাকে ঘিরে নতুন চিন্তা ভাবনা এবং এর সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: উপনিবেশের প্রতিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিধান

পাশ্চাত্যে সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থার বিধান হিসেবে প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণ এবং মিউনিসিপ্যালিটির ওপর শহরের বিভিন্ন পরিষেবার পরিকাঠামো পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পরে, উপনিবেশে সেই মডেল প্রতিস্থাপিত হওয়ার পালা। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে এক্ষেত্রে বহু সমস্যা। এছাড়া উপনিবেশের প্রতি ঔপনিবেশিকদের বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উদারনৈতিক দ্বিচারিতাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকল্পগুলির বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে উপনিবেশের প্রতি ঔপনিবেশিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে এর

রদবদল, এছাড়া পরিস্থিতি-উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রকল্পগুলি নির্মাণের পরে তার সঙ্গে দেশীয় জনতার গ্রহণ-বর্জন-মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াও ছিল বেশ দীর্ঘ এবং জটিল। পাশ্চাত্যের এই বিশ্বজনীন চিকিৎসার মডেল উপনিবেশে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উপনিবেশে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে নিজের মধ্যেও কী ধরনের পরিবর্তন আনল, এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়: দক্ষিণবঙ্গের ছোটো শহরের নাগরিকতা ও মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ: কলকাতার প্রতিতুলনায় বর্ধমান ও বহরমপুর

এই অধ্যায়ে কলকাতা শহরের প্রতিতুলনায় বর্ধমান এবং বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কলকাতা শহরে সর্বপ্রথম জল সরবরাহ প্রকল্প চালু হয়। কীভাবে, কোথা থেকে এখানে জল সরবরাহ করা হবে, সেই নিয়ে বহু মতবিরোধের পর ঐকমত প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতাবাসীকে জল সংক্রান্ত পরিবর্তিত অভ্যেস রপ্ত করানোও নেহাত সহজ ছিল না। বর্ধমানের ক্ষেত্রে আবার অন্য ধরনের সমস্যা। 'বর্ধমান জ্বর'-এর স্মৃতি, জল সংকট, শহরের সর্বত্র সমান ভাবে জল প্রেরণ করা, জল কর বৃদ্ধির নাগরিক প্রতিবাদ ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় জল সরবরাহ প্রকল্পকে। বহরমপুর শহর দক্ষিণবঙ্গের জল সরবরাহ সংক্রান্ত আলোচনায় একটি নতুন প্রেক্ষিত তৈরি করে। গঙ্গার পার্শ্ববর্তী শহর হওয়ার কারণে পাইপের মাধ্যমে গঙ্গাজল সরবরাহ করার নাছোড় দাবির সামনে মাথা নোয়াতে হয় ঔপনিবেশিকদের। এছাড়া গঙ্গা নদীর ভাঙন এই শহরের জল সরবরাহের পরিকাঠামোর সামনে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত ঘটনা, অভ্যেস, সমস্যা, দাবি, প্রতিবাদ সব কিছুর মধ্যে শহরের মিউনিসিপ্যালিটির বাসিন্দাদের 'পৌর নাগরিক' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে তুলে ধরার প্রয়াস থেকেছে।

চতুর্থ অধ্যায়: শহরের জল সঞ্চালনে দূষিত জল নিষ্কাশন: কলকাতার প্রতিতুলনায় কৃষ্ণনগর

এই অধ্যায়ে শহরের সার্বিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ড্রেনের মাধ্যমে দূষিত জল নিষ্কাশনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতা শহরে কীভাবে, কোন্ দিক বরাবর ড্রেনগুলি বিন্যস্ত করা হবে শেষ পর্যন্ত কোথায় বর্জ্যপদার্থ নিক্ষেপ করা হবে এই সব বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণনগর শহরের ক্ষেত্রে অবশ্য সমস্যা আরও জটিল। কারণ, পুরোনো শহর, এখানে ড্রেন বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে শহরবাসীর থেকে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এছাড়া কৃষ্ণনগর শহরে শেষ পর্যন্ত যেখানে বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ করা হবে সেই নিয়েও জলঙ্গী নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। ড্রেন বিন্যাসের ক্ষেত্রেও অভ্যেস পরিবর্তন, ব্যক্তিস্বার্থ বনাম মিউনিসিপ্যালিটির স্বার্থ, আরও নানান নিত্যনৈমিত্তিক অভিযোগ পৌর নাগরিকত্ব গঠনের প্রেক্ষিত রচনা করেছিল। এই বিষয়টির প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি শহর দার্জিলিং-এর জল সঞ্চালন, যেখানে জল প্রবল বেগে নিম্নমুখী

পঞ্চম অধ্যায়ে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক থেকে জল সরবরাহ এবং ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাস আলোচনার মাধ্যমে পৌর নাগরিকতার এক স্বতন্ত্র রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে দার্জিলিং শহরকে নিয়ে। এই শহরের গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গের শহরগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই শহরকে ঘিরে ঔপনিবেশিক প্রভুদের স্বার্থের ধরনও ভিন্ন। ভূ-প্রকৃতির কারণে জল এখানে সততই নিম্নে ধাবমান। এ হেন পরিস্থিতিতে সর্বত্র সমান ভাবে জল সরবরাহ করা এবং ড্রেন বিন্যাস করার প্রযুক্তি যথেষ্ট জটিল এবং সমতলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পরিষেবার পরিকাঠামো নির্মাণ এবং পৌর নাগরিকতা গড়ে ওঠার বিচিত্র সঞ্চারপথ এই বিষম চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার একটা প্রয়াস থেকেছে।

প্রথম অধ্যায়

ইওরোপে স্বাস্থ্যরক্ষার উদারনৈতিক বিধানের সূচনা: নাগরিক প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণের পথ

২০২০ তে আমরা বিশ্ববাসী অন্তত এটা বুঝে গেছি, কোনও মহামারীর 'আতঙ্ক' কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। রোগের সংক্রামক শক্তি আমাদের বাহির-অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নীতি বিভিন্ন পথ বেছে নিল, যার অভিঘাতও হল বিভিন্ন রকম। রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বর্ম সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্র তার বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোয় নাগরিকের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। মহামারীকে প্রতিহত করতে নাগরিকের ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, গতিবিধি সব কিছু নিয়মাবলীর রোজ নামচায় বেঁধে ফেলল রাষ্ট্র। নাগরিকত্ব যে 'কল্যাণকামী' রাষ্ট্রের নজরদারি আর হুঁশিয়ারির ঘেরাটোপের বাইরে আলাদা কোনও অস্তিত্ব নয় এটাই প্রমাণিত হল আবার। রোগের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় রাষ্ট্রের বাতলে দেওয়া পথে নাগরিকের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল। বাড়ির বাইরে কতদূর অবধি যাওয়া যাবে বা যাবে না, পরস্পরের কতটা কাছাকাছি আসা যাবে বা যাবে না, বাইরে বেরোলে কী ভাবে বেরোতে হবে, পাব্লিক স্ফিয়ারকে কী ভাবে ব্যবহার করা যাবে বা যাবে না পুরোটাই ঠিক করে দিল রাষ্ট্র। ঋতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'Intervention – "Why Do Empty Streets Threaten Democracy?"' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কোভিড-১৯-কে প্রতিহত করতে সারা ভারত জুড়ে লকডাউন কীভাবে 'স্ট্রিট'-এর গণতান্ত্রিকতাকে নির্ধারণ করেছে।[1] বন্‌ধ- এর সময়ও রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে। কিন্তু প্রতিবাদী মিছিল, ট্রাম-বাস জ্বালিয়ে দেওয়ার মত ঘটনায় সে তার সরব অস্তিত্ব জানান দেয়। কিন্তু

[1] Ritajyoti Bandyopadhyay, Intervention – "Why Do Empty Streets Threaten Democracy?"https://antipodeonline.org/2020/06/25/empty-streets

লকডাউনে রাস্তার চরিত্র পুরো অন্যরকম। গণপরিসরের এই শূন্যচিত্র আমাদের অন্য কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।

Disaster Management Act, 2005, Section 6, সরকারকে কোভিড-১৯ প্রতিহত করতে মানুষ এবং পণ্যের স্বাভাবিক চলাচল স্থগিত রাখার অধিকার দেয়। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হারিয়ে 'স্ট্রিট' একটি শূন্যস্থানে পরিণত হয়।

নাগরিক দৈনন্দিনতায় রাস্তার ভূমিকা বোঝাতে ঋতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, গণ পরিসরের অঙ্গ হিসেবে রাস্তা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। গণ পরিসরের অঙ্গ হিসেবে এটি কীভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিসরকেও নির্ধারিত করে দেয় সেই বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারিত হয় সামনের রাস্তার গুরুত্ব অনুযায়ী। রাস্তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সামনে খোলা জায়গা, আলো-হাওয়া চলাচলের মাধ্যম। আবার আর এক ভাবেও বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে। রাস্তা, ব্যক্তিকে কিছু বিশেষ পরিষেবা প্রদান করে। বিশেষত পরিবহণের পরিষেবা। বাড়ির সঙ্গে বাজার, কাজের জায়গাকে যুক্ত করার পরিষেবা। এছাড়াও জনহিতকর অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও রাস্তার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। যেমন, জল সরবরাহের পাইপ, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ড্রেন, ইলেকট্রিক তার, বা ফোনের তার বিভিন্ন বাড়ির সঙ্গে নির্দিষ্ট রাস্তার পথ ধরেই বিন্যস্ত হয়।[2] গণ পরিসর আনুবীক্ষণিক ভাবে ঢুকে পড়ে গৃহে, পরিষেবার মাধ্যমে। ব্যক্তি পরিসরের ক্রমশ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

প্রশাসনিক তরফে পরিষেবাগুলি নিয়ন্ত্রণ, নাগরিকদের ক্রমশ এই সব পরিষেবায় অভ্যস্ত হয়ে পড়া এবং এর সহাবস্থানে বা বলা ভালো টানাপোড়েনে-এ নাগরিকতার এক নতুন রূপ জন্ম নিল। গবেষণাটির এই অধ্যায়ে মূলত বোঝার চেষ্টা করব পশ্চিমি দুনিয়ায় রাষ্ট্রের তরফে নাগরিক পরিষেবা প্রদানের তাগিদের ইতিবৃত্ত। রাষ্ট্রের তরফে নাগরিককে কেনই বা হঠাৎ

[2] Ibid

নাগরিক পরিষেবায় অভ্যস্ত করানোর প্রয়াস দেখা গেল, পরিষেবাগুলির পরিকাঠামো তৈরিতে কী ধরনের প্রবণতা দেখা গেল এবং নাগরিকতা ও পরিষেবা ব্যবহারের মধ্যস্থতায় কীভাবে মিউনিসিপ্যালিটির অনুপ্রবেশ ঘটল, এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

ইউরোপের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ কাঠামো ও সমাজের দৈনন্দিনতায় কিছু পরিবর্তন আরও অনেক কিছুর সূচনা করল। যার মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন রোগের ছড়িয়ে পড়া। সার্বিক ভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদ, রোগের ছড়িয়ে পড়া রোধ করার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তৎপরতা দেখা গেল। রোগ এবং রোগীকে চিহ্নিত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা, ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পরে সার্বিক ভাবে রোগের প্রতিরোধ গড়ে তোলার পদক্ষেপ করা হল। এই তৎপরতা শুধু আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের কার্যকারিতায় সীমাবদ্ধ থাকল না। কালক্রমে এই ইতিবৃত্তে ইঞ্জিনিয়ারদেরও অনুপ্রবেশ ঘটল। রোগ ছড়িয়ে পড়ার অনুকূল পারিপার্শ্বিক কারণ অনুসন্ধান করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কিছু রূপান্তর ঘটানো এবং সেই সঙ্গে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে নতুন কিছু নাগরিক অভ্যেসের সূচনা করার জন্য কিছু নতুন পরিকাঠামোর প্রয়োজন হল। এবার সেই পরিকাঠামোর নতুন রূপ কী রকম হবে বা কোনটি বেশি কার্যকরী হবে, সেই বিধান দিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে এবং তাকে বাস্তব রূপ দিতে ইঞ্জিনিয়ারও ঢুকে পড়লেন পরিষেবার পরিধিতে।

এর পরবর্তী প্রশ্ন হল, শহরের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পরিষেবা প্রকল্পগুলির পরিচালনার ভার কার ওপর ন্যস্ত হবে? নাগরিকদের প্রয়োজন, অংশগ্রহণ এবং তার সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন নীতির সাযুজ্য ঘটাতে ক্রমশ মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপরে এই পরিষেবা প্রকল্পগুলির পরিচালনার ভার বর্তাবে।

ইউরোপের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং উপনিবেশের জলবায়ুতে উদ্ভূত কিছু বিশেষ ধরনের রোগের মোকাবিলা করতে অচিরেই ভারতেও

স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে নাগরিক পরিষেবার পরিকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠল মিউনিসিপ্যালিটি। পরিষেবা প্রদানের নতুন প্রক্রিয়ায় শহরগুলো অন্যরূপ পেতে থাকল। সেই সঙ্গে এই পরিষেবার অভ্যেসে অভ্যস্ত হতে হতে এবং মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জীবনের দৈনন্দিনতাকে মেলাতে মেলাতে তৈরি হল এক নতুন ধরনের নাগরিকতা--'পৌর নাগরিকতা'। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকারিতার ভিত্তিতে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেছি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে।

যেহেতু ভারতে পৌর নাগরিকতার ধারণাটি ইউরোপের আমদানি, এই অধ্যায়ে মূলত ইউরোপে জনস্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাশাপাশি কীভাবে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের পরিকাঠামো নির্মাণের কারিগরিজ্ঞানযুক্ত হল, এবং এই পরিষেবা প্রকল্পগুলি পরিচালনায় কীভাবে মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে গেল, তা বোঝার চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের ইউরোপের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিষয়ে নতুন চিন্তাভাবনা

উনিশ শতকের ইউরোপে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে শব্দটি ঘুরে ফিরে আসে তা হল 'স্যানিটেশন'। সারা উনিশ শতক জুড়েই আমরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 'স্যানিটেশন মুভমেন্ট' দেখেছি। অক্সফোর্ড ডিক্সেনারি অনুযায়ী 'Sanitation' শব্দের অর্থ হল "Conditions relating to public health, especially the provision of clean drinking water and adequate sewage disposal."[3] আবার যদি আমরা এই শব্দের উৎপত্তি দেখি তাহলে দেখব 'Sanitation' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় বেশ নবাগত। উনিশ

[3] languages.oup.com

শতকের মধ্যভাগে এই শব্দটির প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটে।[4] ইংরেজি ভাষায় 'Sanitation' শব্দটির নবাগমন এবং এর বিশেষ দ্যোতনায় একটা বিষয় খুব পরিষ্কার যে উনিশ শতকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে যে চিন্তাভাবনা প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল, তাতে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং যথাযথ ভাবে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। কিন্ত উনিশ শতকের জনস্বাস্থ্য বিষয়ে এই চিন্তাভাবনার পটভূমি তৈরি করেছিল বিভিন্ন প্রতর্ক-বিতর্ক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিবর্তনের একটি সুদীর্ঘ পথ। আমরা এখন এই বিবর্তনের পথটি একটু বোঝার চেষ্টা করব।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ইউরোপের জনসংখ্যা বিপুল মাত্রায় বাড়তে শুরু করে, যদিও জনসংখ্যা বাড়লেও শিশুমৃত্যুর হার কিন্তু বেশ বেশিই ছিল। এখান থেকে হাসপাতাল, জেলখানা এবং পাগলাগারদের অবস্থার উন্নতির বিভিন্ন দাবি উঠে আসতে থাকে। ইংল্যান্ডে নতুন হাসপাতাল তৈরিরও নতুন উদ্যম দেখা যায়।[5] জনগণকে স্বাস্থ্যসচেতন করতে নানারকম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে Sir John Pringle(স্যার জন প্রিঙ্গল্), যিনি 'Father of military medicine' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি একটি বই লেখেন, *'Observations on the diseases of the army'*, তাতে সেনা ছাউনিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং ল্যাট্রিন তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা লেখেন। এছাড়া তিনি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারেও জোর দেন। ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এক শল্য চিকিৎসক James Lind(জেমস লিন্ড), স্কার্ভি রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার চেষ্টা করেন একটি বইয়ের মাধ্যমে। এতে তিনি দেখান স্কার্ভি রোগের মূল কারণ হল ভিটামিন সি-এর অভাব। সুতরাং আঠারো শতকের শেষের দিক থেকে সেনাবাহিনীতে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান হিসেবে চিকিৎসা ব্যতিরেকে অন্যান্য

---

[4] Ibid

[5] Christopher Hamlin, *Public Health and Social Justice in the age of Chadwick, Britain, 1800-1854,* Cambridge University Press, 1998, USA, page-34

কিছু বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে। কীটপতঙ্গবাহিত রোগ এবং ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ঘটিত রোগগুলির কারণ অবশ্য তখনও মানুষের অজানা। তবু তখনই সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা জাগতে শুরু করেছিল।

শিল্পবিপ্লব ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছিল। সার্বিক ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেই সঙ্গে শহরের জনসংখ্যা বাড়ছিল অস্বাভাবিক ভাবে। কাজের তাগিদে কল কারখানাগুলিকে ঘিরে বাড়ছিল মানুষের ভিড়। কিন্তু এই জনতার জন্য শহরে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের সংকুলান ছিল না। ফলত শ্রমিক শ্রেণি খুবই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করার ফলে অচিরেই বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর হারও ক্রমশ বাড়তে থাকে। বার্মিংহামে মৃত্যুর হার ১৪.৬% থেকে বেড়ে ২৭.২% গিয়ে পৌঁছয়। ব্রিস্টলে মৃত্যুর হার ১৬.৯% থেকে বেড়ে ৩১% হয়। লিভারপুলের চিত্রও একই রকম। মৃত্যুর হার ২১% থেকে বেড়ে ৩৪.৮% হয়।[6]

উনিশ শতকের শুরুর দিকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডে মানবতাবাদী-জনকল্যাণকামী তাত্ত্বিকরা তাদের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন। জনসংখ্যাবৃদ্ধির অস্বাভাবিক হার, দারিদ্র এবং মহামারী যে সার্বিক ভাবে স্বাস্থ্যহানিকে ইঙ্গিত করে, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এই সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস করলেন তারা। Thomas Robert Malthus(থমাস রবার্ট ম্যালথাস) খাদ্য সরবরাহের সঙ্গে সাযুজ্য না রেখে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির নেতিবাচক ফলাফল এবং জন্মনিরোধক কিছু প্রক্রিয়া প্রচলনের কথা বলেন। হিতবাদী দার্শনিক Jeremy Bentham(জেরেমি বেন্থাম), পরিস্থিতির মোকাবিলায় নিয়ে এলেন তার 'The greatest good of the greatest number'- এর বিখ্যাত তত্ত্ব। ব্রিটিশ ফিজিশিয়ান, Thomas Southwood Smith(থমাস সাউথউড স্মিথ), ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা

---

[6] Christopher Hamlin, *Public Health and Social Justice in the age of Chadwick, Britain, 1800-1854*, Cambridge University Press, 1998, USA, page-39

করলেন 'Health of Towns Association'. এছাড়া সরকারি তরফে 'General Board Of Health' নামের একটি নতুন ডিপার্টমেন্টের একজন সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। থমাস সাউথউড স্মিথ, কোয়ারেন্টাইন, কলেরা, ইয়োলো ফিভার এবং সার্বিক ভাবে স্যানিটারি ব্যবস্থা উন্নতির উপর জোর দেন।

সরকারি তরফেও সার্বিক ভাবে জনস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা দেখা যায় এই সময় থেকে। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে 'Poor Law Commission' তৈরি হয়। এর সঙ্গে জেরেমি বেন্থামের ভক্ত Edwin Chadwick(এডউইন চ্যাডুইক)-এর নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এইরকম রোগগুলির সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বোঝা গেছে রোগের মোকাবিলা করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার বদলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের স্বাস্থ্য বজায় রাখলে অর্থকরী ভাবেও সেটা লাভজনক এবং রোগের মোকাবিলা করার পক্ষেও অনেক কার্যকরী। [7]

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে 'General Board Of Health' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে জেলা স্তরে জনস্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়। 'Sanitary Reform' বিষয়টি খুব গুরুত্ব পায়। বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন, বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, প্রাইভেট নার্সিং হোমগুলির বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা, গৃহপালিত পশুদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যার যথাযথ হিসেব রাখা, এছাড়া গর্ভবতী মহিলা ও সদ্যোজাত শিশুদের প্রতি বিশেষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়।

আমরা এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আবার উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে এইসব নবোদ্ভূত চিন্তাধারা, বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণের পরিকাঠামো নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সমস্যা-তর্কবিতর্ক এবং ক্রমশ মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠানটির অনুপ্রবেশ বিষয়ে আলোচনা

[7] Ibid., 56

করব। তার আগে সামগ্রিক ভাবে জনস্বাস্থ্যকে ঘিরে ইউরোপের চিত্রটা একটু দেখে নিই। প্রথমে রোগ, জীবাণু, জনস্বাস্থ্য, রোগ মোকাবিলা করার বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কিত সমসাময়িক কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা জেনে নিলে আমাদের বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসার ধারণার থেকে বেরিয়ে সামাজিক স্বাস্থ্যচিন্তা

উনিশ শতকের শুরুর দিকে ইটালিয়ান ব্যাক্টেরিওলজিস্ট Agostino Bassi গুটিপোকার বিভিন্ন infection-এর পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন organism কীভাবে আলাদা আলাদা রকমের infection ঘটায় সেই বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্তে আসেন। যদিও infection সম্পর্কিত বেশির ভাগ তথ্য তখনও অজানা ছিল। উনিশ শতকের শেষের ফরাসি কেমিস্ট ও মাইক্রোবায়োলজিস্ট Louis Pasteur, জার্মান বিজ্ঞানী Ferdinand Julius Cohn এবং Robert Koch রোগের জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী তার শ্রেণি বিভাগ করেন। ব্রিটিশ সার্জেন Joseph Lister(জোসেফ লিস্টার) অ্যান্টিসেপটিক সার্জারির পদ্ধতি আবিষ্কার করে আরেকজন ব্রিটিশ ডাক্তার Ronald Ross(রোনাল্ড রস), ম্যালেরিয়া যে মশাবাহিত রোগ তা আবিষ্কার করে ফেলেন। ফরাসি এপিডেমিওলজিস্ট Paul Louis Simond(পল লুই সিমন্ড) আবিষ্কার করেন ইঁদুরের থেকে প্লেগ রোগের উৎপত্তি এবং এক বিশেষ ধরনের জীবাণু এই রোগ ছড়ায়। এই ভাবে বৈজ্ঞানিক দুনিয়ায় ব্যাকটেরিওলজিতে নানারকম নতুন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে। ইমিউনলজি সম্পর্কিত নানা ধ্যান-ধারণাও প্রকাশ্যে আসতে থাকে। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে রোগের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে Louis Pasteur(লুই পাস্তুর) ভ্যাক্সিনের উপযোগিতার কথা আবিষ্কার করেন। ইমিউনোলজি, মাইক্রোবাওলজি-র দুনিয়ায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। এর প্রভাবে ‘Community Health’ বিষয়টিও নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা বা রোগ নিরাময় বিষয়টি আর ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সামগ্রিকতার প্রয়াসে পর্যবসিত হয়। ব্যক্তি থেকে সামগ্রিকে

রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই জড়িয়ে পড়ে আরও বহু নতুন শর্ত। সামগ্রিকতার এই প্রয়াসের কীভাবে বাস্তবে রূপায়ণ সম্ভব করা যাবে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতির প্রশ্নে গৃহীত নীতির ক্ষেত্রে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম প্রয়াস লক্ষ করা যায়। স্বাস্থ্য যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটি বিষয় থেকে সমষ্টিগত বিষয়ে পরিণত হল, এই সমষ্টিগত বিষয়ের হিতসাধনে স্বাস্থ্য শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের আওতাধীন একটি বিষয় থাকল না বরং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ বদলের একটা তাগিদ দেখা দিল। এবং এই সমস্ত কিছুকে পরিচালনা করার জন্য কেন মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজন হল, এই সামগ্রিকতায় বিষয়টি ধরার চেষ্টা করলে তবেই আমরা পূর্ণাঙ্গ রূপটি বুঝতে পারব। এর জন্য প্রথমে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিন্তা-ভাবনার বিবর্তনের পথটি বুঝে নেওয়া দরকার।

Michel Foucault(মিশেল ফুকো) বলেছেন, 'আধুনিক' চিকিৎসা ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সামাজিক চিকিৎসা। 'social body'-এর কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে এটি দাঁড়িয়ে আছে। ফুকো বলেছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সমষ্টিগত লক্ষ্যে রূপান্তর নিঃসন্দেহে ধনতান্ত্রিকতার সঙ্গে যুক্ত। তিনি Varn L. Bullough-এর *The Development of Medicine as a Profession: the contribution of the Medical University to Modern Medicine* থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন মধ্যযুগে চিকিৎসা ব্যবস্থার সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সমষ্টিগত চিকিৎসার প্রয়াস প্রায় ছিলই না, বা থাকলেও খুব সীমিত পরিসরে ছিল। আঠারো শতকের শেষ বা উনিশ শতকের শুরুতে ধনতান্ত্রিকতায় 'দেহ'-কে উৎপাদনশীলতার একটি শর্ত হিসেবে দেখা হয়। 'শ্রম'-এর উৎসস্থল হিসেবে 'দেহ'-কে চিহ্নিত করা হয়। 'দেহ'-কে ঘিরে রাজনীতি আগেও ছিল। প্রাচীনযুগ বা মধ্যযুগে থেকেই রাজার 'দেহ'-এর মধ্যে সমগ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রকাশ বা বিশ্ব-প্রকৃতির শৃঙ্খলা বা অজানা

রহস্যের আধার হিসেবে 'দেহ'-কে ঘিরে নানা ধরনের জল্পনা ছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিকতায় 'দেহ'-রাজনীতিতে দৃষ্টিভঙ্গিগত এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে। দেহ ক্রমশ বিশিষ্ট জৈবিক সত্তায় পরিণত হয়ে জৈব-রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিণত হয়।[8]

উনিশ শতকের শুরুর দিকে যখন পশ্চিমি দুনিয়ায় সমষ্টিগত চিকিৎসা বা সামাজিক চিকিৎসার সূত্রপাত হয়েছিল, তখন কিন্তু দেহকে শুধু শ্রমের উৎস হিসেবে দেখে বা প্রোলেতারিয়েতের দেহ চিহ্নিত করে চিকিৎসা ব্যবস্থা আবর্তিত হয়নি। বরং উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যখন শ্রমিকের দেহ, স্বাস্থ্য এবং উৎপাদন যোগ্যতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হল তখন চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা এই খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করল। সামাজিক চিকিৎসার ধারণাটি গঠিত হওয়ার পথকে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ঘটনা প্রবাহের তিনটি পারম্পরিক এবং পর্যায়ক্রমিক ধারা বলেই ফুকো মনে করেছেন - স্টেট মেডিসিন বা রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক/চালিত চিকিৎসা, আরবান মেডিসিন বা শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা এবং লেবার মেডিসিন বা শ্রমিক শ্রেণিকেন্দ্রিক চিকিৎসা ।

ইউরোপে সামাজিক চিকিৎসা বিকাশের সার্বিক ধারার তিনটি পর্যায়

প্রথম পর্যায়

আমরা এখন সামাজিক চিকিৎসার বিকাশের সার্বিক ধারাপ্রবাহটি বোঝার চেষ্টা করব। জার্মানিতে প্রথম স্টেট মেডিসিনের ধারাটি বিকশিত হতে দেখা যায় আঠারো শতকের গোড়ার থেকেই। রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার বিকাশ, একে একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে দেখা এবং রাষ্ট্রের জন্য একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়ে তোলা--এই সবকিছুর সূচনা হয় সর্বপ্রথম জার্মানিতে। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সে নয়। এই প্রসঙ্গে মার্ক্সের একটি উক্তির কথা মাথায় আসে-

[8] Michel Foucault, *Power: Essential Works Of Foucault 1954-1984*, The Birth of Social Medicine, Penguin, UK,P-137

অর্থনীতি ইংল্যান্ডের করায়ত্ত। রাজনীতি ফরাসিদের, আর দর্শন জার্মানদের। কিন্তু এই উক্তিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের অনেক আগে সতেরো শতক থেকেই জার্মানিতে staatswissenschaft বা রাষ্ট্রের বিজ্ঞান চর্চার প্রবণতা দেখা যায়। রাষ্ট্রচালনার নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রাষ্ট্রের দ্বারা বিজ্ঞানকে চালনা করার নানারকম প্রয়াস শুরু হয়ে যায় জার্মানিতে।

জার্মানির রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এর জন্য কিয়দংশে দায়ী। উনিশ শতকের আগে জার্মানিতে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়নি। বরং বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রের মত এককের সমাহার ছিল জার্মানি। এদের ক্ষুদ্র আকৃতি, পারস্পরিক শক্তিসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা, অন্যের নিরিখে নিজেকে অবিরত ঝালিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব, নকল করার প্রবণতা-- জার্মানিতে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রচালিত/ কেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

এছাড়া জার্মানির অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। রেনেসাঁসের সময়ে এখানে বুর্জোয়াদের চমকপ্রদ অভ্যুত্থান দেখা যায়নি। অষ্টাদশ শতকেও এখানকার অর্থনীতি যথেষ্ট স্থবির অবস্থায় ছিল। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের অধীনে থেকে কাজ করাই ছিল একমাত্র পথ। স্বাধীন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অপারগ বুর্জোয়াদের বুদ্ধিবৃত্তি ও রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক সিভিল সার্ভেন্টদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে জার্মানিতে।[9] অর্থনৈতিক ভাবে অগ্রসর ইংল্যান্ড বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর ফ্রান্স এক্ষেত্রে বহু পিছিয়ে ছিল।

ষোড়শ শতকের শেষ এবং সপ্তদশ শতকের শুরুতে প্রায় সমস্ত ইউরোপের দেশগুলিই মার্কেন্টাইল মতবাদ দ্বারা পরিচালিত হত। এটি শুধু রাষ্ট্রের পক্ষে একটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ ছিল না, বরং অর্থনীতি, রাজনীতি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-- সবটাই পরিচালিত হত

[9] Ibid, page-139

মার্কেন্টালিসমের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিচালিত অর্থনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধি, উন্নত সেনাবাহিনী গঠন সব কিছুই জড়িয়ে ছিল এই মতবাদের সঙ্গে। মার্কেন্টাইল মতবাদের কার্যকারিতার পক্ষে আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থের লেনদেন-এ রাজনীতির অনুপ্রবেশ, পণ্যসামগ্রী চলাচলের স্বাধীন পরিসর এবং উৎপাদনশীল জনগণের শর্ত ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জনগণের উৎপাদনশীলতাকে সুনিশ্চিত করতে তাই ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশই নাগরিকদের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিল। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স নাগরিকদের জন্ম এবং মৃত্যুর পরিসংখ্যান নেওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিল। অবশ্য জনগণের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আর কোনও সংগঠিত পরিকল্পনা করা হয়নি। পরিসংখ্যান তৈরির মধ্যেই এই প্রয়াস থেমে ছিল। অন্যদিকে জার্মানি এক্ষেত্রে বেশ অগ্রণী চিন্তাভাবনা শুরু করে।

জার্মানিতে ১৭৫০-১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই 'মেডিকাল পুলিশ' ব্যবস্থার ধারণা জনপ্রিয় হতে থাকে। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে 'মেডিকাল পুলিশ'-রা তাদের কর্মকাণ্ডও শুরু করে। এদের কর্মকাণ্ডের বেশ একটা সুসংগঠিত রূপ রাষ্ট্রের তরফেই নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিলে। মেডিকাল পুলিশরা ডাক্তার এবং হসপিটাল থেকে রোগ সংক্রমণ ও মহামারী এবং ছড়িয়ে পড়া সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করে অসুস্থতার একটি পরিসংখ্যান তৈরি করেন। এছাড়া তারা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নজর দেন। তা হল সমগ্র দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা একরূপীকরণ, চিকিৎসকদের ডিগ্রি প্রদান এবং বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামেও চিকিৎসা ব্যবস্থার একরূপীকরণ এবং রোগীদের ওপর তা প্রয়োগের বিধান দেওয়া হয় মেডিকাল পুলিশি ব্যবস্থায়। এইভাবে রাষ্ট্রের তরফে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলা, পেশা হিসেবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণীকরণ এবং শেষপর্যন্ত ডাক্তারদের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে আসা-- এই সব কিছু মিলেই 'স্টেট মেডিসিন' বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত/চালিত প্রক্রিয়াটির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

সুতরাং, শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণির 'দেহ'-কে কেন্দ্র করে যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান তার যাত্রা শুরু করেনি 'স্টেট মেডিসিন'-এর বিকাশে তা খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যাচ্ছে। বরং সার্বিক ভাবে রাষ্ট্র চালনার অর্থনৈতিক-সামাজিক বুনটের ছবিই ধরা পড়েছে 'স্টেট মেডিসিন'-এর কার্যক্রমে। যাই হোক 'সামাজিক চিকিৎসা' গড়ে ওঠার প্রথম পর্বটি জার্মানির সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে 'স্টেট মেডিসিন'-এর বিকাশের মাধ্যমেই সম্পন্ন হল।

'সামাজিক চিকিৎসা' বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়

'সামাজিক চিকিৎসা'-র দ্বিতীয় ধাপটি সম্পন্ন হল ফ্রান্সে। আঠারো শতকের শেষ দিকে। এই বিকাশ জার্মানির মত রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় হল না; বরং সম্পূর্ণ অন্য এক ইতিবৃত্তে নগরায়ণকে কেন্দ্র করে বিকশিত হল। তাই ফুকো একে বলেছেন 'আরবান মেডিসিন'। ফ্রান্সে নগরের বিস্তারের সঙ্গে নগরকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থারও বিকাশ ঘটল। 'আরবান মেডিসিন' সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের ফ্রান্সে নগরগুলির চরিত্রের ধারণা পাওয়া খুব জরুরি।

ফ্রান্সের নগরগুলি কোনও একক কর্তৃপক্ষের দ্বারা চালিত হয়নি। বরং এই নগরগুলিতে একাধিক কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রতিভূ স্বরূপ চার্চ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে গিল্ডের কার্যকলাপ এবং শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (বিচার বিভাগ, পুলিশ ইত্যাদি) মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপস্থিতি ফরাসি শহরগুলির এক বহুমাত্রিক চরিত্র নির্মাণ করেছিল। আঠেরো শতকের শুরু থেকেই তাই শহরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার সুনিয়ন্ত্রিত, পারস্পরিক সাযুজ্যপূর্ণ এবং একত্রিত একটি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছিল। তবে শহরগুলির বহুমুখী চরিত্র এবং একাধিক স্বার্থের সংঘাত/সহাবস্থান এক্ষেত্রে অনেকগুলি বাস্তব সমস্যার উৎস হয়েছিল। এই কারণগুলি এক সময়ে শহরকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন করতে সাহায্য করেছিল।

ফ্রান্সে শহরগুলি দেশীয় এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ক্রমশ শহরগুলি উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবেও গড়ে উঠছিল। সুষ্ঠু অর্থনীতি পরিচালনার উদ্দেশ্যে শহরে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বেশ জোরদার হল। অন্যদিকে শহরের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শহুরে গরিব, শ্রমিকশ্রেণিকে প্রোলেতারিয়েতে রূপান্তরিত করছিল। বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী, গিল্ড, সংগঠন পরিচালনার বিভিন্ন নীতি দ্বন্দ্বের বাতাবরণ তৈরি করছে। ধনী-দরিদ্র, সাধারণ মানুষ- বুর্জোয়া-- এদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত শহরের বাতাবরণকে অস্থির করে তুলছে। ক্রমশ এই জাতীয় সংঘাত হিংস্র রূপ ধারণ করল, এরই চূড়ান্ত রূপের প্রকাশ দেখা গেল ফরাসি বিপ্লবে। শহুরে জনতা এবং শহরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

শহর ক্রমশ হয়ে উঠছিল আতঙ্কের উৎস, বিশেষ করে যেখানে জন সমাগম। জনসমাগম যে জনগণের নৈতিক গঠনকে নিমেষে বদলে দিতে পারে এই আতঙ্ক সর্বদা তাড়া করে বেড়াত। আবার নৈতিক বদলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল আর এক ধরনের ভয়। জনসমাগম থেকে যে বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে, সার্বিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে এই জাতীয় একটা চিন্তাভাবনাও ক্রমশ গড়ে উঠছিল। শহরের কল-কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে এবং তাদের থেকে সারা শহরে রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে, এই রকম একটা আশঙ্কা সব সময় কাজ করত শহরকে ঘিরে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অজানা আতঙ্কের কাজ করত জনমানসে। প্যারিস শহরের মাঝখানে ‘cemetary of the innocents’ এদের মধ্যে একটি। যাদের নিজেদের জন্য আলাদা কবরের স্থান কেনার সঙ্গতি ছিল না, তাদেরকে স্তূপাকারে গণকবর দেওয়া হত। ফুকো এই আতঙ্ককে বলেছেন, *‘politico-sanitary anxiety’*[10]. এখান থেকেই শহরের এই আতঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একাধারে চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত এবং রাজনৈতিক সমাধানসূত্র খোঁজার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

---

[10] Ibid, page-144

মধ্যযুগের শেষের দিকে ফ্রান্সসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্লেগ বা অন্যান্য মহামারী আটকানোর তাৎক্ষণিক বিপদকালীন নীতি হিসেবে 'কোয়ারেন্টাইন'-এর প্রয়োগ দেখা গেছিল। এই নীতি ফ্রান্সের শহরগুলিতে আবারও প্রয়োগ করা হল। কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শহরগুলিতে কোয়ারেন্টাইন সফল করার চেষ্টা করা হল শহর কর্তৃপক্ষের তরফে।

প্রথমত, শহরের সমস্ত অধিবাসীকে বাড়িতে আবদ্ধ থাকতে বলা হল। যদি সম্ভব হয়, পরিবারের সদস্যদের আলাদা আলাদা ঘরে থাকার বিধান দেওয়া হল।

দ্বিতীয়ত, শহরকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে সেখানে পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করা হল। এদের কাজ ছিল মূলত বাড়ির বাইরে কেউ বেরোচ্ছে কি না, তা লক্ষ করা। এভাবে শহরগুলির মধ্যে বিভাজন করে নজরদারির এক কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা করা হল।

তৃতীয়ত, পর্যবেক্ষকরা তাদের প্রতিদিনের খতিয়ান শহরের মেয়রকে দিতে বাধ্য থাকত। এভাবে শুধু নজরদারি নয়, নিত্যদিনের বিবরণের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় একটি তথ্যভাণ্ডারও নির্মাণ করার প্রয়াস দেখা যায়।

চতুর্থত, এই পর্যবেক্ষকরা প্রতিটি বাড়িতেই প্রত্যেকে কেমন আছে খোঁজখবর নিত, জানলা দিয়ে প্রত্যেককে দেখতে চাইত। যাকে দেখা যেত না, ধরে নেওয়া হত সে অসুস্থ। এভাবে রাষ্ট্রের নজরদারি অন্দরেও উঁকি দিত।

এরপরের তাৎক্ষণিক মেডিক্যাল নজরদারির প্রশ্ন হল, যেখান থেকে রোগ ছড়িয়েছে বা রোগীর বাড়ি কীভাবে 'স্যানিটাইজ' করা হবে! তখনকার ধারণা অনুযায়ী বাতাসের দুর্গন্ধের মাধ্যমে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে, তাই সুগন্ধি বিভিন্ন জিনিস বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে বাতাস জীবাণুমুক্ত করার একটা প্রয়াস করা হয়েছিল।

এর পরবর্তী প্রশ্ন আসছে অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে কী করা হবে। মধ্যযুগে যখন প্লেগ খুব দ্রুত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছিল, বা তারও আগে যখন কুষ্ঠ রোগকে ঘিরে বিভিন্ন আতঙ্ক মানুষকে গ্রাস করছিল, তখন দেখা গেছে প্রথমেই এই সমস্ত রোগীদের শহর থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হল। আঠারো শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সও ঠিক একই পথে পা বাড়াল। কুষ্ঠরোগীকে দূরে সরিয়ে রাখার পেছনে একটা ধর্মীয় ছুঁৎমার্গের প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। মধ্যযুগে প্লেগ রোগীদের সেনাবাহিনীর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শহর থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। আঠারো শতকে এসেও 'আরবান মেডিসিন'-এ কার্যকারিতার ধরন বদলালেও মূল বিষয়টি বদলায় না। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা, হসপিটালে ভর্তি করা, এগুলো সেই পুরোনো কোয়ারেন্টাইন মডেলেরই একটু পেলব, 'বিজ্ঞানসম্মত' রূপ।

আঠারো শতকের শেষ দিকে 'পলিটিকো মেডিক্যাল' নজরদারির আওতায় শহরের আরও কয়েকটি বিষয় খুব গুরুত্ব পায়। এর মধ্যে অন্যতম হল মৃতদেহ যথাযথ ভাবে কবর দেওয়া নিয়ে সচেতনতা তৈরি। ফুকো বলেছেন মৃতদেহকে কফিনবন্দি করে যথাযথ ভাবে কবর দেওয়ার সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ ভাবে এই সময়ের 'পলিটিকো মেডিক্যাল' নজরদারি থেকে উদ্ভূত।[11] এই সময়ে প্যারিস শহরের বাইরে কবরস্থানগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাবার্তা হতে থাকে। Antonio De Feure নামে একজন কেমিস্ট দেখাতে থাকেন কীভাবে মৃতদেহ থেকে বাতাসে দূষণ ছড়িয়ে পড়ে, যা জীবিতদের অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'cemetary of the innocents' শহরের মাঝখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। এছাড়া কসাইখানাগুলিকেও প্যারিস শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে শহরের বাইরে পশ্চিম প্রান্তে সরিয়ে ফেলা হয়।

[11] Ibid, page-147

আরবান মেডিসিন বা শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রথম পর্বেই কবরখানা বা কসাইখানার মত আবদ্ধ, শৃঙ্খলাহীন এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক জায়গাগুলিকে শহর থেকে আলাদা করার পরিকল্পনা করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায় শহরের মধ্যে বিভিন্ন সঞ্চারপথের বিষয়টিকে নজরে আনা হয়। শুধু ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের সঞ্চরণ নয়। শহরে বাতাস এবং জলের সঞ্চরণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রথমে আসে বাতাস চলাচলের বিষয়টি। আঠারো শতকে বাতাসকে রোগ পরিবহণের একটি বড় মাধ্যম হিসেবে দেখানো হত। এই সময় মনে করা হত বাতাসের মাধ্যমে রোগের জন্য দায়ী 'মিয়াস্মা' যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া বাতাসের উষ্ণতার বাড়া-কমা বা আর্দ্রতার বাড়া-কমায় এগুলি বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর বাতাস যেহেতু সরাসরি মানব দেহে নানারকম চাপ সৃষ্টি করে, তাই বাতাসের মাধ্যমে রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশি। এবারে অবশ্যম্ভাবী ভাবে শহরে স্বাস্থ্যকর বাতাস বাধাহীন ভাবে প্রবাহিত হওয়ার বিষয়টি এসে পড়ে। আগেকার পুরোনো বাড়ি, দেওয়াল, বাতাস চলাচলের পথে অন্যান্য বাধা সৃষ্টিকারী সমস্ত কিছুকে ভেঙে দেওয়া হয়; বিজ্ঞানী, ডাক্তার এবং রসায়নবিদদের পরামর্শে।

এরপরে আসছে জল সরবরাহের বিষয়টি। আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে মনে করা হতে থাকে জল-ই রোগ ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ। পরিষ্কার পানীয় জলের সঙ্গে দূষিত জলের সংমিশ্রণ আটকাতে নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি হয় প্যারিস হাইড্রোগ্রাফিক প্ল্যান। কোথা থেকে জল তুলে সরবরাহ করলে বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে সংমিশ্রণের সম্ভাবনা কম, সেই জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হয়। নদীর জল পরিষ্কার করা এবং মাটির নীচের জল পানীয় হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এখানে অবশ্য আরেকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা হল মাটির নীচের জলের মালিকানা প্রতিষ্ঠা। তখনও অবধি ঠিক মাটির নীচের সম্পদের ওপর রাজার মালিকানাই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সামাজিক মেডিসিন গড়ে ওঠার এই পর্বে শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সূত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও ক্রমশ জড়িয়ে যায়, বিশেষ করে রসায়নের সঙ্গে। ফুকো বলেছেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্রমশ একটি '*physico chemical*' বিজ্ঞানের রূপ নেয়। এছাড়া আরও একটি বিষয়ও এই পর্বে লক্ষ করার মত। চিকিৎসা বিজ্ঞান শুধুমাত্র আর মানুষ সংক্রান্ত বা দেহগত বিষয় থাকে না। এর সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হয়ে যায় বাতাস, জল, পচন, ফার্মেন্টেসন ইত্যাদি আরও নানান বিষয়। 'environment' শব্দটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়নি। চিকিৎসা বিজ্ঞান এই পর্বে বরং জীবিত অস্তিত্বের সুষ্ঠু সঞ্চালনের বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। তবে ফরাসি বিপ্লবের ঠিক আগের থেকে ফ্রান্সে '*salubrity*'-র ধারণা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ফ্রান্সে **১৭৯০-১৭৯১** খ্রিস্টাব্দ নাগাদ Constituent Assembly (কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) ফ্রান্সের প্রধান শহরগুলিতে '*salubrity committee*' – তৈরি করে। '*salubrity*'- শব্দের অর্থ ঠিক শরীরকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নয়। বরং সার্বিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে চিকিৎসা বিজ্ঞান-সহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ করে পরিবেশের বিভিন্ন কার্যকারণের সঠিক নিয়ন্ত্রণকেই এর মাধ্যমে বোঝানো হয়। সুতরাং সামাজিক মেডিসিনের বিবর্তনের পথে এই 'Urban Medicine' পর্বে জনস্বাস্থ্য বিষয়টিও ক্রমশ সচেতনতার আলোতে আসতে থাকে। জনস্বাস্থ্য ক্রমশ পরিবেশের বিজ্ঞানসম্মত ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

সামাজিক মেডিসিন তৈরির ক্ষেত্রে আরবান মেডিসিন তৈরি হওয়ার এই পর্বটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আগের পর্বের জার্মানির স্টেট মেডিসিনের মত এটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে প্রযুক্ত নয়। অনেক ছোট পরিসরে এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব জড়িত না থাকায় আরবান মেডিসিনকে তার বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিশেষত, কোনও পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে সংঘাতের প্রশ্নে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব মুশকিল হয়ে উঠেছিল। তবে

এই পর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটল সামাজিক মেডিসিনের গড়ে ওঠার পথে। সুস্বাস্থ্য যে শুধুমাত্র ব্যক্তিতে আবদ্ধ নয়, এমনকি শুধু 'দেহ'-তেও আবদ্ধ নয় সেই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হল। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিবেশের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি গুরুত্ব পেল।

'সামাজিক চিকিৎসা' বিকাশের তৃতীয় পর্যায়

'সামাজিক চিকিৎসা' গড়ে ওঠার তৃতীয় পর্যায়ে ইংল্যান্ডে *'Labor Medicine'* বা শ্রমিক শ্রেণির দিকে লক্ষ্য রেখে চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। জার্মানিতে তৈরি হওয়া স্টেট মেডিসিন বা ফ্রান্সের আরবান মেডিসিনে আলাদা করে গরিব বা শ্রমিকদের কেন্দ্র করে চিকিৎসার কথা ভাবা হয়নি। অবশ্য হঠাৎ করে একদিনে দরিদ্ররা চিকিৎসার লক্ষ্য বস্তু হয়ে উঠেছিল এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই দরিদ্রদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার নানারকম তাগিদ উদ্ভূত হয়।

প্রথমত, আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে ফরাসি বিপ্লবের সময় শহরে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা কর্তৃপক্ষের কাছে খুবই ভয়ের উৎস হয়ে উঠতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ব্যবস্থাপনার দিকে একটা পরিবর্তন আসে। আগে যে কাজগুলো 'দরিদ্র'-রা করত, (যেমন - খবর আদানপ্রদান), সেগুলি ক্রমশ কেন্দ্রীয় তরফে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে করা হতে থাকে (যেমন - পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট)। ফলে 'দরিদ্র'-রা তাদের পুরোনো জীবিকা হারিয়ে আরও দরিদ্র হয়ে যেতে থাকে। এদের জীবনধারণের মানও খারাপ হতে থাকে। দরিদ্ররা ক্রমশ শহরের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে থাকে।

তৃতীয়ত, ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের সমগ্র ইউরোপ জুড়ে কলেরা ছড়িয়ে পড়া এবং প্রায় মহামারীর রূপ ধারণ করা শহরে দরিদ্রদের উপস্থিতি নিয়ে চিন্তা আরও বাড়িয়ে দেয়।

এরপরে ইউরোপের শহরগুলির বাহ্যিক রূপের এক ব্যাপক রদবদল দেখা যায়। দরিদ্রদের বাসস্থান পৃথকীকরণ করার এক ব্যাপক প্রয়াস যদিও কিছু 'রাজনৈতিক' সমস্যার জন্ম দেয়। শহরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তার সাপেক্ষে সঙ্গতি রেখে 'Public Property' ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু দরিদ্রদের নিয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা তখনও দরিদ্রদেরকে শহরের 'সুস্বাস্থ্য'-রক্ষার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেনি।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে সে দেশের শহরগুলিতে প্রোলেতারিয়েতের সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বার্থে দরিদ্রদের নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তার জন্ম দেয়। ইংল্যান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এটি নতুন হলেও এমন মনে করার কোনও কারণ নেই যে, সামাজিক মেডিসিন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়, এই ভাবনাচিন্তা একেবারে নতুন। কিছু আগে জার্মানিতে জন্ম নেওয়া রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বা ফ্রান্সের শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসার ধরনের একটা বড় সমন্বয়ী প্রভাব থেকে গেছিল ইংল্যান্ডের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেওয়া শ্রমিক শ্রেণির চিকিৎসা ব্যবস্থায়। জার্মানির রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল বৃহদাকার একটি প্রকল্প। এর জন্য প্রকল্প রূপায়ণ ও বাস্তবায়নে বেশ কিছু সমস্যা থেকে গেছিল। অঞ্চল ভিত্তিক কার্যক্রমের কথা সেভাবে ভাবা হয়নি। অন্যদিকে ফ্রান্সের শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অভাব অনেক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবস্থান যদি কোনও ক্ষেত্রে বাধার জন্ম দিত, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অভাবে সেক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্তে আসা সমস্যার বিষয় হয়ে উঠত। তবে সামাজিক মেডিসিন গড়ে ওঠার এই দুই পর্বে সমাজের কোনও বিশেষ শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি।

ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম Poor Law-এর মাধ্যমে দুর্ভাগ্যপীড়িত-দরিদ্রদের বিশেষ চিকিৎসাগত সুবিধার সাহায্য করার কথা বলা হয়। অবশ্য দরিদ্রদের এই বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নামে

তাদের চিকিৎসাগত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসার বিশেষ সুযোগ দিয়ে এদের সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার এই দাবি যে নেহাতই জনহিতকর, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। কর প্রদানকারী বিত্তশালী জনতা এবং তাদের সরকারি প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতেও এই ধরনের দরিদ্রদরদি পন্থা অবলম্বন করেন। কারণ রোগের প্রাদুর্ভাব তো শুধু সমাজের একটা শ্রেণিকে লক্ষ করে দেখা দেয় না, বরং তা ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বস্তরে। তাই দরিদ্রদের অস্বাস্থ্যের মোকাবিলায় বিশেষ সাহায্যের হাত-- প্রকারান্তরে নিজেদের রক্ষার স্বার্থেই। অন্যদিকে দরিদ্ররা তাদের আর্থিক অসঙ্গতির জন্য যে ধরনের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হতে পারত, Poor Law তাদের সেই সুযোগ করে দিল। এই আইন শহরের ধনী এবং দরিদ্রদের স্যানিটারি পরিষেবা ব্যবহারের অধিকার সুস্পষ্ট দুই ভাগে ভাগ করে দিল। সেই সঙ্গে Poor Law সামাজিক মেডিসিন গড়ে ওঠার পর্বে শ্রমিক শ্রেণিকে সুরক্ষিত করার সোপান তৈরির মাধ্যমে এই যাত্রাকে একটা অবয়ব দিল।

শ্রমিককেন্দ্রিক এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই জড়িয়ে যেতে লাগল বিভিন্ন জটিল কার্যক্রম। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে John Simon(জন সিমন) এই ব্যবস্থাটি কার্যকর করার জন্য সরকারি তরফে কিছু নিয়ম-কানুনের পরিকল্পনা করেন। এর ভিত্তিতে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে হেলথ্ সার্ভিস ও হেলথ্ অফিসারদের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়। উনিশ শতকের শেষে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় মাথায় রেখে আরও বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা করা হয়।

প্রথমত, ভ্যাকসিন কাদেরকে কীভাবে দেওয়া হবে, সেই নিয়ে সুপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রোগ এবং মহামারী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়াস করা হয়। কোন রোগ কোথায় হচ্ছে, কত লোক মারা যাচ্ছে, তার পরিসংখ্যান তৈরির মাধ্যমে এর একটা হদিশ রাখার চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয়ত শহরের অস্বাস্থ্যকর জায়গাগুলিকে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রয়োজনে ধ্বংসও করা হয়।

সামগ্রিক দিক থেকে খতিয়ে দেখতে গেলে, Poor Law-এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই শ্রমিকশ্রেণিকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা যে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমনটা নয়। বরং সমাজের সকল স্তরকেই চিকিৎসকরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখতেন। আবার ফ্রান্সের শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসা ছাড়াও সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত হিসেবে যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছিল, সেগুলিকেও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হল। সামাজিক পরিবেশের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার কথা এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তবে এই প্রচেষ্টায় ভ্যাক্সিন প্রয়োগের নজরদারি, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানের তদারকি এবং রোগের বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণিকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষের এই নজরদারি অচিরেই শ্রমিকদের উষ্মার কারণ হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে তাই এই আইনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিক্ষোভ দেখা যায়। ফুকো বলেছেন উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই দরিদ্র জনতার মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা বিরোধী একটা কন্ঠস্বর উঠে আসতে থাকে। R.M.Macleod(আর.এম.ম্যাকলিয়ড), ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে *Public Law* নামের একটি জার্নালে এই বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন।

শ্রমিকদেরকে শ্রমদানের উপযোগী একটি শ্রেণিতে পরিণত করা এবং বিত্তবান শ্রেণিকে এদের কুস্বাস্থ্যের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছিল এই শ্রমিকশ্রেণি কেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থায়। এই ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন প্রবণতার মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। একদিকে শ্রমিকশ্রেণির সার্বিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার একটা জনহিতকর প্রচেষ্টা, অন্যদিকে সার্বিক ভাবে বিভিন্ন রোগ বা মহামারীর মোকাবিলা করার জন্য দেশের সমস্ত জনগণকেই ভ্যাকসিন প্রদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এছাড়াও যারা খরচ

বহন করতে পারবে তাদের ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করাতেও রাষ্ট্রীয় স্তরে কোনও আপত্তি ছিলনা ইংল্যান্ডে।

সুতরাং সার্বিক আলোচনা থেকে আমরা একটি বিষয় খুব স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পারছি যে, ইংল্যান্ডের এই শ্রমিক শ্রেণিকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আসলে শ্রমিকদের তার নিয়ন্ত্রণের উপাত্তে পরিণত করলেও এটি বরং দেশের বিত্তশীল জনতার স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছিল। অন্যদিকে এর কার্যকারিতার সাফল্য সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করলে আমরা সামাজিক মেডিসিন গড়ে ওঠা এবং এর সঙ্গে ক্রমশ মিউনিসিপ্যালিটির জড়িয়ে পড়ার ইতিবৃত্তও বুঝতে পারব।

প্রথম পর্যায়ে জার্মানির রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে নির্দিষ্ট করা এবং সেগুলির বাস্তব সমাধান সূত্র খোঁজায় কিছু সমস্যা থেকে গেছিল। অন্যদিকে পরিকল্পনার দিক থেকে ফরাসি শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এগিয়ে থাকলেও নির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অভাবে কোনও প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ইংল্যান্ড এই দু'টি সমস্যা সমাধানের সঠিক মেলবন্ধন করতে পেরেছিল। সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রক্রিয়া গড়ে ওঠার পথে ইংল্যান্ডের এই ব্যবস্থা 'জনহিতকর' কর্মকাণ্ড, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যবস্থার এক মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিল।

ফরাসি শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকেই একটা বিষয় ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল যে চিকিৎসা এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষা শুধুমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন একটি বিষয় নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও নানান বিষয়। সুস্বাস্থ্যের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা শহরগুলিতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা-- সব মিলিয়ে সামাজিক চিকিৎসা আর শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় থাকে না। এর মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে। চিকিৎসকদের পাশাপাশি প্রযুক্তিবিদরাও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এর সঙ্গে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। সুতরাং সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদে শহরগুলির কিছু পরিবর্তন এবং

নাগরিক অভ্যেস বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আমরা পর্যায়ক্রমে এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব এবং কীভাবে এর মধ্যে নাগরিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে মিউনিসিপ্যালিটির অনুপ্রবেশ ঘটল সেটাও অনুসন্ধান করব।

উদারতন্ত্রের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোয় জনস্বাস্থ্যের ভাবনা: স্বাধীন চলাচলের ক্ষেত্র হিসেবে শহরের পুনর্বিন্যাস ও রাষ্ট্রের নজরদারি

এখন আমরা বরং সামাজিক চিকিৎসাবিধানে শহরগুলির রদবদল এবং এক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার অবতারণার বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি।

আমরা সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থার বৃহত্তর ইতিবৃত্ত বোঝার আগে কতগুলি পূর্বশর্ত সম্পর্কেও আর একটু ওয়াকিবহাল হয়ে নিই। ফুকো তার লেখায় দেখানোর চেষ্টা করেছেন আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের শুরুতে সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পদ্ধতি কীভাবে মধ্যযুগীয় ব্যক্তি/দেহ কেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার থেকে পৃথক। এখানে আমাদের আরও দু'টি বিষয়ের কথা মাথায় রাখতে হবে। ক্ষমতা প্রয়োগ/সঞ্চালনের 'উদারনৈতিক' সঞ্চারপথ এবং শহরগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। এই দু'টি বিষয় খুব উল্লেখযোগ্য।

Patrick Joyce(প্যাট্রিক জয়েস), তার *'The Rule of freedom Liberalism And the Modern City'* বইতে, দেখিয়েছেন ইংল্যান্ডের শহরগুলিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা 'Technosocial Network' কীভাবে শহরগুলিতে উদারনীতির চলন এবং তার পূর্বশর্ত নির্মাণের বাস্তব রূপ হয়ে উঠল। [12]এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় লক্ষ করার মত, শহর ক্রমশ সমস্ত গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে থাকে। সামাজিক চিকিৎসার বিকাশ, শহরের বাতাবরণ পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে শহর পরিচালনার 'কর্তৃপক্ষ' ও তার কর্মকাণ্ডে

[12] Patrick Joyce, *The Rule of freedom Liberalism And the Modern City*, Verso, UK, 2003, Page-14

অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া 'নাগরিকত্ব' উদারনীতির স্বাধীন চলাচলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল।

উদারনীতিবাদ ফলপ্রসূ হয়ে ওঠার জন্য তথ্য, বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যবস্থার স্বাধীন চলাচলের প্রয়োজন ছিল। যাতে 'সাবজেক্ট'-রা স্বতঃসিদ্ধ 'স্বনিয়ন্ত্রিত' বলে নিজেদের মনে করতে পারে। প্যাট্রিক জয়েস বলেছেন এই সময় শহরের মধ্যেও 'প্রাকৃতিক' দুনিয়ার সঙ্গে সাযুজ্য খোঁজার নানারকম প্রয়াস দেখা যায়। ধর্মতত্ত্বের দিক থেকেও এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হতে থাকে। William Paley(উইলিয়ম প্যালে) প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দুনিয়ার সংযোগ স্থাপনে আধ্যাত্মিকতার অনুষঙ্গ আনেন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুনিয়ার যোগসাজসের এই তত্ত্ব সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন চিন্তাকেও প্রভাবিত করে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক Richard Whately(রিচার্ড হোয়েট্‌লি) লেখায় সামাজিক-রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিকের পারস্পরিক সম্পর্কের আভাস পাওয়া বক্তব্য ইউনিটারিয়ানদেরকেও বেশ প্রভাবিত করে। W.C.Taylor(ডাবলু.সি. টেলর) তাঁর *'Natural History of Society in the Barbarous and Civilised State'* বইতে দেখান সমাজ প্রাকৃতিক ইতিহাসের স্তর থেকেই উদ্ভূত। তাই সভ্যতাই বরং প্রাকৃতিক পরিণতি, বর্বরতা নয়। আর এর পরিপ্রেক্ষিতেই আরেকটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবে চলে আসে। সভ্যতার অগ্রগতির পথ কীভাবে নির্ধারিত হবে? এর উত্তরে টেলর বলেন, যে পথে চললে দ্রুত এবং স্বাভাবিক গতিতে সভ্যতার অগ্রগতি হবে সেই পথই সে চয়ন করবে। এখান থেকে আমরা যদি আবার উদারনীতিবাদের পূর্বশর্ত হিসেবে স্বাধীন চলাচলের দাবিতে ফিরে যাই, তাহলে এর খানিকটা যৌক্তিকতা খুঁজে পাব।[13] শহরকে উদারনীতির সচল কক্ষপথ হিসেবে বেছে নেওয়া হল; কারণ পশ্চাদ্‌পদতার বিপ্রতীপে অগ্রগতির তত্ত্বটি এর সঙ্গে বেশ খাপ খায়।

[13] Ibid, page-63

ডাবলু.সি. টেলর-এর আরেক অনুগামী Robert Vaughan(রবার্ট ভন) তাঁর *'The age of Great Cities'* (১৮৪৩), বইতে দেখান এই সময়ে ইংল্যান্ডে শহরকেন্দ্রিকতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। শহরগুলিতে যোগাযোগ, সংমিশ্রণ এবং বহমানতার সুযোগ তৈরি হচ্ছিল। এরই ফলস্বরূপ, শহরগুলি ক্রমশ সমগ্র দেশের বুদ্ধিমত্তার সম্মিলিত রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। শহরগুলিতে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সভা- সমিতি-সংগঠন আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এরই সূত্র ধরে শহরগুলিতে নাগরিকতাও বিকশিত হতে থাকে। উল্লেখ্য, Friedrich Engels(ফ্রেড্রিক এঞ্জেলস্)-ও ভিন্ন প্রেক্ষিতে শহরকে 'সামন্ততন্ত্র' থেকে আধুনিকতায় রূপান্তরের সোপান হিসেবে দেখেছেন। রবার্ট ভন অবশ্য ইংল্যান্ডের শহরগুলিকে একটু বেশি-ই সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন। শহরকে কেন্দ্র করে সব কিছু আপন নিয়মে বিকশিত হয়নি, বরং 'উদারনীতি' তার বিকাশের সুবিধার্থে শহরগুলিকে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়াস করে। প্যাট্রিক জয়েস তাঁর বইতে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে 'স্বাধীন চলাচল'-এর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। সমসাময়িক সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পথে শহরগুলির স্বাস্থ্যসম্মত পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা আগেই আলোচনা করেছি। এখন ইংল্যান্ড, যেখানে শ্রমিক শ্রেণিকেন্দ্রিক সামাজিক চিকিৎসার বিকাশ ঘটে সেখানকার শহরগুলির পুণর্বিন্যাসের চরিত্রটি একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি।

এই সময়ে শহরগুলিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে 'দেহ' হিসেবে দেখা হতে থাকে। এই ভাবে শহরকে ঘিরে ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা মেলবন্ধন ঘটে দেহগত চিন্তায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তরফ থেকে শহরের দেহের মধ্যে ক্রমাগত তরল পদার্থের সঞ্চালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রকারান্তরে এটি উদারনীতিবাদ প্রসূত 'স্বাধীন চলাচল'-এর ধারণার সঙ্গেও মিলে যায়।

Thomas Southwood Smith(তমাস সাউথউড স্মিথ) এই সময়ের 'Sanitary Reform'-এর একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখান জীবিত জীবাণুদের অস্তিত্ব

অঙ্গাঙ্গী ভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। তাই ‘স্যানিটেশন’-কে একটি সামাজিক প্রশ্ন হিসেবেই তিনি দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। এখানে তিনি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের অবতারণা করেন, যার ভিত্তিতে ইংল্যান্ডে শহরগুলিতে স্যানিটেশন সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা এক অন্য মাত্রা পায়। তিনি দেহের ‘শারীরবিদ্যাগত বাস্তবতা’-র সঙ্গে, শহরের দেহের তুলনা করেন। এই প্রসঙ্গে শহরের রাস্তা-ঘাট, জলাশয়, ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটির বিবরণ দিয়ে বিস্তৃত মানচিত্র তৈরি এবং তার পাঠ বিশেষ গুরুত্ব পায়। মানচিত্র যেন এক ব্যবচ্ছেদ করা দেহের চিত্ররূপকে প্রকাশ করে। মানব দেহ এবং শহরের দেহকে সমরূপ আলোচনার পরিসরে নিয়ে আসা হয়। এদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার কার্যকলাপকেও সমপরিসরে নিয়ে আসা হয়। পাব্লিক স্ফিয়ার ও প্রাইভেট স্ফিয়ার পরস্পর সমান্তরালে চলতে থাকে। তাদের পারস্পরিক কার্যকলাপের সমরূপক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। টাউন অ্যাসোসিয়েশনের মূল কাজই হয়ে ওঠে শহরের ‘অত্যাবশ্যক’ কাজ হিসেবে শহর পরিষ্কার রাখা, বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করা, বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ করা বিশেষ গুরুত্ব পায়। Alian Corbin(অয়ালেন করবিন) এই সামগ্রিক ব্যবস্থাকে ‘civic toilette’ বলে অভিহিত করেছেন।[14]

রোগ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে শহরকে ক্রমশ বহমান, জঙ্গম এবং সঞ্চালনের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হতে থাকে। তরল পদার্থের প্রবহমানতার সঙ্গে শহরের ‘দেহ’ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়। শহরের স্যানিটেশনকে ঘিরে ‘হাইড্রোলিক সিটি’-র ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশ আর প্রতিবেশ স্বাস্থ্যরক্ষা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের নজরে আলাদা কোনও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে না, বরং সামগ্রিক প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হয়ে ওঠে। সঞ্চালনের মাধ্যম হিসেবে ড্রেন, জলের পাইপ এবং বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রাইভেট এবং পাব্লিক স্ফিয়রের বিভেদ বা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এগুলির স্থানিক ভূমিকা।

[14] Ibid.,65

এই ভাবে ব্যক্তির আবাসগৃহগুলি স্যানিটারি একতার মাধ্যমে সরাসরি নজরদারির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দাবি আর শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়ান ছুঁৎমার্গের বিষয় থাকে না। বরং সরকারি কর্তৃত্বেরও ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রাত্যহিক কিছু নৈতিক অভ্যেস, বাড়িতে কলের জল বা অন্যান্য সুবিধার বাস্তবতায় আর শুধুমাত্র 'ডিসিপ্লিন'-এর বিষয় হয়ে থাকে না।[15] গৃহ ও পরিবারের ঘেরাটোপে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন বাস্তবতায় ব্যক্তির 'এজেন্সি'-র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে থাকে রাষ্ট্র। পরিষেবার এই জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে গৃহ-ব্যক্তি-পরিবার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অভিনব এক যোগসূত্র তৈরি হয়। তবে এই যোগসূত্র গঠনের সঞ্চারপথ খুব সরল ছিল, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। নতুন তৈরি হওয়া 'জনস্বাস্থ্য'-এর ধারণার সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক হবে, সেটা নির্ধারণ করা নেহাত সহজ ছিল না। আর তাই এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়ার পথ ছিল আরও জটিল।[16]

'স্যানিটেশন'-এর প্রয়োজনে শহরে প্রযুক্তির প্রয়োগ: কেন্দ্রীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রযুক্তির দ্বন্দ্ব, ফলে স্থানীয় স্তরে মিউনিসিপ্যালিটির প্রয়োজনীয়তা

'জনস্বাস্থ্য'-এর সার্বিক প্রেক্ষাপটে 'রোগ' ও 'স্বাস্থ্য'-কে ঘিরে তৈরি হওয়া দোলাচল নানা ডিসকোর্সের জন্ম দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রোগকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা, স্বাস্থ্যহীনতাই যে রোগ বা রোগহীনতাই যে স্বাস্থ্য এরকম একটি ধারণার জন্ম দিয়েছিল।[17] এই ধারণা থেকেই আমরা আবার ফুকোর বাতলানো আধুনিক উদারতান্ত্রিকতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসার বদলে সামাজিক চিকিৎসার বিকাশের সূত্রপাত—এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা খুঁজে পাই। স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গে তা পারিপার্শ্বিকের যোগাযোগ আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বাস্থ্যরক্ষার লক্ষ্যে শহরগুলি সমস্ত গুরুত্ব আকর্ষণ করে নেয়। শহরগুলি আর নজরদারির কেন্দ্রবিন্দু থাকে

[15] Ibid.,68

[16] Ibid.,68

[17] Ibid.,68

না, বরং নজরদারির মূল পরিসরে পর্যবসিত হয়। উদারনৈতিক বাতাবরণে শহরগুলি শাসনতান্ত্রিকতা বা স্বাস্থ্যরক্ষার ওজরে এক নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

উদারনীতির বাতাবরণে 'জনস্বাস্থ্য' রক্ষার তাগিদে 'স্যানিটেশন' বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। শ্রমিক এবং দরিদ্রদের কাজের ধরন, দারিদ্র্য, অপুষ্টি-- এই সবের থেকেও শহরের ব্যবস্থার মধ্যেই যে রোগের উৎস এবং নিবৃত্তি লুকিয়ে আছে এই ধারণাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আলোচনার শুরুতেই লক্ষ করেছিলাম 'স্যানিটেশন' শব্দের উৎপত্তি। দেখেছিলাম উনিশ শতকে এই শব্দটি ল্যাটিন থেকে ইংরেজি ভাষায় আসে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই শব্দটি একটি প্রবণতারই দ্যোতক হয়ে উঠেছে।

ল্যাটিনে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে - 'Mens sana in corpora sano'...এর অর্থ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেহে সুন্দর মনের আবাস। এই সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে শব্দতাত্ত্বিক ভাবেই 'sanity' শব্দটি যুক্ত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'sanity'-র মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেহটি কার? এই সময়ে মানব দেহকে ঘিরে যে ভাবনা বিবর্তিত হয়েছে তা নেহাতই পুরুষের দেহ। পরিবার, মহিলা বা শিশুদের 'দেহ' কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা তৈরি হবে আরও অর্ধেক শতাব্দী পরে।[18] কিন্তু ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নানান সামাজিক শর্ত, যার প্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছিল সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রেক্ষিত।

জনস্বাস্থ্যের প্রেক্ষিতে রোগ নিরাময়ের নতুন ধারণায় স্যানিটেশনের অনুষঙ্গ দারিদ্রের ধারণাকেও পুনর্নির্মাণ করে। দরিদ্ররা যেন স্যানিটেশনের ধারাস্নানে পবিত্র হয়ে ওঠে। সুতরাং শহরের স্যনিটেশন সংক্রান্ত কার্যাবলী দারিদ্রকেও ঢেকে রাখার একটা প্রয়াস বৈকি! রোগের থেকে সুস্থতা সম্ভব এবং শহর পরিচালনের স্যানিটারি কর্তৃত্বেই সেই সমাধান সূত্র লুকিয়ে আছে।

[18] Ibid.,67

চ্যাডউইক তার স্যানিটারি সংস্কারে এই বিষয়টি-ই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই ধারণায় আয়ারল্যাণ্ডের কুখ্যাত জ্বর যে আসলে মানুষের সীমাহীন দারিদ্রের ফল, তা মানুষের মন থেকে ধুয়ে মুছে দেওয়া হয়। দারিদ্রের বদলে স্যানিটেশনের দিকে মানুষের দৃষ্টির মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই ধারণাটি চ্যাডউইকের সময় রাজনীতির কেন্দ্রস্থল থেকে আঞ্চলিক স্তর অবধি আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। চ্যাডউইক এবং তার ‘General Board Of Health’-এর ইন্সপেক্টরা ‘স্যানিটেশন’-এর ধারণাকে পার্লামেন্টেও জনপ্রিয় করে তোলে। এই ইন্সপেক্টররা যদিও টাউনগুলিতে একেবারে নবাগত ছিলেন। তাঁরা একটা নৈতিক তাড়নায় চালিত হতেন, এমনটাই Hamilton দেখিয়েছেন। [19]

তবে যে ‘স্যানিটেশন’-এর ধারণাকে চ্যাডউইক বা তার অনুগামীরা এত জনপ্রিয় এবং পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়ে আনলেও এর বাস্তব প্রয়োগের সময় এই ‘স্যানিটেশন’ শুধুমাত্র আর চ্যাডউইক বা তার অনুগামীদের হস্তগত থাকে না। একদিকে শহরগুলির মিউনিসিপ্যালটির কাছেই যে শুধু এর কর্তৃত্ব তারা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন, অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারদের এই ‘পাইপ-ড্রেন-এর সাম্রাজ্য’ নির্মাণে কিছু আঞ্চলিক, তাৎক্ষণিক এবং বাস্তব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। ১৮৫২-৫৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি সময়ে চ্যাডউইকের নৈতিকতার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মকাণ্ডের বেশ তফাত হয়ে যায়। এই নিয়ে খানিক বিরোধের বাতাবরণও তৈরি হয়।

চ্যাডউইক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের মতবিরোধের একটি প্রলম্বিত প্রেক্ষিত ছিল। এই বিরোধের মধ্যেই

চ্যাডউইকের সময়কার বিভিন্ন স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যাবলীর একটা সুস্পষ্ট নৈতিক, তাত্ত্বিক এবং বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

[19] Ibid.,68

ইংল্যান্ডের স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যাবলীর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চ্যাডউইকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে জল সরবরাহ এবং বর্জ্য পদার্থ নির্গমনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ তাঁর আমলে বিশেষ গুরুত্ব পায়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে দেখা যায়, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস-এর জল সরবরাহ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ বাবদ প্রায় একশো মিলিয়ন পাউন্ড ধার। পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য,এই বিপুল খরচের খতিয়ান দেখে মনে হতে পারে যে পর্যাপ্ত কাজের এবং রোজগারের সুযোগ পেয়ে ইঞ্জিনিয়াররা হয়ত চ্যাডউইকের ওপর ভীষণ সন্তুষ্ট ছিল।

পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে বিষয়টি যে আদপে সেই রকম ছিল না, তা ক্রমশ স্পষ্ট হবে। বরং ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণকে কেন্দ্র করে চ্যাডউইকের সঙ্গে বেশ বিরোধের সূত্রপাত হয় Institution of Civil Engineers প্রতিষ্ঠানটির সদস্য প্রথিতযশা জনপ্রিয় ইঞ্জিনিয়ারদের।[20] চ্যাডউইক চেয়েছিলেন কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত সমস্ত দেশ জুড়ে এক রকম ড্রেনেজ ব্যবস্থা। অন্যদিকে, ইঞ্জিনিয়াররা অঞ্চল ভেদে বাস্তব পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন রকম ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপক্ষে মত দিয়েছিলেন। চ্যাডউইকের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারদের বিরোধের তাত্ত্বিক একটি ক্ষেত্রও নির্মিত হয়েছিল। চ্যাডউইকের লক্ষ্য ছিল যে কোনও মূল্যে স্যানিটেশন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারদের লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক নাগরিক কমিটির কাছে এই প্রকল্পগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করা। চ্যাডউইক ইঞ্জিনিয়ারদের এই বাজারি দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বরদাস্ত করতে পারতেন না। ড্রেনেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকেও তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের মতামতকে কটাক্ষ করেন। চ্যাডউইকের মতে ইঞ্জিনিয়ারদের পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে ঠিক স্যানিটেশন-এর উপযোগী বাতাবরণ তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই

[20] Christopher Hamlin, Edwin Chadwick and the Engineers, 1842-1854: Systems and Antisystems in the Pipe-and-Brick Sewers War, Technology and Culture, Vol.33, No.4. (Oct, 1992), http://links.jstor.org/sici?sici=0040-165X%28199210%2933%3A4%3C680%3AECATE1%3E2.0.CO%3B2-A

pp -681

ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণে ইঞ্জিনিয়ারদের দেওয়া বিধানের থেকে চ্যাডউইক ভরসা করেছিলেন স্যানিটেশনের সার্বিক মতাদর্শ এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের ওপর। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে চ্যাডউইকের সঙ্গে Institution of Civil Engineers প্রতিষ্ঠানটির ইঞ্জিনিয়ারদের বিবাদ লেগেই ছিল। চ্যাডউইক বরং তার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রান্তিক, ততটা জনপ্রিয় নন এইরকম কিছু ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর নির্ভর করেন। এই ইঞ্জিনিয়ারদের প্রভাবেও চ্যাডউইক বেশ প্রভাবিত হন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ইংল্যান্ডে ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে রীতিমত দু'টি বিবদমান গোষ্ঠী। একদিকে চ্যাডউইক এবং তাঁর অনুগামীদের চাহিদা পাইপের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন, অন্য দিকে দেশের প্রথিতযশা ইঞ্জিনিয়ারদের বিশেষ করে Thomas Hawksley (থমাস হকস্‌লে) বা Joseph Bazalgette(জোসেফ ব্যাজেলগেট)-এর দাবি ছিল, ইঁটের তৈরি ড্রেনের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ নিষ্ক্রমণ। কালক্রমে এই পাইপ বনাম ইঁট নির্মিত ড্রেনের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ নিষ্ক্রমণের দাবিকে কেন্দ্র করে রীতিমত জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। C. Hamlin(সি হ্যামলিন) তাঁর *'System and antisystem in the Pipe-and-brick sewers War'*, প্রবন্ধে এই ঘটনাকে 'Pipe-and-brick sewers war' বলেছেন।

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে চ্যাডউইক, General Board Of Health-এর প্রধান সদস্য হয়ে ওঠেন। সার্বিক ভাবে জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বর্জ্য পদার্থ ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ব্রিটেনের কলেরার প্রাদুর্ভাব তাঁকে এই বিষয়ে দৃকপাত করতে বাধ্য করেছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য ১৮৪৩-৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এই বিষয়ে Royal Commission on the Health of Large Towns and Populous Places এই বিষয়ে একটি অনুসন্ধান করে। এই কমিশন জানায় ইংল্যান্ডের অনেক বড় শহরেই ড্রেন আছে। এগুলি উপরিভাগের জল সরাতে পারলেও বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করতে পারে না। ফলস্বরূপ বর্জ্য পদার্থের পচন হয়ে তার থেকে প্রচণ্ড রকমের দুর্গন্ধ নির্গত হয়। চ্যাডউইক পরিকল্পনা করেন ড্রেন ব্যবস্থাকে

এমন ভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে কখনওই এখানে দূষিত পদার্থ জমতে না পারে। অবিরত সঞ্চালনের মাধ্যমে শহরের এই শিরাগুলি বহমান থাকবে। তিনি আরও ভাবেন, শহরের দূষিত পদার্থ যদি রিসাইকেল করে গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তাহলে ব্যবস্থাটি সার্বিক ভাবে লাভজনক হবে। আর এই বর্জ্য পদার্থের অবিরত সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজন অবিচ্ছিন্ন জলের জোগান, যার তরল মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ গুলি দ্রবীভূত হয়ে নিষ্কাশিত হবে। চ্যাডউইক, এখান থেকেই ভাবতে শুরু করেন পরিষেবাগুলি যদি কেন্দ্রীয় ভাবে একটি অভিন্ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সমগ্র ব্যবস্থাটির সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব।

চ্যাডউইকের প্রকল্পগুলির বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্যও প্রয়োজন ছিল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাযুক্তিক সহায়তা। এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর গুটিকয়েক পছন্দের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। প্রথম দিকে চ্যাডউইকের সব থেকে পছন্দের এবং আস্থাভাজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন John Roe (জন রো)। তিনি ইটের তৈরি ডিম্বাকৃতি ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাস করতে বলেন। এছাড়া তিনি কিছু দূর অন্তর অন্তর Flushing-এর মাধ্যমে ড্রেন পরিষ্কারের ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা করতে বলেন, যাতে কোনও ভাবেই বর্জ্য পদার্থ জমতে না পারে।

Sewer Commission-এর Surveyors-রা এই ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও, লন্ডন শহরের Institution of Civil Engineers-এর ইঞ্জিনিয়াররা স্বাগতই জানিয়েছিলেন। তাই চ্যাডউইকের সঙ্গে তখন ইঞ্জিনিয়ারদের তীব্র বিরোধিতার সূচনা হয়নি। বিবাদ শুরু হয় কিছু দিন পর থেকে। নটিংহ্যাম শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মিত হয়েছিল প্রযুক্তিবিদ থমাস হকস্‌লের পরিকল্পনা অনুসারে। প্রকল্পটির সাফল্য দেখে চ্যাডউইক, থমাস হকস্‌লেকে বিভিন্ন শহরে গ্যাস, জল সরবরাহ, ড্রেনের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা এবং এই বর্জ্য পদার্থ রিসাইকেল করে গ্রামাঞ্চলে চাষের জমিতে ব্যবহারের জন্য একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের দায়িত্ব অর্পণ করে, Towns Improvement Company-র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

করেন। এই প্রকল্পগুলি কীভাবে কার্যকর করা হবে তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে অচিরেই বিরোধ বাধে। চ্যাডউইক চেয়েছিলেন এই পরিষেবাগুলিকে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে শহরগুলিকে বিক্রি করতে। অন্যদিকে, হকস্‌লে এই ব্যবস্থাটিকে আরও লাভজনক করার জন্য প্রকল্পগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করতে বলেন। চ্যাডউইকের কাছে 'স্যানিটেশন' ছিল একটি মতাদর্শ, সার্বিক ভাবে পরিষেবাগুলি প্রতিষ্ঠিত না করলে তা যথাযথ ভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়, এমনটাই ভাবতেন তিনি। অন্যদিকে, হকস্‌লে বিষয়টিকে লাভজনক এবং বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ Towns Improvement Company বিলুপ্ত হয় এবং চ্যাডউইক ও হকস্‌লের মধ্যে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়। এরপর ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চ্যাডউইকের সর্বময় কর্তৃত্বও বিলুপ্ত হতে থাকে। ১৮৫৮-১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে Sir John Simon (স্যার জন সাইমন) যখন চিফ মেডিক্যাল অফিসার হন, তখন এই বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের চরিত্রে বেশ বদল আনা হয়। সরকারি কর্তৃপক্ষ অনেক বেশি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রযুক্তিগত নির্মাণের ব্যাপারটা ইঞ্জিনিয়ারদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এটাও মনে করার কোনও কারণ নেই যে, সরকারি তরফে প্রযুক্তির পরিসরের ওপর নজরদারি একেবারে বন্ধ হয়। বরং প্যাট্রিক জয়েসের সূত্র ধরে এটা বলা যেতে পারে যে, ইঞ্জিনিয়াররা রাষ্ট্রের অস্বীকৃত কর্মসেনানী হিসেবেই থেকে যান।[21]

রাজনীতির সঙ্গে প্রযুক্তির এই বিচ্ছেদ নিঃসন্দেহে এই পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ যে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং চ্যাডউইকের জমানা থেকেই স্যানিটেশনে যে ইঞ্জিনিয়ারদের এক্তিয়ার অনেকখানি এই ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছিল। শহরে জল সরবরাহের জন্য জটিল

[21] Patrick Joyce, *The Rule of freedom Liberalism And the Modern City*,, pp-68

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৮৪৩-৪৫ খ্রিষ্টাব্দে The Health of Town Commission স্থাপিত হওয়াও শহরের প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিকাঠামোগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যেই।

এই বিষয়টিকে প্যাট্রিক জয়েস, উদারনীতিবাদের বাস্তব চলনের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন উদারনীতিবাদ ঠিক প্রত্যক্ষ বা এলোমেলো পরিচালনায় বিশ্বাসী নয়, তা বরং অপ্রত্যক্ষ, স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়, অথচ জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যতাকেই সে তার সঞ্চার পথ হিসেবে বেছে নেয়। ধরা যাক ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে বাড়িতে জল সরবরাহের কথা। স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ বিচরণে আপাত ভাবে রাজনৈতিকের সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির এই বিন্যাসের কোনও যোগাযোগ নেই। অথচ, বস্তুগত এই প্রাযুক্তিক পরিকাঠামো 'সামাজিক অবস্থা'-র নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। উদারনীতিবাদ প্রসূত ব্যক্তির বা বস্তুর স্বাধীন চলাচল কতটা 'স্বাধীন' আর কতটা অদৃশ্যভাবে 'নিয়ন্ত্রিত' সেই নিয়ে ভাবনার অবকাশ থেকে যায়। জল সরবরাহ ও অন্যান্য স্যানিটেশনের ব্যবস্থা 'সামাজিক ব্যবস্থা'-র মধ্যে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থার থেকেও ক্রমশ হয়ে ওঠে, 'সামাজিক ব্যবস্থা'-কে বোঝার উদ্যোগ। প্রকৃতি এবং পরিবেশ, জীব জগৎ এবং জড় জগৎ-এর মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় যা মানুষকে কর্তৃপক্ষের সুবিধামত 'স্বাভাবিক আচরণে' বাধ্য করতে চায় ।

'সামাজিক'-কে নিয়ন্ত্রণ করার এই 'প্রাকৃতিক' (প্রাযুক্তিক?) ব্যবস্থাগুলিকে 'স্বাভাবিক' হিসেবে প্রতিভাত করার কাজটি নেহাত সহজ ছিল না। কারণ পাইপ, ড্রেন বা অন্যান্য যে স্যানিটারি পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে সমগ্র ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলির নিত্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনে পুরোনো পরিকাঠামো ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করার প্রয়োজন দেখা দিত প্রতিনিয়ত। আর তাই সমস্ত ব্যবস্থাটির কার্যকারিতা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালনার ওপর নির্ভর করছিল।

ইংল্যান্ড এই ব্যাপারে ইউরোপের অন্যান্য দেশের থেকে এগিয়ে ছিল।ফুকো, সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সূচনা পর্বে আলোচনায় দেখান, সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের পাশাপাশি প্রতিপার্শ্বের স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ফ্রান্সের শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সময় থেকেই অনুভূত হয়েছিল। ইংল্যান্ড তার শ্রমিকশ্রেণিকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই ব্যবস্থাটি সফল ভাবে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংল্যান্ডের শহরগুলিতে প্রায় দশ শতাংশ বাড়িতে জলের কলের সংযোগ ছিল। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে এই সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রায় সমস্ত বাড়িতেই পাইপের জলের সংযোগ চলে আসে।

এই পরিবর্তন একাধিক প্রবণতার জন্ম দেয়। বা বলা ভালো, প্রবণতাগুলি পরিবর্তনের সঞ্চারপথ কিয়ৎ অংশে নির্ধারণ করে দেয়। ব্যক্তিগত পরিসরে যে খুব সূক্ষ্ম এবং সুচারু ভাবে ‘Governmentality’-র নজরদারি অনুপ্রবেশ করে সে প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করেছি। ভিক্টোরিয়ান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধারণা শুধুমাত্র যে ব্যক্তির ‘ডিসিপ্লিন’-এর বিষয় থাকে না, বরং অবশ্যম্ভাবী এবং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হতে বাধ্য হয়। এছাড়া আমরা আরেকটি বিষয়ও লক্ষ করি, নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর নির্মিতিতে এই অবিচ্ছেদ্য অভ্যেসগুলি একটি নতুন রকমের আত্মপরিচয় তৈরি করছে। নোংরা-দুর্গন্ধযুক্ত জায়গা বা মানুষ মানেই তারা দরিদ্র,এরকম একটা ধারণা তৈরি হয় ইংল্যান্ড জুড়ে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, আঠারো-উনিশ শতকের ইউরোপে বিভিন্ন মহামারীর প্রাদুর্ভাব, রোগের কারণ ও চরিত্র সম্পর্কে নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, রোগের মোকাবিলায় বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি ও সামাজিক চিকিৎসার বিকাশ সূচিত করে অন্যান্য বহু পরিবর্তন। সামাজিক চিকিৎসার বিকাশে ইউরোপের এক একটি দেশের এক এক রকম নীতি এবং এর একটি পর্যায়ে সুস্বাস্থ্যের শর্ত হিসেবে শহর জুড়ে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, বাতাস

চলাচলের ব্যবস্থা বাহ্যিক ভাবেও শহরগুলির চেহারা বদলে দিতে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ইংল্যান্ড।

আমরা একথাও আলোচনা করলাম যে, পাইপ, ড্রেন বা অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের পরিকাঠামোগুলির জন্য অবিরত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনে পুরোনো পরিকাঠামো ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। এছাড়াও প্রয়োজন ছিল শহরের মানুষজনের দিক থেকে পরিকাঠামোর নতুন সুবিধাগুলি ব্যবহারের নিয়মবিধি। খুব স্বাভাবিকভাবেই এগুলি পরিচালনার জন্য দরকার হোল নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের। আমরা আগেই দেখেছি ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ করার প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব মোটামুটি ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকেই সরাসরি হস্তক্ষেপ বন্ধ করে দেয়। সুতরাং শহরগুলির এই নতুন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি অন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এখানে খুব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল দু'টি শর্ত। একদিকে ব্যক্তিগত পরিসরে অদৃশ্য নজরদারি বজায় রেখে ব্যক্তির অজান্তেই ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্যদিকে, উদারনীতিবাদের 'স্বাধীন' সঞ্চালনের বাতাবরণটি বজায় রাখা। এক্ষেত্রে আমরা শেষ পর্যন্ত দেখব, মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটি এই দায়িত্ব পায়। আমরা এখন এই প্রতিষ্ঠানটির তৈরি হওয়া এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করব।

ইউরোপে মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাস

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধারণা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আগে থেকেই ছিল। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে এই ধারণা আরও জোরদার হয়। রোগের মোকাবিলায় সামাজিক চিকিৎসা গড়ে ওঠার পর্বে 'জনস্বাস্থ্য' রক্ষার্থে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শুধু আর ব্যক্তিগত পরিসরের বিষয় থাকে না, প্রতিপার্শ্বকে পুনর্নির্মাণ করার বিষয় হয়ে ওঠে। এই পুনর্নির্মিত পরিকাঠামোগুলির বাস্তব রূপায়ণ এবং পরিচালনার ভার মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির উপর ন্যস্ত হয়। এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি, শহর পরিচালনার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি কি একটি নতুন তৈরি হওয়া

প্রতিষ্ঠান? নাকি আগে থেকেই এর অস্তিত্ব ছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এর কর্মকাণ্ড এবং সাংগঠনিক চরিত্রে পরিবর্তন আনা হয়? ইংল্যান্ডের শহরগুলিতে কীভাবে এই প্রতিষ্ঠান শহর পরিচালনার সঙ্গে জড়িয়ে যায় সেই প্রক্রিয়াও বোঝার চেষ্টা করব। আধুনিক ইউরোপে রোগ মোকাবিলার নতুন পন্থা হিসেবে সামাজিক চিকিৎসার গড়ে ওঠা, এর সার্বিক সাফল্যে ক্রমশ চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রযুক্তিবিদ্যার মেলবন্ধন এবং এই ব্যবস্থাটি পরিচালনায় মিউনিসিপ্যালিটির অবতারণা – সব মিলিয়ে সার্বিক প্রক্রিয়াটি বুঝতে হবে আমাদের। মিউনিসিপ্যালিটি কীভাবে ইউরোপে শহর পরিচালনার কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠল এই বিষয়টিও পরিষ্কার হবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত, ভারতের শহরগুলিতে ইংরেজদের মিউনিসিপ্যালিটি পত্তন করার বিষয়টি আলোচনার জন্য একটি প্রেক্ষাপটও রচনা করবে এই আলোচনা।

মধ্যযুগ থেকেই ইংল্যান্ডের শহরগুলি পরিচালনার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির অস্তিত্ব ছিল। আমরা যদি শব্দতত্ত্বের দিক থেকে ‘*Municipal’*- শব্দটির উৎস এবং বিবর্তনের পথ পেরিয়ে এসে ইংরেজি ভাষায় এর প্রবেশ লক্ষ করি তাহলে আমরা মিউনিসিপ্যালিটির উৎস সম্পর্কেও একটা ধারণা পেতে পারি। ল্যাটিন ‘*Munia’* (যার অর্থ নাগরিক কার্যালয়) শব্দটি ল্যাটিন ভাষাতেই বিভিন্ন শব্দে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে ‘*Municip’* (যার অর্থ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক) এবং তারপর ‘*Municipium’* (যার অর্থ স্বাধীন শহর) এই দুই পর্যায়ে বিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ‘*Municipalis’*-এ পরিণত হয়। এরপর শব্দটি ফরাসি ভাষায় গৃহীত হয়। তারও পরে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শব্দটি ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ করে। শব্দটির এই সঞ্চারপথ এবং কিছুটা অর্থের বদল মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কার্যকারিতা এবং একে কেন্দ্র করে আদর্শগত ভাবনার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। ল্যাটিন ভাষাতেই আমরা দেখেছি এই শব্দটির কয়েকবার অর্থ বদল হয়। যার মধ্যে নাগরিক কার্যালয়, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক এবং স্বাধীন শহর এই সবকটিই আছে। প্রাচীন রোমের স্বাধীন শহরে যে সবাই সম অধিকারভোগী ছিলেন না,

একথা সর্বজন বিদিত। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটি যে সেই সময়ে শহরের নাগরিক কার্যালয়ের নামে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করত, এটা বেশ পরিষ্কার। আবার অন্যদিকে, আমরা ফুকোর সামাজিক চিকিৎসা গড়ে ওঠার পর্বে দেখলাম ইংল্যান্ডের থেকে আগেই ফ্রান্সে শহরকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সুতরাং এখানে মিউনিসিপ্যালিটির প্রয়োজনও হয়েছে বেশ কিছুটা আগে।

এরপর মধ্যযুগে ইউরোপের শহরগুলির চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব সেগুলি প্রাচীন বা আধুনিক শহরগুলির থেকে ভীষণ ভাবে আলাদা ছিল। আলাদা ছিল মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন এবং কর্মকাণ্ডের ধরন। Henri Pirenne(হেনরি পিরেন) তাঁর ‘*Economic And Social History Of Medieval Europe*’ বইতে দেখিয়েছেন, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই পশ্চিম ইউরোপে শহরগুলির ওপর *haute bourgeoisie* রা কর্তৃত্ব কায়েম করেছিল। এই সময় শহরগুলির জনজীবন মূলত শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বণিক সম্প্রদায় শহরের মিউনিসিপ্যাল কর্তৃত্ব হস্তগত করেছিল। এই সময় থেকেই আমরা ইউরোপের শহরগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির কথা পাচ্ছি। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ‘জনস্বার্থ’-র কথা মাথায় রেখে এই সময়েও কিছু কিছু কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত সেই কথাও পিরেন দেখিয়েছেন। কিন্তু ‘জনস্বার্থ’ বেশ মুখোশহীন ভাবেই ছিল শ্রেণিস্বার্থের অনুকূল-- মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্ব যে শ্রেণির করায়ত্ত ছিল, অর্থাৎ বণিক-বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থেরই নামান্তর। তবে শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যাল শাসন-পরিকাঠামো তারা স্থাপন করেছিলেন। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডও এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলি পরিচালনা করত। শহরগুলির নিজস্ব আর্থিক সংস্থান, ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন বাজার প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ করা, শহরগুলি প্রাচীর দিয়ে ঘেরার ব্যবস্থা করা এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বও মিউনিসিপ্যালিটি নিত। Pirenne বলেছেন, এই জাতীয় সমস্ত চাহিদাগুলিই ছিল

বুর্জোয়াদের নিজস্ব চাহিদা এবং তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটিগুলি একমাত্র সেগুলি চরিতার্থ করার দিকেই নজর দিত।

ক্রমশ অবশ্য এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পরিস্ফুট হচ্ছিল। এই ব্যবস্থা যে একটি বিশেষ শ্রেণির হাতকেই মজবুত করছে, মেহনতি মানুষ এর সুবিধা প্রায় পাচ্ছেই না, এই ব্যাপারটি নিয়েও সচেতনতা তৈরি হতে থাকে। বিক্ষোভ-ও দেখা যেতে থাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসেবে ফ্লেমিস শহর গুলিতে বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা তাদের সংগঠনের এবং শহরের ক্ষমতাশালী প্যাট্রিসিয়ান 'এচেভিন'-দের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের কথা বলতে পারি।[22] এই প্যাট্রিসিয়ানরা বেশিরভাগ শহরে কিছু পরিবারের মধ্যে শহরের ক্ষমতা সীমিত করে প্রায় অলিগার্কি স্থাপন করে। পনেরো শতক অবধি সময়ে বেশিরভাগ শহরেই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জন্ম নেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের। অনেক সময়ই এই প্রতিরোধগুলি ছিল সহিংস প্রকৃতির। তবে এই প্রতিরোধগুলির যে খুব সুদুর প্রসারী অভিঘাত ছিল বা স্থানিক বিস্তৃতিতে অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছিল এমনটা নয়। কারণ পাঁচিলে ঘেরা শহর এই প্রতিরোধগুলির ছড়িয়ে পড়ার অন্তরায় ছিল। আবার ইউরোপের সমস্ত শহরে এইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এমনটাও নয়। ভেনিস, হ্যান্সিয়াটিক শহরগুলি বা ইংল্যান্ডের শহরগুলি এই জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। এই সব শহরগুলিতে স্থিতাবস্থা বজায় থাকার বহুবিধ কারণ ছিল। তার মধ্যে মূল কারণ হল *haute bourgeoisie* এই সব শহরগুলিতে পরিচালন ক্ষমতা আত্মগত করলেও পুরোপুরি স্বার্থপর ক্ষমতাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হয়নি। যদিও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমাগত নতুন বিত্তশালী বণিকগোষ্ঠীর লোকেদের অনুপ্রবেশ ঘটছিল। এই শাসকগোষ্ঠী একদিকে বাণিজ্য পরিচালনা এবং অন্যদিকে নাগরিক কর্তৃত্বের ওপর অধিকার কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে ভেনিস শহরটির কথা বলা যেতে

[22] Henri Pirenne, '*Economic And Social History Of Medieval Europe*', Routledge, London,1936, Page-202

পারে। এখানকার শাসকগোষ্ঠী শতাধিক কালব্যাপী শহরটিতে দেশপ্রেম এবং প্রগতির ধারা বজায় রেখেছিল। এখানকার নাগরিকদের শহর পরিচালনা নিয়ে বিশেষ সমস্যা ছিল না। তাই শহরের কর্তৃপক্ষকে উচ্ছেদ করার কথা নগরবাসী ভাবতেও পারত না। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে নাগরিক কর্তৃপক্ষের ওপরে এবং সার্বিক ভাবেই রাজবংশের কর্তৃত্ব এত বেশি ছিল, যে আলাদা করে নাগরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বঞ্চনার বা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিযোগে ক্ষমতাহীনরা কোনও বিদ্রোহ করেনি।

পনেরো-ষোলো শতক অবধি আমরা সার্বিক ভাবে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে শহর পরিচালনার জন্য নাগরিক কর্তৃপক্ষের কার্যকারিতার বিভিন্নতা লক্ষ্য করলাম। দেখলাম এই সময়ে নগরগুলির চরিত্র ভীষণ ভাবেই শহরের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার অনুগ ছিল। সেখানে নতুন গড়ে ওঠা বণিক শ্রেণি ক্রমশ শহরের নিয়ন্তা হয়ে উঠছিল। এরা শহরের বাহ্যিক রূপ এবং নাগরিক জীবন পরিচালনার কিছু ব্যবস্থাও করেছিল। যদিও সেগুলি বেশিরভাগই তাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল। পরিচালনগোষ্ঠী এবং সাধারণ নাগরিকবৃন্দের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতায় কিছু অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্নতা ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তাতে প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু এই বিষয়টি আমরা লক্ষ করলাম যে চরিত্রগত ভাবে মধ্যযুগীয় ইউরোপে উৎপাদনের প্রক্রিয়া, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত মানুষজনের আভ্যন্তরীণ রসায়ন শহর পরিচালনাতেও প্রভাব ফেলেছিল। শহরগুলির চরিত্র ক্রমশ বদলাচ্ছিল, বদলাচ্ছিল বাহ্যিক রূপ, পরিচালকগোষ্ঠীর গঠনের সঙ্গে বদলাচ্ছিল শহর পরিচালনার ধরনও। কিন্তু একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার, ইউরোপের বিভিন্ন শহর পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃত্ব প্রায় সমস্ত বড় শহর জুড়েই ছিল।

'উদারতান্ত্রিক', 'আধুনিক' বাতাবরণ রোগনিয়ন্ত্রণ করার সমাধানসূত্রকে সামনে রেখে এই মিউনিসিপ্যাল কর্তৃত্বে অনেকখানি বদল এনেছে। এর গঠন, শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করার

পদ্ধতি, পরিষেবার ধরন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক বিন্যাসেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। আমরা এখন এই বাতাবরণে ইংল্যান্ডে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি গড়ে ওঠার এবং তাদের কর্মকাণ্ডের পরিধি বোঝার চেষ্টা করব। যেহেতু পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতে মিউনিসিপ্যালিটি নামক নতুন প্রতিষ্ঠানটির পত্তন এবং এর কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করব তাই খোদ ইংল্যান্ডে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত জানতে পারলে বিষয়টির একটি সার্বিক ধারণা পেতে সুবিধা হবে। 'উদারনৈতিক' ঔপনিবেশিকদের অভিসন্ধি, সেই সঙ্গে ভারতের কিছু নিজস্ব সমস্যা এবং ভৌগোলিক বৈচিত্রের কারণে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির গঠনের এবং এদের কার্যকলাপের বিভিন্নতার স্বরূপ বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে।

ইংল্যান্ড তথা লন্ডনের মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাস

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনার শুরুতেইই আমরা দেখেছি চ্যাডউইকের পরিকল্পনায় উনিশ শতকে শহরগুলিতে একটা মস্ত পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু এর আগে শহরগুলি কেমন ছিল এগুলি পরিচালনাই বা কীভাবে করা হত সেটাও বোঝা দরকার। তাহলে শহর পরিচালনার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের আধুনিক রূপ সম্পর্কেও আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে।

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে একজন চিনা রাষ্ট্রদূত লন্ডনে আসেন। তাঁকে এই রাজকীয় শহরটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এককথায় উত্তর দেন, 'প্রচণ্ড নোংরা'[23]। কাদার সঙ্গে অশ্বের বিষ্ঠা মিশে রাস্তায় চিটচিটে আস্তরণ। বাতাসে অসম্ভব দুর্গন্ধ। আবার বিভিন্ন ঋতুতে এই দুর্গন্ধের ধরন বদলায়। শীতকালে এর সঙ্গে মেশে সালফারের গন্ধ। গ্রীষ্মকালে ফল, তরকারি, তামাক সব কিছু পচে গিয়ে সেই গন্ধ বাতাসে মিশে একটা নরকের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

[23] Lee Jackson, *Dirty Old London:The Victorian Fight against Filth* Yale University Press, New Haven And London,2014, Page-1

বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের রাজধানীর এ হেন চিত্র সত্যি-ই পীড়াদায়ক। মার্কিন মুলুকের আর এক পর্যটকের বিবরণেও এই চিত্রেরই প্রকাশ দেখা গেছে।

ভিক্টোরিয়ানরাই 'স্যানিটারি সায়েন্স'-এর প্রবক্তা। জনস্বাস্থ্য, আবর্জনা এবং রোগ নিয়ে গবেষণায় এরা যথেষ্ট প্রাগ্রসর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভিক্টোরিয়ান সাম্রাজ্যের মতাদর্শগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৮৬০-এর দশক থেকে তো স্যানিটারি রিফর্মের জমানা শুরু হয়ে যায়। Sir Edwin Chadwick কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনাগুলির মূল রূপকার স্থপতি Joseph Bazalgette তার কর্মকাণ্ড শুরু করেন, লন্ডন শহরে। বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, ড্রেনের ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জোগান দেওয়া ইত্যাদি। লন্ডন শহরকে পরিষ্কার করেছেন Bazalgett...এই রকম একটা মিথ তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু এটি কতটা সত্যি তার প্রমাণ মেলে উনিশ শতকের শেষে লন্ডনে আসা বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণেই।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা, এই বিষয়ে পরিকাঠামো তৈরি করার ব্যবস্থা সত্ত্বেও লন্ডন শহরকে পুরোপুরি পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তাহলে প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় কিছু ত্রুটি থেকে গেছিল এটি প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলেই আমাদের মেনে নিতে হয়। এই ত্রুটিগুলি-ই আমাদের প্রকারান্তরে প্রকল্পগুলির পরিচালন-কর্তৃত্বের বিভিন্ন হাত বদলের ইঙ্গিত পেতেও সাহায্য করবে। এর সূত্র ধরেই আমরা লন্ডন শহরের স্থানীয় কর্তৃত্বের চরিত্র সম্পর্কেও একটা ধারণা পাব।

১৮০১-১৯০১ খ্রিস্টাব্দ অবধি সময়ে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ। বাড়িগুলির থেকে নির্গত ধোঁয়ার পরিমাণ এবং রাস্তায় যানবাহনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়া ঘোড়ার সংখ্যার সঙ্গে বাড়ল ঘোড়ার বিষ্ঠার পরিমাণ। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে একে দূষণমুক্ত করতে

রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে লন্ডন শহরের ক্রমবর্ধমান বর্জ্য পদার্থ কোথায় অপসারণ করা হবে সেই নিয়েও খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

এদিকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংল্যান্ডে জনস্বাস্থ্য রক্ষা নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে যায়। যদিও এই প্রবণতার সূত্রপাত বেশ খানিকটা আগেই ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। এই সময় থেকেই লন্ডন ফিভার হসপিটালের ডাক্তাররা টাইফয়েডের জীবাণু টাইফাসকে নির্মূল করার জন্য বস্তিগুলোকে পরিকল্পিত ভাবে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ফ্যাক্টরিগুলি থেকে নির্গত ধোঁয়া জনজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর এই রকম একটা দাবি পেশ করা হয় পার্লামেন্টে। শুধু তাই নয়, জল দূষণ, বিশেষত বাড়িগুলির নোংরা জল টেমস নদীতে মিশলে কী কী ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই নিয়েও কথাবার্তা শুরু হয়। এছাড়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়া দুর্গন্ধ যে মিয়াস্মা সৃষ্টির কারণ এবং এই মিয়াস্মা যে অনেক রোগের জন্মের কারণ, এই সময়ে এরকম একটা ভাবনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং দূষিত,পচনশীল বর্জ্য পদার্থের অপসারণ শহরগুলির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও বর্জ্য পদার্থ অপসারণের প্রক্রিয়াটি সঠিক ভাবে পরিচালনা করা যাচ্ছিল না। শহরের বিশেষ করে বস্তি অঞ্চলের বাড়িগুলি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা থেকেই যায়। এখানে বসবাসকারী দরিদ্ররা আবর্জনা সংগ্রহহকারীদের আলাদা করে টিপস দিতে পারত না বলে, এখান থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করতে অধিকাংশ সময়েই আগ্রহ হারাত তারা। ফলস্বরূপ পুত-গন্ধময় পরিস্থিতি। এছাড়া শহরের ভেতর থাকা কবরখানা থেকে ছড়িয়ে পড়া দূষণও চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।

শহরের কাদা এবং ধুলো পরিষ্কার করার ভার প্রাথমিক ভাবে লন্ডন ভেস্ট্রির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। এই ভেস্ট্রি ছিল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রধান ভিত্তি স্বরূপ। এই ভেস্ট্রি আবার এই ধুলো-কাদা পরিষ্কার করার ভার দিয়েছিল স্থানীয় কিছু কনট্রাক্টরকে। কন্ট্রাক্টরদের ওপর এই ভার ন্যস্ত করার মূল কারণ হল, এরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিনামূল্যে এই কাজটি করত। এর

ফলে কন্ট্রাক্টরদের যে কাজের প্রতি বিশেষ দায়বদ্ধতা ছিল এমনটা নয়। আবার অন্যদিকে এরা এইসব বর্জ্যপদার্থ নতুন করে নির্মাণ বা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারত বলে কাজটিতে উৎসাহ দেখিয়েছিল। এর বদলে তারা আবর্জনা সংগ্রহের পাশাপাশি রাস্তা পরিষ্কার করে দিত। এই সামগ্রিক ব্যবস্থাটির পেছনে যেহেতু কন্ট্রাক্টরদের সেই ভাবে দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠেনি তাই এর কুফল ভোগ করতে হত শহরবাসীকে। যখন বিল্ডিং তৈরি বন্ধ থাকত, ইঁটের দাম কমে যেত, কন্ট্রাক্টরদের ব্যবসায় স্বাভাবিক ভাবেই মন্দা দেখা দিত। তারা সাময়িক ভাবে শহর থেকে বিদায় নিত। তাদের সঙ্গে শহরের ঝাড়ুদার, নোংরা পরিষ্কার করার লোকেরাও গায়েব হয়ে যেত।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই ভেস্ট্রি সিস্টেমে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। লোকাল বোর্ডের ভিতর আরও কিছু কমিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। এই ব্যবস্থাতেও সারা লন্ডন শহর জুড়ে পরিষেবার সমতা ঘটানো সম্ভব হয়নি। অঞ্চলভিত্তিক 'রেটপেয়ার্স'-দের ঘনত্ব এবং প্রাথমিক ভাবে যে প্যারিসগুলি (চার্চকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব) একটু বেশি সম্পন্ন ছিল তারা তাদের অঞ্চল পরিষ্কার রাখার কাজটি ভালো করে করতে পারত। পশ্চিম লণ্ডনের প্যারিসগুলি পূর্ব লণ্ডনের প্যারিসগুলির তুলনায় বেশি সম্পন্ন ছিল বলে তারা তাদের অঞ্চলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকটি সুষ্ঠু ভাবে দেখতে পারত।[24] তবে শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের পরিচালনাগত ত্রুটির ছাপ ছিল স্পষ্ট। আমরা এর পরবর্তী পর্যায়ে সার্বিক ভাবে লন্ডন শহর পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ করার চেষ্টা করব।

লন্ডন শহরের জলীয় বর্জ্য নিষ্কাশনের দায়িত্ব অবশ্য ধুলো বা কাদা পরিষ্কার করার মত কোনও কন্ট্রাক্টরদের হাতে ন্যস্ত হয়নি। বরং বহু আগে থেকেই 'Eight Ancient Commission'

---

[24] Ibid, page- 4

এটির দেখভালো করে আসছে। তবে এই ব্যবস্থাটি নিঃসন্দেহে বহুল ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে এই ব্যবস্থাটি ব্যয়বহুল, অকার্যকরী এবং পরিচালনগত ত্রুটি সম্পন্ন বলে নানা রকম অভিযোগ উঠতে থাকে। এরপর ব্যাজেলগেটের মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করতে 'Metropolitan Board of Works' লন্ডন শহরের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব হিসেবে ক্ষমতায় আসে। দূষিত জল পরিবহণের জন্য ৮২ মাইল লম্বা টানেল, টেমস নদীর ওপর একাধিক পাম্পিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা এবং টেমস নদী পরিষ্কার করার পদক্ষেপ করেন ব্যাজেলগেট। কিন্তু বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের এই নতুন ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এই ব্যবস্থায় লণ্ডনের কেন্দ্রীয় মূল অঞ্চল থেকে নোংরা জল অপসারিত করে ক্রসনেস বা বেকটনের মত টেমস নদীর তীরবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় মাত্র। কোনও চিরস্থায়ী সমাধান আনতে পারেনি এই নতুন ব্যবস্থা। দিনে দু'বার যখন এই বর্জ্য পদার্থযুক্ত নোংরা জল পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে টেমসে নিক্ষিপ্ত করা হত, নদী যেন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠত। কালো, অসম্ভব দুর্গন্ধযুক্ত,সোডার জলের মতো ফেনাযুক্ত জল মাইলের পর মাইল জুড়ে ছেয়ে থাকত টেমসের জলে।[25]

ব্যাজেলগেট সেন্ট্রাল লন্ডনকে পরিষ্কার রাখার এই ব্যবস্থা ১৮৮০-এর দশকে বেশ বড় রকমের সমস্যার জন্ম দিল। কারণ নতুন শ্রমিক শ্রেণীর বাসস্থানের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে লণ্ডনের সাবার্ব অঞ্চল। ইস্টহ্যাম বা ওয়েস্টমিনিস্টারের মত অঞ্চলগুলি টেমসের নোংরা দুর্গন্ধ জলের প্রকোপে ক্রমশ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। আর নদীর জোয়ারের সময় সেই নোংরা জল ঢুকে পড়ছে সেন্ট্রাল লণ্ডনেও। নোংরা বা দুর্গন্ধ মোকাবিলার একটা নান্দনিক দিক থাকলেও সামাজিক চিকিৎসা গড়ে ওঠার পর্বে আমরা দেখলাম যে ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণি কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য চিন্তাতেই বিষয়টি মূর্ত হল। শ্রমিকদের দ্বারা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এবং শ্রমিকদের থেকে যেন সমাজের অন্য শ্রেণির মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে

[25] Ibid, page-5

সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তাই শ্রমিকশ্রেণির বসবাসের সাবার্ব অঞ্চল যদি দূষণ কবলিত হয়, তাহলে সার্বিক জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামোর পক্ষেই সেটি বিশেষ চিন্তার বিষয়।

অন্যদিকে কল-কারখানা থেকে নির্গত দূষিত ধোঁয়াও সার্বিক ভাবে লন্ডন শহরে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই নিয়ে পার্লামেন্টে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা হলেও সার্বিক ভাবে কোনও সুরাহা সম্ভব হয়নি। শীতকালে কার্যত শহরটি পুরোপুরি ধোঁয়াশায় মোড়া থাকত।[26]

তবে কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা সম্ভব হয়েছিল। লন্ডন শহরের ভিতরে অবস্থিত কবরস্থানগুলি শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। নতুন তৈরি হওয়া পাব্লিক টয়লেট ও পাব্লিক স্নানাগারগুলি পরিষ্কার রাখার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। বস্তিগুলির উন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়। 'Model Housing' গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিছু সামাজিক আবাস প্রকল্প নির্মাণের কথা বলা হয়। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'London County Council'। এই কাউন্সিলটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ধুলো, কাদা, ভেঙে দেওয়া বাড়ির ধ্বংসাবশেষ সঠিক ভাবে নিয়মিত অপসারণ করছে কি না বা রাস্তাঘাট নিয়মিত পরিষ্কার করছে কি না সেই বিষয়ে খেয়াল রাখত। প্রয়োজনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শাস্তি দেওয়ারও ক্ষমতা রাখত। সার্বিক ভাবে লন্ডন শহরের 'স্যানিটারি' অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় এই কাউন্সিলের হাতে।

এখানে আমরা একটা বিষয় স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি যে, সামাজিক চিকিৎসা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। ইংল্যান্ডে এই বিষয়টি মূলত শ্রমিক শ্রেণিকেন্দ্রিক চিকিৎসার বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসা শুধুমাত্র রোগ বা দেহকেন্দ্রিক থাকে

[26] Ibid, page- 6

না। পারিপার্শ্বকে পুনর্নির্মাণের একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই সূত্রেই লন্ডন শহরকে একটা নতুন, মার্জিত, স্বাস্থ্যসম্মত রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টাগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করার মাধ্যমে। যেমন, ইংল্যান্ডে 'স্যানিটেশন আন্দোলন'-এর মূল প্রবক্তা স্যার এডউইন স্যাডুইকের--এর স্বপ্নের বাস্তব রূপকার স্থপতি ব্যাজেলগেটের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা আমরা বলতে পারি। এই উদ্যোগগুলির সঙ্গে এবং বাস্তবায়িত হওয়ার পর এগুলি পরিচালনার জন্য এর সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জড়িয়ে পড়ে পরিচালন কর্তৃপক্ষের প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রেও বহু বিবর্তনের পথ পেরিয়ে আসে লন্ডন শহর। প্রাচীন স্বায়ত্ত শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে যায় এই অপেক্ষাকৃত নতুন কর্তৃত্বের প্রবণতাও।

আরও একটি বিষয় খুব স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে আমাদের কাছে। যে, তা হল এই লন্ডন শহরকে স্থায়ী ভাবে স্বাস্থ্যকর রূপ দেওয়া কখনই সম্ভব হচ্ছেনা। অন্তত উনিশ শতকের শেষ অবধি এটাই চিত্র। এই শহরের ক্রমবর্ধমান চরিত্র এক্ষেত্রে অনেক সময় প্রতিবন্ধকতার জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা টেমস নদীতে বর্জ্য পদার্থযুক্ত নোংরা জল নিষ্কাশনের কথাটি বলতে পারি। প্রথমে সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে নোংরা জল অপসারিত করে যে অঞ্চলে টেমস নদীতে নিষ্কাশন করা হোত, পরবর্তীকালে সেই অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর বসবাসের জন্য লন্ডন সাবার্ব সম্প্রসারিত হয়। ফলে এই বিষয়ে কোনও সন্তোষজনক সমাধানে উপনীত হওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে।

আবার শহরের ক্রমবর্ধমান চরিত্র ছাড়াও এমন কিছু আরও সমস্যা ছিল যেগুলির বাস্তব সমাধান কার্যত অসম্ভব ছিল। লন্ডন শহরে কল-কারখানাগুলি থেকে নির্গত ধোঁয়ার মোকাবিলা করা ছিল খুব কঠিন। অন্যদিকে কিছু কিছু বিষয়ে জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সফল পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছিল। যেমন, শহর থেকে দূরবর্তী স্থানে কবরখানা স্থানান্তর, পাব্লিক টয়লেট বা

স্নানাগারগুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। সার্বিক আলোচনায় পরিচালনার যে ত্রুটিগুলি দেখা যাচ্ছে, তাতে লন্ডন শহরে কোনও একটি চিরস্থায়ী সমাধান সূত্রে পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে না। যদিও সমাধান সূত্র খোঁজা এবং নগর কর্তৃত্বের সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপন করার প্রচেষ্টা অনেক আগে থেকেই হয়েছে। মধ্যযুগে লন্ডন শহরের ওপর লর্ড মেয়রের এবং তাঁর অধীনস্থ কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব বজায় ছিল। এছাড়াও লিভারি কোম্পানি ও মার্চেন্টস্ গিল্ডগুলির শহরের রক্ষণাবেক্ষণে একটা বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের এই সার্বিক কর্মকাণ্ডটি সীমাবদ্ধ ছিল লন্ডন শহরের খুব ছোট পরিসরের ভেতর। এর বাইরে সম্প্রসারিত লন্ডন শহরে বা শহরের প্রান্তিক অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হয় চার্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আঞ্চলিক ভেস্ট্রিগুলির ওপর। কখনও সেন্ট্রাল লণ্ডনের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করার দায়িত্বও ভেস্ট্রিগুলির হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু লন্ডন শহরের ক্রমবর্ধমান চরিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন, ব্যাপক হারে গৃহ নির্মাণ প্রকল্প বা পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভেস্ট্রিগুলি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে না।

উনিশ শতকে সমস্ত ইংল্যান্ড জুড়েই বিভিন্ন শহরের মিউনিসিপ্যাল শাসনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট পাশ করা হয়। কিন্তু বলা হয় লন্ডন শহরটিকে এই আইনের আওতাধীন করা হবে না। কারণ এই শহর যথেষ্ট 'সুশাসিত'। এখানে আমাদের আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যে কারণে ইংল্যান্ডের অন্যান্য শহর ছেড়ে লন্ডন শহরটিকে আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি। লন্ডন শহরটিতে শুরু থেকেই বণিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল। তাই এই শহর ইংল্যান্ডের সাপেক্ষে বেশ একটা স্বতন্ত্র অবস্থান রচনা করেছিল নিজের জন্য। তাই শহুরে ইতিবৃত্তের স্বাধীন রোজনামচা এই শহরে প্রতিভাত হয় বেশি। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্টটিতেও তাই লন্ডনকে অন্তর্ভুক্ত না করার পেছনে কাজ করেছিল অন্য এক মানসিকতা। এই শহর যেহেতু হুইগ দলকে সমর্থন করছিল, তাই এই শহরটিকে খানিকটা পশ্চাদপদ করে রাখার ওজরে এই আইনের আওতার বাইরে

রাখা হয়। এতক্ষণ অবধি আমরা দেখলাম, জনস্বাস্থ্য রক্ষার বিধানে সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশের সুষ্ঠু পরিচালনা, শহরে জল-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, জল সঞ্চালন পরিকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা বিষয়টির দেহগত পরিধি থেকে আরও ব্যাপ্ত বিকাশ। ইঞ্জিনিয়ারদের কারিগরিবিদ্যাও এর সঙ্গে ক্রমশ জড়িয়ে গেল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে শহরে পরিকাঠামোভিত্তিক পরিষেবা পরিচালনায় ক্রমশ 'রাজনীতি' বিষয়টিও জড়িয়ে যাচ্ছে।

লন্ডন শহর পরিচালনায় কোনও সমস্যা নেই এই রকম কারণ খাড়া করে এখানে নতুন মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট বলবৎ করা হয় না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় লন্ডন শহরের পরিস্থিতি মোটেই খুব একটা সুখকর ছিল না। William Carpenter(উইলিয়াম কার্পেন্টার) ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে একটা বেশ আক্রমণাত্মক লেখা লেখেন, '*The Corporation Of London as it is and as it should be*' । Charles Dickens(চার্লস ডিকেন্স) লন্ডন শহরের কর্পোরেশন সম্বন্ধে তার '*Bleak House*' বইটির শুরুতেই লেখেন "*leaden-headed old Corporation'.* ইংল্যান্ডের আরও দুই সমাজবিদ, সিডনি এবং বিয়েট্রিস ওয়েব লণ্ডনের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের অন্যান্য আঞ্চলিক শহরের পরিচালন ব্যবস্থার থেকে যথেষ্ট খারাপ বলেই উল্লেখ করেছেন।

তবে এই সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে লন্ডন শহরে সার্বিক পরিস্থিতি উন্নয়নের কোনও কাজই হয়নি এমনটা ঠিক বলা যায় না। ড্রেন ব্যবস্থার উন্নতি এবং কিছু 'new market' স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিলিংসগেট এবং স্মিথ ফিল্ডে দু'টি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রায় চার হাজার বাড়িকে ড্রেন পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে দেখা যায় লন্ডন শহরের সাবার্ব বা প্রান্তিক অঞ্চল বাদ দিয়ে প্রায় সমগ্র লন্ডন সিটিতে ড্রেন পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়েছে। এর প্রভাবে শহরে মৃত্যুর হারও কমেছে। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে

যখন লন্ডন মেট্রোপলিটন ওয়ার্কস স্থাপিত হয়, তখন দেখা লন্ডন সিটিতে তার নিজস্ব ‘Commission Of sewers’ যথেষ্ট কার্যকারী।

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘Metropolitan Management Act’ লন্ডন শহরেও প্রযুক্ত হয়। লন্ডন শহরের পরিচালনায় বিলুপ্ত করা হয় চার্চের কর্তৃত্ব। সমগ্র লন্ডন জুড়ে একই পরিচালন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। ‘Metropolitan Board Of Works’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র লন্ডন জুড়ে কেমন ড্রেন ব্যবস্থার উন্নতি বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য নানাবিধ কর্মকাণ্ড শুরু হয়, সেই বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। তবে এই নতুন ব্যবস্থাটিও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই কর্তৃত্বের লড়াই এসেই পড়েছিল। এই বোর্ডে প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হলেও নিযুক্ত হতেন আঞ্চলিক ভেস্ট্রিদের পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। তাই আঞ্চলিক ভেস্ট্রিগুলি মেট্রোপলিটন বোর্ডে Chadwick-এর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে প্রায়শই বাধার সৃষ্টি করত। সুতরাং নগর কর্তৃত্বে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিকের সংঘাত বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছে।

অন্য একটি সমস্যাও দেখা দিচ্ছিল এই মেট্রোপলিটন বোর্ডে। বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যরা তাদের নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভিন্নতাকে দূরে সরিয়ে একটি গুপ্ত সমঝোতার আঁতাঁত গড়ে তুলেছিলেন। ফলে একে অপরের ত্রুটিগুলি তুলে ধরার বদলে একটা আপোশের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। এতে সার্বিক ভাবে শহরের পরিকাঠামোগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি রয়্যাল কমিশন নিয়োগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে এই মেট্রোপলিটন বোর্ডকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পার্লামেন্ট।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হয় ‘London County Council’। প্রধানমন্ত্রী Lord of Salisbury কেন্দ্রীকরণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের হাতেই ক্ষমতা ন্যস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। মেট্রোপলিটন বোর্ড অফ ওয়ার্কসের ক্ষমতা বিভিন্ন কাউন্টি কাউন্সিলগুলি

পায়। লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলও বেশ কিছু ক্ষমতা পায়। তবে এক্ষেত্রেও শুধুমাত্র কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত অঞ্চলেই কাউন্সিলের কার্যক্রম জারি থাকে। নগরায়ণের ক্রমবর্ধমানতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও সম্ভাবনা এক্ষেত্রে সূচিত হয় না।

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের লন্ডন কাউন্টি কমিশনের নির্বাচনে দেখা যায় এখানে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন উদারনৈতিকদেরই রমরমা, প্রধানমন্ত্রী Lord of Salisbury-র সামনে যা বেশ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তার কন্যা গেন্ডোলিন-কে বলেন, "I rather look to the New London County Council to play the drunken helot for our benefit. Such a body at the outset must make some protentous blunders."[27] যদিও লন্ডন কাউন্টি কমিশন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ বদলায়। তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বলেন, "It is the place where collectivist and socialist experiments are tried, it is the place where a new revolutionary spirit find its instruments and collects its arms."[28]

লন্ডন কাউন্টি কমিশনে প্রতিনিধিত্বের অভিজাত চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা উঠলেও এর রাজনৈতিক প্রগতিশীলতা ও অভিনব কার্যপ্রণালী সব সময়ই সংশয়াতীত থেকেছে।

১৮৮০-র দশক থেকেই লন্ডন শহরে দরিদ্র জনতার ভিড় মোকাবিলা করা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রাম থেকে বহু মানুষ শহরে আসেন। জার শাসিত রাশিয়া থেকেও বহু মানুষ লণ্ডনে চলে আসেন। এই দারিদ্র বিষয়টিকে কীভাবে বিবেচনা করা হবে, তা নিয়ে লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের মধ্যেই চলতে থাকে বিভাজনের রাজনীতি। এছাড়া ইংল্যান্ডের অন্যান্য

[27] Ibid, page-35

[28] Ibid, page- 36

শহরগুলির তুলনায় লন্ডন কাউন্টি কমিশন শুরু থেকেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প কর্তৃত্ব ভোগ করত। পুলিশ, জল ও গ্যাস সরবরাহ, বাজার ও ডক নিয়ন্ত্রণে এর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। জল সরবরাহের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লণ্ডনের মেট্রোপলিটন চৌহদ্দি ছিল এর ক্ষমতার এক্তিয়ার। সম্প্রসারিত শহর বা জলের উৎসগুলির ওপর এর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বই এসবের ওপর প্রযুক্ত ছিল। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লন্ডন শহরের জল সরবরাহের ওপর 'Public Control' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাও সরাসরি লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না। 'Metropolitan Water Board'-এর ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়।[29]

শুরুতেই লন্ডন শহরের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ইংল্যান্ডের অন্যান্য শহরগুলির সঙ্গে এর স্বাধীন এক্তিয়ারগত পার্থক্যের কথাও উল্লেখ করেছি। এই সূত্রেই হয়তো অন্যান্য শহরের কাউন্টি কাউন্সিল ও লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের ক্ষমতার তরিতফাত-ও খানিকটা আন্দাজ করা সম্ভব। সুতরাং শহর পরিচালনার বিষয়টিতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সবকিছু একরকম হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এদের ক্ষমতার এক্তিয়ার যথেষ্ট আলাদা। লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিল বস্তিগুলির পুনর্নির্মাণ, শহরে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা এইসব বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হবে তা নিয়ে কেন্দ্র এবং আঞ্চলিকের দাঁড়িপাল্লার ওজন সেখানে সর্বত্র সমান হয়নি।

সার্বিক আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে শহরের পরিবেশকে পুনর্নির্মাণ করা বিশেষ গুরুত্ব পেল। দূষিত-বিশুদ্ধ জলের সঞ্চালন, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের দিকে নজর দেওয়া হল। প্রয়োজন হল এই পরিষেবাগুলি বাস্তবায়নের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ এবং তারপরে সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা। বিষয়টি আমরা লন্ডন শহরের উদাহরণে বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একটি বিষয় আমরা লক্ষ করলাম যে

[29] Ibid, page-40

পরিষেবা প্রদানের একটি সুষ্ঠু এবং ত্রুটিবিহীন ব্যবস্থা বাস্তবসম্মত ভাবে কার্যত অসম্ভব। শহরের নিয়ত পরিবর্তনশীল চরিত্র, দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে শহরটির অবস্থা , বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত বিভিন্ন রকমের সচেতনতা এবং প্রয়োজনের নিরিখে পরিষেবাগুলির পরিকাঠামোর নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ-বিনির্মাণ একটি চিরকালীন অসমাপ্ত কার্যক্রম। আর এই পরিবর্তনশীল চিরনির্মীয়মাণ প্রকল্পভিত্তিক পরিষেবাগুলির পরিচালক হিসেবে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের অবস্থানও বেশ জটিল। শহরের বিভিন্ন চরিত্র, কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের টানাপোড়েনে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের চরিত্র বহুমুখী এবং বিবিধ।

নিজেদের দেশে শহর পরিচালনা এবং শহরের স্বাস্থ্যসম্মত বিন্যাসের কিছু নির্ণায়ক স্থির করা এবং স্বায়ত্ত শাসনের ঐতিহ্যময় পরিকাঠামোর সঙ্গে এগুলির পরিচালনকে বিন্যস্ত করার পরে (বহু রকমের বিভেদ এবং বৈচিত্র্য সত্ত্বেও) খুব স্বাভাবিক ভাবে চলে আসে উপনিবেশে সেগুলির প্রয়োগ করার প্রসঙ্গ। উপনিবেশেও অবশ্য ততদিনে উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদ। এছাড়া আছে আরও নানারকমের শাসনতান্ত্রিক জটিলতা। এর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ভারতে কীভাবে শহর পরিচালনা করার কর্তৃপক্ষ হিসেবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি গঠিত হল, তা আলোচনা করব। অবশ্য উপনিবেশের প্রেক্ষাপটে এর স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান অনস্বীকার্য।

শহর-শরীরে জল-সঞ্চালনের গুরুত্বের ক্রমবর্ধমান অনুভব

যেহেতু বর্তমান গবেষণায় উপনিবেশে পৌর পরিষেবা ও পৌর নাগরিকতা বোঝার জন্য আমরা বিশেষ মনোযোগ দেব শহরের জল সঞ্চালনের বিষয়টির ওপর, এই অধ্যায়ের শেষ অংশে এ ব্যাপারে কিছু পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও আলোকপাত করা প্রয়োজন।

মিসেল ফুকো কথিত সামাজিক চিকিৎসাব্যবস্থায় শহরের প্রতিপার্শ্বকে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে গড়ে তোলার তাগিদ। যেখানে আমরা আগেই দেখেছি জল-বাতাস-আলোর সুষ্ঠু সঞ্চালনের কথা বলা

হয়। ইউরোপের এক একটি দেশে এক এক রকম বিবর্তনের পথ ধরে ধারণাটি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। এরপর আমরা প্যাট্রিক জয়েস-এর '*Rule of Freedom*' বইতে দেখি 'উদারনীতি'-র বিকাশের সুবিধার্থে শহরগুলিকে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়াস। এক্ষেত্রে 'স্বাধীন চলাচল'-এর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই ভাবে শহরকে ঘিরে ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা মেলবন্ধন ঘটে দেহগত চিন্তায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তরফ থেকে শহরের দেহের মধ্যে ক্রমাগত তরল পদার্থের সঞ্চালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রকারান্তরে এটি উদারনীতিবাদ প্রসূত 'স্বাধীন চলাচল'-এর ধারণার সঙ্গেও মিলে যায়।

রোগ মোকাবিলা করার ওজরে শহরকে ক্রমশ বহমান, জঙ্গম এবং সঞ্চালনের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হতে থাকে। তরল পদার্থের প্রবাহমানতার সঙ্গে শহরের 'দেহ' ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়। শহরের স্যানিটেশনকে ঘিরে 'হাইড্রোলিক সিটি'-র ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশ আর প্রতিবেশ স্বাস্থ্যরক্ষা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের নজরে আলাদা কোনও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে না, বরং সামগ্রিক প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হয়ে ওঠে। সঞ্চালনের মাধ্যম হিসেবে ড্রেন, জলের পাইপ এবং বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং দূষিত জল নিষ্কাশনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

Mathew Gandy(ম্যাথিউ গ্যান্ডি) তাঁর *'Rethinking urban metabolism: Water, space and the modern city'* প্রবন্ধে বলেন "Water is a great delineator of social power, which has at various times worked to either foster greater urban cohesion or generate new forms of political conflict."[30] সুতরাং শহরে জলের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সংযুক্ত হচ্ছে আরও বহু ধরনের নতুন আঙ্গিক। জল সরবরাহের

[30] Mathew Gandy, *'Rethinking urban metabolism: Water, space and the modern city'*, City, Vol-8, No.-3,364

পরিকাঠামোতে একত্রিত হওয়া শহরে জন্ম নিতে শুরু করে সামাজিক ক্ষমতার অলিন্দে উদ্ভূত বিভিন্ন 'রাজনৈতিক' দ্বন্দ্ব। এখানে Mathew, বিপাক বা metabolism-এর ধারণাকে নিয়ে আসছেন। উদারনীতিবাদের দৃষ্টিতে শহরকে যখন দেহ হিসেবে কল্পনা করা হতে থাকে, তখন সেই দেহের বিপাকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে জলের ব্যবহার।

Erik Swyngedouw এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "Water is indispensable 'stuff' for maintaining the metabolism, not only of our human bodies, but also of the wider social fabric. The very sustainability of cities and the practices of everyday life that constitute 'the urban' are predicated upon and conditioned by the supply, circulation and the elimination of water."

উদারনৈতিক যৌক্তিকতায় সার্বিক ভাবে স্বাধীন চলাচলের তত্ত্ব, শহরের দেহেও তার প্রয়োগ উনিশ শতকের পাব্লিক হেলথ মুভমেন্টের সূত্রে। কিন্তু ব্যক্তির স্ব-নিয়ন্ত্রিত যৌক্তিক স্বাধীন পরিচালনার তত্ত্ব মেনে মিউনিসিপ্যালিটির মত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা সত্ত্বেও জল সরবরাহের কিছু অংশ ধোঁয়াশাচ্ছন্নই থেকে যায় জনসমক্ষে। স্বাস্থ্যসম্মত শহরে মাটির তলায় জলের পাইপের বিন্যাস ম্যাথিউ গ্যান্ডির ভাষায়, সৃষ্টি করেছে একরকম 'hidden city'.[31]

[31] Mathew Gandy,365

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিবেশের প্রতিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিধান

জল, আলো-বাতাসের মুক্ত সঞ্চালনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার শর্ত, ইউরোপের বিশেষত শহরে সুস্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠল। সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার বিস্তৃত সঞ্চারপথে এই প্রক্রিয়া বেশ সুস্পষ্ট। তাই স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়টি শুধুমাত্র ডাক্তারদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় না থেকে ক্রমশ ইঞ্জিনিয়ারদেরও বিষয় হয়ে ওঠে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ব্যবস্থাটি কীভাবে বিভিন্ন বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে, নিরন্তর রদবলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রূপ প্রাপ্ত হল তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রথম অধ্যায়েই করেছি।

এখন প্রশ্ন হল ভারতের মতো লাভজনক উপনিবেশে এই ব্যবস্থাটি কীভাবে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কারণ ভারতের ক্ষেত্রে আরও নানান বাস্তবিক এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত অনুষঙ্গ এসে যুক্ত হয়েছে। ক্রান্তীয়-উষ্ণ-আর্দ্র অঞ্চলে অবস্থানের জন্য এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি ইউরোপের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এমনকি ভারতের বিভিন্ন জায়গার ভৌগোলিক অবস্থা বিভিন্ন রকম। ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে এখানে রোগের ধরনও অন্যরকম। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে এখানে জলের মুক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করার কাজ ইউরোপের থেকে বেশ অন্যরকম। এছাড়া এই ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত আছে আরও একাধিক বিষয়। উপনিবেশের প্রতি ঔপনিবেশিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে এর রদবদল, এছাড়া পরিস্থিতি উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা। এছাড়া প্রকল্পগুলি নির্মাণের পরে তার সঙ্গে দেশীয় জনতার গ্রহণ-বর্জন-মানসিক স্থান বিনিময়ও বেশ একটি দীর্ঘ জটিল প্রক্রিয়া।

সুতরাং ভারতের ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে সামাজিক চিকিৎসা নির্মাণের পথ যে পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের আলোচিত পথের মধ্যে বহু বৈচিত্র্যের সংযোজন করেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাতে সামাজিক চিকিৎসা নির্মাণের বিবর্তনের পথে স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছিল একাধিক নতুন সমস্যা বা দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত বিষয়। স্যানিটেশনের ধারণার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী উদারনৈতিকতা এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মেলবন্ধনের প্রক্রিয়াও বেশ জটিল।

David Arnold(ডেভিড আর্নল্ড) তাঁর *‘ Colonising the body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century India’* বইতে দেখিয়েছেন, ডাক্তার এবং সার্জেনরা ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার এক্তিয়ারে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করছিলেন তাঁরা।

আর্নল্ড বলেন, “Doctors and Surgeons helped to form and give a seemingly scientific precision to abiding impressions of India as a land of dirt and disease, of lethargy and superstition of backwardness and barbarity… and to contrast this orientalized India with the cool headed rationality and science, the purposeful dynamism, and the paternalistic humanitarianism of the West.” [1]

ডেভিড আর্নল্ড আরও দেখিয়েছেন, ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের তরফে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি মূলত জনপ্রতিষ্ঠান, স্যানিটাইজেসন রক্ষার প্রচেষ্টা এবং মহামারীগুলিকে সামলানোর নিরিখেই পরিচালিত হয়েছে। সুতরাং স্যানিটাইজেসনের প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছে এ কথা বেশ স্পষ্ট।আর্নল্ড এই বিষয়ে পাশ্চাত্যের সমাজের সঙ্গে ভারতের কিছু বুনিয়াদি বিভেদের কথা বলেন।

---

[1] David Arnold,*‘ Colonising the body: State Medicine and Epidemic disease in Nineteenth Century India’*, University of California Press,1993, Page-292

তিনি বলেন "India demonstrates in a manner unparralleled in Western Societies, the exceptional importance of medicine in the cultural and the political constitution of its subjects."[2]

এখন প্রশ্ন হল এই রকম পরিস্থিতিতে ফুকোর বাৎলানো ক্ষমতা এবং জ্ঞানের সমীকরণ, ভারতে ঔপনিবেশিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রতিফলিত হল। বা আরও সরলীকৃত ভাবে বললে যা দাঁড়ায়, পাশ্চাত্যের এই বিশ্বজনীন চিকিৎসার মডেল উপনিবেশে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উপনিবেশে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে নিজের মধ্যেও কী ধরনের পরিবর্তন আনল এই বিষয়টিও এই পরিসরে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। ডেভিড আর্নল্ড ঠিক এক্ষেত্রেই ফুকোর ক্ষমতা-জ্ঞান মডেলের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করেছেন।

Mark Harrison-মতো স্কলাররা একই সঙ্গে ভারতকে সঈদের ওরিয়েন্টালিসমের মডেলে ফেলে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক হিসেবে দেখতে নারাজ।[3] তাঁর মত হল, "There were however Europeans, who did not regard India as irremediably other". Harrison এটাই বলেছেন ভারত এবং ইউরোপের মধ্যে অবশ্যই কিছু পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের ধরন ব্যখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "These differences were often of degree rather than of kind". প্রকৃতিগত ভাবে ভিন্নতাকে অস্বীকার করলেও হ্যারিসন এক্ষত্রে স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করেননি। সমগ্র ব্যবস্থাটিকে কেন্দ্র করে বহুরকমের বয়ান বা 'Dialogue' বিষয়টিকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছিল।[4]

আর্নল্ডও ফুকোর ক্ষমতা/জ্ঞান তত্ত্বে কিছু পরিবর্ধন এনে বলেন এক্ষেত্রে ক্ষমতা ও জ্ঞানের যুগপৎ অস্তিত্ব খুব সূক্ষ্ম ও সুচারু ভাবে প্রতীয়মান। দৈনন্দিন জীবনের অভ্যেসের মধ্যে দিয়ে

---

[2] Ibid,52

[3] Mark Harrison, *Climate and Constitutions: Health, Race, Environment, and British Imperialism in India 1600-1850,* New Delhi, Oxford University Press, 1999,p-59

[4] ibid 59

এর প্রকাশ সুস্পষ্ট। তবে ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার মডেলটি প্রতিস্থাপনের স্বকীয়তা দেখাতে তিনি বলেন "...in the colony resistance was an essential element in the evolution and articulation of a particular system of medical thought and action."[5]

উদারনৈতিক বিশ্বজনীনতা ও সাম্রাজ্যবাদী ভিন্নতার বাধা-বিপত্তি

আমরা ইউরোপ জুড়ে সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে সমগ্র শহর জুড়ে জল- আলো-বাতাসের সঞ্চালনের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়ার পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস লক্ষ্য করলাম। ভারতেও ঔপনিবেশিক চিকিৎসার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে প্রতিবেশের সুষ্ঠু পুনর্নির্মাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যদিও আর্নল্ড ঔপনিবেশিক চিকিৎসার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন "Colonial Medicine strove to gapple with an abiding contradiction between universalising and Oreientalising."[6] সুতরাং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের শঙ্কাই বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

কার্যত, আমরা ফুকোর মডেল ভারতের মতো উপনিবেশে প্রয়োগ করতে গিয়ে মূলত দুই রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। প্রথমত, এখানকার দেশজ অধিবাসীদের জন্য তৈরি হওয়া সাম্রাজ্যবাদী ভিন্নতাকে সাম্রাজ্যবাদী উদারনৈতিক বিশ্বজনীনতার আদর্শের কাঠামোয় খাপ খাওয়ানো, দ্বিতীয়ত, দেশজ অধিবাসীদের তরফের বাধা বিপত্তির সঙ্গে একরকম মানিয়ে নিয়ে প্রকল্পগুলির রূপায়ণ করা। এই প্রসঙ্গে জ্ঞান প্রকাশ এবং ঈশিতা দুবের মধ্যে বিতর্কটি বেশ প্রাসঙ্গিক।

জ্ঞান প্রকাশ উপনিবেশের এই ভিন্নতা এবং তজ্জনিত বাধা বিপত্তি প্রসঙ্গে লেখেন, "What was Colonial about the colonization of the body? How was the

[5] Arnold, 9

[6] Arnold, page-7

materialization of the body in institutions, knowledges and tactics affected by the conditions of alien rule? To govern India as modern subjects required colonial knowledge and colonial regulation to function as self-knowledge and self-regulation, but this was impossible under colonialism."[7]

ঈশিতা দুবে অবশ্য জ্ঞান প্রকাশের এই আত্ম-জ্ঞান এবং স্ব-পরিচালনা যে উপনিবেশে একেবারেই অসম্ভব ছিল, এই তত্ত্ব পুরোপুরি মানতে চাননি। তিনি বলেছেন, "...certain practices of government, such as sanitation, operated as 'acts of colonial rule', other related practices of government, such as the regulation of hygenic behavior, were disemminated as norms of self-government and self-regulation.[8]

সুতরাং ব্যক্তির স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার পরিচালনার সঙ্গে স্ব-শাসন এবং স্ব-পরিচালন সম্পর্কিত। এর সুস্পষ্ট নিদর্শন, মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠান এবং এর কর্মকাণ্ড। সার্বিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে শহরের ঘন বসতিযুক্ত অঞ্চলে বিশুদ্ধ ও দূষিত জলের সঞ্চালন, আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ইউরোপের প্রেক্ষাপটেই স্বীকৃত হয়েছে। লন্ডন শহরের দীর্ঘ স্বায়ত্তশাসনের পরম্পরা এবং তার সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে শহর পরিচালনার সংযোগের সুদীর্ঘ ইতিহাস প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের মতো উপনিবেশে এই ব্যবস্থাটি প্রয়োগের 'ভিন্নতা' এবং 'বিবাদ' জনিত সমস্যা থাকলেও স্ব-শাসন এবং স্ব-পরিচালনার এক বিশেষ ধরনের প্রকাশ দেখা গেছিল সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির মধ্যে; সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর 'বিশ্বজনীন সাম্রাজ্যবাদী উদারনৈতিকতা'-র বাতাবরণে বৈধতা/স্বীকৃতি

[7] Gyan Prakash, *Another Reason: Science and the Imagination of Modern India,* New Delhi, Oxford University Press, 2000, page-22

[8] Ishita pande, *Medicine, Race and Liberalism in British Bengal symptoms of Empire,* Routledge studies in South Asian Stidies, 2010 page-7

আদায়ের কার্যকরী পরিকাঠামো তৈরি করতে, মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশনের পরিষেবাকে সংযুক্ত করার প্রয়াস স্ব-শাসন ও স্ব-নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রটিকেই চিহ্নিত করে।

'সাবজেক্ট'-দের স্বাভাবিকীকরণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা

ফুকোর তত্ত্ব এবং প্যাট্রিক জয়েসের মডেল অনুযায়ী উদারনীতিবাদ ও শহর জুড়ে দূষিত ও বিশুদ্ধ তরলের সহজ সঞ্চালনের তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছিলাম উদারনীতিবাদ যে কোনও রকম 'বাধা-বিপত্তি'-র বিরোধী একটি তত্ত্ব। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির সামগ্রিক প্রকল্পটি উপনিবেশে প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক উল্লেখের দাবি রাখে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে 'সাবজেক্ট'-দের স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টিতে এক নতুন দ্যোতনার সৃষ্টি করেছে তা সন্দেহাতীত।

ফুকো তাঁর "The Birth of Biopolitics"-এ লিখেছেন " ...when we know what this governmental regime called liberalism was, we will be able to grasp what biopolitics is."[9] উদারনৈতিক শাসনতান্ত্রিকতার সঙ্গে যে দেহ এবং দেহ-রাজনীতি এবং তার সূত্র ধরে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি যুক্ত একথা সন্দেহাতীত। ফুকো আধুনিক রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিকতা এবং ডিসিপ্লিনারি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দেহ এবং দেহ রাজনীতির গভীর সংযোগ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন আধুনিক রাষ্ট্র কঠিন কোনও প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসের থেকেও সাবজেক্টদের মধ্যে এক স্বতোৎসারিত নিয়মতান্ত্রিকতা তৈরি করার প্রতি বেশি যত্নশীল। এক্ষেত্রে সাবজেক্টদের নিজের মধ্যেই তৈরি হবে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে নিজে শাসন করার তাগিদ। এই ভাবে আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতার এক ত্রিভুজ তৈরি হয়, সার্বভৌমিকতা, নিয়মতান্ত্রিকতা ও সরকারি ইতিবৃত্তে। যার প্রধান লক্ষ্য বস্তু জনতা। এক্ষেত্রে, জনতা একই সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের সাবজেক্ট

[9] Michael Foucault, The Birth of Biopolitics: lectures at the College de France

এবং অবজেক্ট।[10] স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে তাই জনতাও ক্রমশ হয়ে ওঠে শাসনতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পার্থ চ্যাটার্জী যদিও এই বক্তব্যের খানিকটা বিরোধিতা করেছেন ঔপনিবেশিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন ঔপনিবেশিক সরকারের উপনিবেশের জনতার প্রতি বর্ণ-বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এখানকার সাবজেক্টদের পুরোপুরি স্বাভাবিকীকরণের প্রকল্পে বাধার সৃষ্টি করেছে।[11] সুতরাং একে উদারনৈতিকতার বৃহৎ আদর্শের সামনে বাধা বা অন্তরায় হিসেবে ধরাই যায়। কিন্তু এই বক্তব্যটিকেও ঈশিতা দুবে একটু অন্যভাবে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন উনিশ শতকে নতুন তৈরি হওয়া ফিজিওলজি বা শারীরবিদ্যা বিষয়টি ‘বর্ণ’ বিষয়টিকে এক নতুন বৈধতা দেয়। বিজ্ঞান ক্রমশ সামাজিক পৃথকীকরণের নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক বৈধতা সামাজিক পৃথকীকরণের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি প্রস্তুত করে।[12] এই বর্ণের বিষয়টি বেশ জটিল। বর্ণের পার্থক্য কীভাবে ঔপনিবেশিকদের প্রভাবিত করেছিল, আর কীভাবেই বা তাঁরা তাঁদের উদারতান্ত্রিক ভাবমূর্তির সঙ্গে ‘বর্ণ’-কে(race অর্থে) খাপ খাইয়ে শাসন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিলেন, এই বিষয়টিও আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। তাহলে বর্ণ-বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এবং কেন প্রজাদের ‘প্রকৃত উন্নতি’-র পথে চালিত করতে প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণের বিভিন্ন প্রকল্প তাঁরা উপনিবেশে প্রয়োগ করলেন এই বিষয়টিও বুঝতে সুবিধা হবে। উদারতন্ত্রের সঙ্গে ‘বর্ণ’-বিষয়টির সম্পর্ক খুব অদ্ভুত। একদিকে উদারতান্ত্রিক চিন্তকেরা বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ তাত্ত্বিক ভাবে সমর্থন করেন না। আবার অন্যদিকে ঔপনিবেশিকতার বৈধতা দিতে এদের বারবার ইউরোপীয়দের সঙ্গে উপনিবেশের ‘সাবজেক্ট’-

---

[10] Michael Foucault ‘Governmantality’, in *The Foucault Effect:Studies in Governmentality with two lectures and an interview with Michael Foucault,* Graham Burchell, Colin Gordon, Peter Miller (eds), Chicago, University of Chicago Press, 1996, p-21

[11] Partha Chatterjee, *The Nation and its Fragments: Colonial and Post Colonial Histories*,Delhi, Oxford University Press, 1994,p-10

[12] Ishita pande,p- 12

দের পার্থক্য নির্দেশ করতে হয়। সেক্ষেত্রে বর্ণ বিভাজন মূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে হয় বিভিন্ন ভাবে। কাজটা মোটেও সোজা নয়। আর ভারতের মতো উপনিবেশে তো সেটা বিশেষ ভাবে কঠিন। কারণ আঠারো শতকের শেষ দিকে William Jones(উইলিয়াম জোন্স) এবং এশিয়াটিক সোস্যাইটির অন্যান্য পণ্ডিতেরা সংস্কৃত, গ্রীক এবং ল্যাটিন যে একটি মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত এরকম একটা আভাস দিচ্ছিলেন।

জোন্স বেশ স্পষ্ট কথাতেই বলে ফেললেন, "The Sanskrit language, whatever may be its antiquity, is of a wonderful structure ; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either...no philologer could examine the Sanskrit, Greek and Latin, without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists."[13]

সুতরাং ভারতীয় আর্যদের সংস্কৃত ভাষা এবং ইউরোপের আদি ভাষাগুলি যদি একটি ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে এই ভাষার ব্যবহারকারীদের উৎসও যে এক এই যুক্তি মানতেই হয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের পক্ষে প্রাচ্যকে একেবারে উৎসগত ভাবে পৃথকীকরণের কাজটা ভারতের ক্ষেত্রে আরও জটিল হয়ে যায়। সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করার দায় তো আছেই।

১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে উপনিবেশের চিকিৎসা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে James Annesley(জেমস্ অ্যানাজ্‌লি), 'Dieses of warm climates' বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেদে মানুষের শারীরিক এমনকি মানসিক গঠনও আলাদা হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই একটি জায়গার অধিবাসীদের এক একটি 'National

[13] William Jones, "The third anniversary discourse on the Hindus" in "*The Collected works of William Jones"* Garland Cannon ed., NYU Press, vol-3, 1803, p-34

character’ গড়ে ওঠে।[14] অনুকূল পরিবেশে এক একটি অঞ্চলের অধিবাসীরা বিজ্ঞান, কলা, অন্যান্য আরও নানান দিকে এগিয়ে যায়। কালক্রমে স্বাধীনতা, উদারতা, প্রাগ্রসর মনোভাবের অধিকারী হয়ে ওঠে। আবার কোনও কোনও জায়গার অধিবাসীরা পরিবেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের কুপ্রভাবে হয়ে ওঠে স্বার্থপর। আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত পশুবৎ জীবনযাপন করতে থাকে তাঁরা। এই ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে মানবকূলের মধ্যেই পার্থক্য রচিত হয় বিস্তর।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত ভারত। ক্রান্তীয় অঞ্চল মধ্যযুগ থেকেই ইউরোপীয় সাহিত্যে অবগুণ্ঠনে ঢাকা এক রহস্যময় প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। কিন্তু উনিশ শতকে মানবকুলের ওপর পরিবেশের প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলবায়ুর কুপ্রভাব ভীষণ ভাবে আলোচিত হতে থাকে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলবায়ুর কুপ্রভাবে এখানে দীর্ঘদিন মানব প্রজাতির মধ্যে ক্রমিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছে এই রকম তত্ত্ব ক্রমশ উঠে আসতে থাকে।[15]

এই তত্ত্ব উপনিবেশিক আধিপত্যেরও উদারনৈতিক বৈধতা রচনা করার সুযোগ করে দেয়। প্রাকৃতিক প্রভাবে অবক্ষয়িত মানব প্রজাতিকে প্রগতির পথে সামিল করাকে তাদের শাসনের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেন ঔপনিবেশিকরা। তাই ভাষাতাত্ত্বিক ভাবে উৎসের সমরূপতার আভাস পাওয়া গেলেও ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক কুপ্রভাবের ফলে ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের থেকে পিছিয়ে পড়েছে, এই বক্তব্যের ভিত্তিতে ভারতীয়দের সঙ্গে বর্ণগত ভাবে নিরাপদ ব্যবধান রচনা করা গেল। সামাজিক তত্ত্বের সঙ্গে হাত মেলাল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।[16]

---

[14] James Annesley, *Researches into the causes, nature and treatment of the more prevalent diseases of India and of warm climates generally,* 3rd edn, London, Longman & co.,1885, p-9

[15] Ishita pande, *Medicine, Race and Liberalism in British Bengal symptoms of Empire*, Routledge studies in South Asian Stidies, 2010 page-30

[16] Ibid, page-30

এই তত্ত্ব অবশ্য ঔপনিবেশিকদের মনে আরেক রকম শঙ্কার জন্ম দিল। দীর্ঘদিন যে সমস্ত ইউরোপীয়রা ক্রান্তীয় অঞ্চলে কর্মসূত্রে এসে আছেন, দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করলে তাদের মধ্যে আবার পরিবেশের কুপ্রভাব পড়বে না তো! বর্ণগত অবনমন ঘটবে না তো তাদের! এছাড়া এর আগে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবে অনেক ইউরোপীয়র অকাল মৃত্যু ইউরোপীয়দের মনে ভয়ের উদ্রেক করেছিল। উপনিবেশের রোগ এবং চিকিৎসা নিয়ে যে সমস্ত ইউরোপীয়রা কাজ করছিলেন তাঁরা দাবি করতে থাকেন, ইউরোপের সৈন্যরা ভারতে এসে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে, তাদের মধ্যে অলসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, অচিরেই বিভিন্ন ক্রান্তীয় রোগের শিকার হচ্ছে তাঁরা। এখানকার পরিবেশ বর্ণের গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন আনছে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সব ইউরোপীয় পিতা-মাতাদের সন্তান-সন্ততি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ইউরোপীয়দের বর্ণগত শুদ্ধতা বজায় রাখার ব্যাপারে খুবই উদ্বেগ তৈরি হয়। অ্যানাজ্‌লি পরামর্শ দেন যে এদের বেশিদিন ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় বড় হতে দিলে হয়তো ইউরোপীয়দের বর্ণগত উৎকর্ষের অবক্ষয় ঘটবে।

এই চিন্তা ভারতে কার্যসূত্রে আসা ব্রিটিশদের কুরে কুরে খাচ্ছিল। সেখান থেকেই নিজেদের অনুকূল পরিবেশ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা এবং হিল স্টেশনগুলি স্থাপনের অবতারণা। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভারতে যাতে খানিকটা ব্রিটেনের মতো বাতাবরণে বড় হয়ে উঠতে পারে সেই জন্য হিল স্টেশনগুলিতে একাধিক আবাসিক কনভেন্ট স্কুল স্থাপন করা হয়।

যাই হোক, অ্যানাজ্‌লি-এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনায় অনন্য ছিলেন না। আরও অনেকেই জাতীয় চিন্তা করেছিলেন। অনেকে তো এর সঙ্গে আরও কিছু অনুষঙ্গও যুক্ত করেন। James Johnson (জেমস্‌জন্সন)-এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসের ফলে তৈরি হওয়া বিভিন্ন রকমের অভ্যেস, খাওয়া-দাওয়ার ধরন, পেশা, সার্বিক ভাবে ব্যক্তির মানসিকতা এবং শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে।

তিনি বলেন, " ...exposed during countless generations to the same succession of external influences of high temperature and corresponding habits of life and diet, receiving the same reiterated impressions peculier to climate and religion, an acquired temperament is formed, which constitutes the Hindu and the Mahomedan, men differing widely, morally and physically, from Europeans".[17]

তবে উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমস্যা ও চিকিৎসার ধরন নিয়ে যারা কাজ করছিলেন তাঁরা বলতে থাকেন, ব্রিটিশরা যেহেতু বর্ণগত দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত এবং বলিষ্ঠ; ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝে উঠতে পারছে ক্রমশ। তাদের সেই রকম বর্ণগত অবক্ষয় হচ্ছে না।[18] এই জাতীয় ধ্যান-ধারণা ঔপনিবেশিকদের খানিকটা স্বস্তি দেয়।

এরপরে ক্রান্তীয় অঞ্চলের 'বর্ণ'-র ধারণায় অনেক রকমের পরিবর্তন আসে। একদল গবেষক বলতে থাকেন ক্রান্তীয় অঞ্চলের 'বর্ণ'-কে আদিপর্বের বর্ণ থেকে অবক্ষয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে না দেখে বরং বৈচিত্র্যের প্রকারভেদ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। সমস্ত পৃথিবীতে এক রকমের বর্ণের থেকে বিভিন্ন কারণের ফলে বহু রকমের বর্ণের উৎপত্তি এই ভাবনাতেও পরিবর্তন আসে।

ঔপনিবেশিকরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে 'বর্ণ' সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তাভাবনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উদারনীতিবাদ আবার বর্ণ-বিদ্বেষের ঘোর বিরোধী ছিল। অথচ উপনিবেশে

---

[17] James Johnson, *The Influence Of Tropical climates On European Constitution, including original observations on the nature and treatment of the disease of Europeans on their return from Tropical climates*, 7th edn, London, John Churchil,1856, page-8

[18] Ishita Pande, page-32

নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় এবং স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে পার্থক্য রচনার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে নিরন্তর 'বর্ণ' বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। বলতে চান, পরিবেশের প্রভাবে অবক্ষয় এছাড়া আনুষঙ্গিক নানান কারণ যেমন দৈনন্দিন অভ্যেস, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির প্রভাবে অবনতির পথে চলা ভারতীয়দের উন্নতির দিশা দেখাতেই ঔপনিবেশিকরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। আর উন্নতির পথে সামিল করানোর জন্য দৈনন্দিন কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যেস গড়ে তোলার লক্ষ্যেই মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির অবতারণা। এই ভাবে উদারনীতিবাদ বেশ বুঝে শুনেই 'বর্ণ' সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল। যাকে বলা যেতে পারে 'উদারনৈতিক বর্ণবাদ'।[19]

তাই ফুকোর বক্তব্য থেকেই ধার করে বলা যেতে পারে উপনিবেশে উদারনীতিবাদের প্রয়োগের দিকটিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দর্শন বা রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে না দেখে বরং 'রাজনৈতিক যৌক্তিকতা' হিসেবে দেখাই যুক্তিযুক্ত। এই বক্তব্যকে Graham Burchell (গ্রাহাম বার্চাল) আরও প্রসারিত করে বলেন, "...from the point of view of the governmental reason, that is from the point of view of the rationality of political government as an activity rather than an institution. In this view, liberalism is not a theory, an ideology, a juridical philosophy of individual freedom, or any particular set of philosophies adopted by a Government....what is disticntive about the political reason of liberal government is that it constitutes a form of power and utilizes a range of strategies that support the civilizing project by shaping and governing the capacities, competencies and will of the governed."[20]

[19] Ibid, page-21

[20] Graham Burchell, 'Liberal Government and techniques of the Self' in Andrew Barry, Thomas Osborne and Nikolas Rose (eds), *Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo Liberalism and Rationalities of Government,* Chicago, University of Chicago Press, 1996,21

উদারনৈতিক রাজনৈতিক যৌক্তিকতা ও উপনিবেশ রাষ্ট্রের ডিসিপ্লিনারি প্রকল্প

রাজনৈতিক যৌক্তিকতা হিসেবে দেখলে উপনিবেশে উদারনীতিবাদের প্রয়োগকে শুধুমাত্র বর্ণ পৃথকীকরণের বিভিন্নতার অজুহাতে নস্যাৎ করা যায় না। বরং সাবজেক্টের বিশেষ রকমের আচরণ গড়ে তুলতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন রকমের ডিসিপ্লিনারি প্রয়াস যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। মিলের ইতিহাসের ব্যাখ্যা, মেকলের শিক্ষানীতি, বাজারগুলিকে বিশেষ ভাবে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের এইসব প্রয়াসগুলির পরিচায়ক। মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে শহরে বাস করার ডিসিপ্লিন, শহুরে নাগরিকদের মজ্জায় প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার এই প্রয়াসও উদারনৈতিক রাষ্ট্রের ডিসিপ্লিনারি প্রকল্পগুলির অন্যতম। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নাগরিক দায়িত্ববোধ 'স্ব-ইচ্ছায়', দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতে এবং খুব ব্যক্তিগত কিছু অভ্যেসকে সংযত/ 'নিয়মানুগ' পথে শহুরে অধিবাসীকে রপ্ত করানোর ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঈশিতা দুবে বলেছেন, এই স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহারের বিষয়টি আর শুধুমাত্র মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী থাকে না বরং শহুরে নাগরিকতার দায়িত্ববোধের আত্মপ্রতিফলনের বিষয়ও হয়ে ওঠে।[21] ঈশিতা দুবে উপনিবেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ আলোচনা করতে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির প্রসঙ্গটি অবতারণা করেছেন। মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার বিষয়টি তাঁর লেখায় সেইভাবে বিশদে আলোচিত হয়নি। তাছাড়া তিনি শুধুমাত্র কলকাতা শহরের এক্তিয়ারে এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সদর শহর এবং উত্তরবঙ্গ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া নাগরিকত্বের আহৃত ধারণা ও তার আত্মনির্মিতির প্রতিফলন শুধু নয়, বরং এই আত্মনির্মিতি ও আত্মপ্রতিফলন যে এখানে এক নতুন ধরনের মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক নাগরিকতার জন্ম দিয়েছিল সেই বিষয়টি আলোচনা করা হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে।

[21] Ishita Dube, 13

মিউনিসিপ্যালিটি, বর্ণবৈষম্য, বিভিন্নতা এবং বাধা-বিপত্তি

উদারনীতির আবহে জলের পাইপ আর ড্রেনের অন্ধকার রাজ্যের গোলকধাঁধায় উপনিবেশে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা এবং তাকে কেন্দ্র করে পৌর নাগরিকত্ব গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণাটিতে। পূর্বোক্ত তাত্ত্বিক আলোচনা এক্ষেত্রে কতকগুলি বুনিয়াদি প্রশ্নের সম্মুখীন করছে। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যে দিয়ে, উপনিবেশে প্রকল্পটির প্রয়োগ, কার্যকারিতা এবং এখানকার অধিবাসীদের সমগ্র প্রকল্পটির সঙ্গে সার্বিক বোঝাপড়া তৈরি হওয়ার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রথমত,শহরে মিউনিসিপ্যালিটি কী ধরনের 'ডিসিপ্লিনারি' কর্মকাণ্ডের সূচনা করল? উদারনীতির আবহে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবাগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'বিভিন্নতা'-র প্রশ্নটি 'বর্ণ' বৈষম্যের ওজরকে অতিক্রম করে প্রায়োগিক দিকে একটি বৃহত্তর প্রেক্ষিত রচনা করতে পারল কি না (অবশ্যই 'রাজনৈতিক যৌক্তিকতা'-কে অতিক্রম না করে)? আবার এই পরিষেবাগুলি প্রয়োগের সময় এবং তার অব্যহিত পরে উদ্ভূত 'বাধা বিপত্তি'গুলি সামগ্রিক ভাবেই কি প্রতিষ্ঠান বিরোধী ছিল? নাকি প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতার ভালো-মন্দ বিভিন্ন দিক নিয়ে নাগরিক ওজর-আপত্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর নাগরিকের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর অংশ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিকে যথাযথ ভাবে বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। আবার এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে শহরবাসীর মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটিকে আঁকড়ে ধরার অধিকার বোধ আস্তে আস্তে একটা পৃথকীকরণের পর্যায়ের সূচনা করল তাও পরিলক্ষিত হবে সামগ্রিক আলোচনার মধ্যে। শুধু তাই নয় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়ে এক স্বতন্ত্র নাগরিক চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করব আমরা, যাকে 'পৌর নাগরিকত্ব' হিসেবে চিহ্নিত করাই যেতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলার সদর শহরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ড এবং উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং শহরের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি দেখার চেষ্টা করা হবে। এক্ষেত্রে মূলত মিউনিসিপ্যালিটির

পরিষেবার পরিকাঠামোর মাধ্যমে বিষয়টি লক্ষ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এই পরিকাঠামোগুলির সশরীর উপস্থিতি অনেক অন্তর্নিহিত ‘গুহ্য’-বিষয়ের অনস্বীকার্য বাস্তব পরিচায়ক হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে বাংলায় গড়ে ওঠা মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পরিকাঠামো নির্মাণের কর্মকাণ্ডে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের প্রকল্প এবং দূষিত জল নিষ্কাশনের প্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়া Erik Swyngedouw(এরিক সুইংগেডাও) বা Mathew Gandy(ম্যাথুই গ্যান্ডি)-র ভাষায় বললে বলতে হয়, এই ‘জল’-এর মাধ্যমে সমাজকে বেশ পরতে পরতে বোঝা যায়। আর সেই সঙ্গে এই জলকে কেন্দ্র করে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক অনুপ্রবেশ সমাজের আভ্যন্তরীণ রদবদলকেও বুঝতে সাহায্য করবে। যা ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে সাবজেক্ট সত্তার তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে এক নতুন আঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রথমে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডের ভিন্নতা তথা ‘বিভিন্নতা’-র বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। ‘বিভিন্নতা’-র প্রশ্নটি শুধুমাত্র বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে আরও বিবিধ এবং ব্যাপক ভাবে প্রতিভাত হবে আমাদের আলোচনায়। রীতিনীতি-সংস্কৃতির প্রভেদ, সেই সঙ্গে বিবিধ ভৌগোলিক বিভেদ, অঞ্চল বিশেষে প্রকল্প নির্মাণে ঔপনিবেশিক চাহিদা অনুযায়ী গুরুত্বের রকমফের-- আমাদের ‘বিভিন্নতা’-র প্রসঙ্গটি এক বৃহত্তর প্রেক্ষিত থেকে বুঝতে সাহায্য করবে।

বিভিন্নতা’-র বৈচিত্র্য বর্ণন

ক্রান্তীয় জলবায়ুর বেশ উষ্ণ অঞ্চলেই ভারতের অবস্থান। জল তাই এই অঞ্চলে কাছে বিশেষ ভাবে অপরিহার্য। জল নিয়ে হাজারো সংস্কার এখানকার প্রতিবেশেরই ফল। জল নিয়ে জাত-পাতের ছুঁতমার্গ। জলকে কেন্দ্র করে হাজারটা ধর্মীয় নীতি, সবমিলে জল শুধু জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়; ভারতের জীবন সংস্কৃতির অঙ্গ। জলের উৎস নদী এখানে দেবীরূপে পূজিত হন। বিশেষ বিশেষ তিথিতে বা জীবনের বিশেষ উৎসব উদ্‌যাপনে নদী বা জলাশয়ের জলে স্নান করা হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কৃতি। এছাড়া কুম্ভস্নানের মতো সর্বভারতীয় স্নানের উৎসব

তো আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। জল শুধু এখানে রাজনৈতিক নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে না, বরং জল এখানে সামাজিক বৈধতার নির্ণায়ক হিসেবেও কাজ করে। ভারতের বর্ণ ব্যবস্থার বিভেদ রচনা করার ক্ষেত্রে জল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন উচ্চবর্ণ হিন্দুদের পক্ষে সমস্ত জাতের মানুষের হাতের জল পান করা ঠিক বিধেয় নয়।

এমতাবস্থায় জলের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করার প্রকল্পে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি নেহাত সরল ছিল না। কলকাতা শহরে প্রথম এই প্রকল্পটি চালু করতে গিয়ে ঔপনিবেশিকদের বেশ কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে বেশ অভিনব পন্থাও অবলম্বন করতে হয়। ভারতবাসীর বিবিধ ছুঁতমার্গের সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে সেই নিয়ে ব্রিটিশরা বেশ চিন্তিতই ছিলেন। সরবরাহের প্রকল্পে যদি বর্ণ হিন্দুদের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করা যায়, তাহলে হয়তো জল প্রকল্পটির বৈধতা পেতে আরও সুবিধা হবে। তবে সব কিছুর ওপর ব্রিটিশদের একটা ভরসার জায়গা ছিল হিন্দুদের গঙ্গাজলের পবিত্রতার ধারণা। গঙ্গাজলকে হিন্দুরা এতটাই পবিত্র মনে করে যে তাদের বিশ্বাস এই জলের সংস্পর্শে যা কিছু থাকবে সব পবিত্র হয়ে উঠবে। তাই গঙ্গাজলকে যদি পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা যায়, তাহলে হয়তো হিন্দুরা কালক্রমে এই ব্যবস্থাকে মানিয়ে নেবে, এমনটা তাঁরা ভেবেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি ভয়ও তাঁরা পেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন পাইপের সংযোগস্থলকে পিচ্ছিল রাখতে যে গ্রিজ ব্যবহার করা হয়, তাও নিষিদ্ধ পশুর চর্বি থেকে তৈরি, এই নিয়েও একটা আলোড়ন তৈরি হতে পারে। হয়তো সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি থেকেই তাদের এই শঙ্কার সূত্রপাত। জল সরবরাহ করার জন্য ৫০০ কিউবিক ফিট মাপের জলাধারে জল রাখা এবং তারপর সরবরাহ করার পরিকল্পনাও করেন তাঁরা। হিন্দুরা বৃহদাকার জলাশয়ের জল যেহেতু ধর্মীয় ভাবে পবিত্র বলে মনে করে, তাই এতো বড় আয়তনে জল রাখা হলে হিন্দুরা হয়তো তাকে পবিত্র বলেই গণ্য করবেন এরকম চিন্তা ভাবনাও তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও হয়তো হিন্দুদের একটা অংশ এই প্রকল্প শাস্ত্রসম্মত নয় বা ইউরোপীয়দের দ্বারা

পরিচালিত জল প্রকল্প সম্পর্কে শাস্ত্রবিধান নেই বলে এই জল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে পারে এমনটাও আশঙ্কা করা হয়। তবে হিন্দু ধর্মের উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণদের যদি এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, কালক্রমে বিনা ঝক্কি-ঝামেলায় একেবারে বাড়ির ভেতর গঙ্গা জল সরবরাহের মতো লোভনীয় ব্যবস্থার বৈধতা পেতে বেশি দিন লাগবে না এমনটা ভেবেছিলেন তাঁরা।[22] সুতরাং ধর্মীয় বৈধতা পেতে সেই মোতাবেক কিছু ব্যবস্থা প্রকল্পটির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়েছিল ঔপনিবেশিকদের।

খাতায় কলমে ঔপনিবেশিকদের উদ্দেশ্য ছিল, সব থেকে কম খরচে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা। কিন্তু আঞ্চলিক রীতিনীতির চাপে বা স্থানীয় দাবিকে মাথায় রেখে পথ বিচ্যুতি তথা 'বিভিন্নতা'-র দৃষ্টান্ত বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করলে সুস্পষ্ট ভাবে ধরা দেবে। স্থানীয় জনতার তরফ থেকে ঔপনিবেশিক হেজিমনির মাহাত্ম্য মনে গেঁথে যাওয়া 'স্বাস্থ্যরক্ষা'-র বিধান হিসেবে মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের দাবি, আবার তার সঙ্গে তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য অপরিহার্য গঙ্গা নদীর জল সরবরাহের মেলবন্ধন এই বৈচিত্র্য বুঝতে সাহায্য করবে।

বহরমপুরের জল সরবরাহ প্রকল্প নিয়ে ঔপনিবেশিক মহলে কথাবার্তা শুরু ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। কলকাতা শহরে পরিশোধিত জল সরবরাহ চালু হয়েছে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। সরকারি তরফে বহরমপুর শহরে জল সরবরাহ প্রকল্পের আলাপ-আলোচনা চলার কয়েকদিনের মধ্যেই কাশিমবাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী প্রথমে অসরকারি ভাবে (বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই ঘোষণা প্রকাশিত হয়) এবং পরে সরকারি ভাবে ঘোষণা করেন তিনি বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্পের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। মহারানি শুরুতেই ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দেন, তিনি

[22] F.W. Simms, *Report on the Establishment of Water-Works to Supply the City of Calcutta,* Calcutta, Military Orphan Press, 1853, p. 13

তিন বা চার বছরে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেবেন।[23] কিন্তু জল সরবরাহ প্রকল্পটি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা বর্ধমান বা আরার মতো ভালো করে তৈরি করতে হবে।[24] এখানে লক্ষ করার মতো বিষয় হল মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে সরবরাহিত জলের প্রকল্পকে বেশি স্বাস্থ্যসম্মত বা সভ্য নাগরিক জীবন-যাপনের জন্য অপরিহার্য নির্ণায়ক বলে ভাবতে শুরু করেন মফস্বলবাসী। রাষ্ট্রের উদারনৈতিক মতাদর্শে অভ্যেসের নিয়মানুবর্তিতায় স্বতোৎসারিত সাবজেক্টহুড গঠনের প্রক্রিয়া এবং তার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অঙ্গ হয়ে ওঠার নজির হিসেবে আমরা একে দেখতেই পারি।

স্বর্ণময়ী দেবী জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের খরচ বাবদ ধার্য হওয়া সমস্ত টাকার কিছু অংশ মেটালে এ.ই.সিল্ক, জল সরবরাহ বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় কোন উৎস থেকে বহরমপুর শহরে জল সরবরাহ করা হবে? গঙ্গা নদীর জল? না গভীর নলকূপের জল? এই নিয়ে বেশ জটিলতার মুখে পড়তে হয় বহরমপুর জল সরবরাহ প্রকল্পকে। এস.রুডলফ এবং মি.নরম্যান নামে দুইজন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৯-ই সেপ্টেম্বর স্নানের ঘাট থেকে জল নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁরা মতামত দেন, এই জল একেবারে ব্যবহারের অনুপযুক্ত, 'তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত'। এরপর স্যানিটারি কমিশন নিজের দায়িত্বে পরের বছর এপ্রিল মাসে জল পরীক্ষা করান এই পরীক্ষার রিপোর্টও সন্তোষজনক আসে না। গঙ্গার জল পরিশোধন করে পানীয় হিসেবে ব্যবহারের জটিলতা দেখে বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জে.কেনেডি বলেন এর থেকে গভীর নলকূপের জল ব্যবহার করলে অনেক সহজ উপায়ে পানীয় জল পাওয়া যাবে। কিন্তু এতে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা বেঁকে বসেন। তাঁরা বলেন এযাবৎকাল শহরবাসী গঙ্গার জল ব্যবহার করে এসেছে। গঙ্গার জলকে তাঁরা পবিত্র হিসেবে গণ্য করে। তাই গঙ্গা জলের পরিবর্তে অন্য জল

[23] MUNICIPAL DEPARTMENT, JULY 9,1894, FILE NO.-M1-W/9, PROCEEDING NO.- 14

[24] MUNICIPAL DEPARTMENT, JULY 9,1894, FILE NO.-M1-W/9, PROCEEDING NO.- 16

সরবরাহ করা হলে সাধারণ মানুষ তা ভালো ভাবে নেবে না। অন্য দিকে, স্বর্ণময়ী দেবীর তরফ থেকেও জানানো হয় গঙ্গার জল ব্যবহার না করলে বকেয়া কোনও টাকা দেওয়া হবে না। পরিস্থিতির চাপে স্যানিটারি কমিশনার এইচ.জে. ডাইসন বহরমপুর শহরের উত্তরে ফরাস ডাঙ্গা থেকে জল সরবরাহ করে পরীক্ষা করেন। তিনি এই জলকে 'অর্গানিক্যালি সেফ' বলে ঘোষণা করেন। ডাইসন অবশ্য স্বীকার করেন ধর্মীয় অভ্যেসের খাতিরে তিনি এই গঙ্গা নদী থেকে জল সরবরাহ বিষয়টি মেনে নিচ্ছেন।[25]

স্থানিক প্রকৃতিগত বিভিন্নতাকেও পরিষেবার পরিকাঠামোতে স্থান দিতে হয়েছে ঔপনিবেশিকদের। যেমন দার্জিলিং শহরের জল সরবরাহ বা ড্রেন ব্যবস্থা বিন্যাসের কথা আলোচনা করলেই সেই বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। দক্ষিণবঙ্গের মতো এই শহরের জল সরবরাহের উৎস নদী নয়। ঝর্ণার জল থেকে শহরটিতে জল সরবরাহ করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হয়। সব থেকে কম জল অপচয় করে কত বেশি পরিমাণ জল পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা যায়, তার জন্য দরকার হয় বহু হিসেবনিকেশ। অন্যদিকে ঝর্ণার জল কমে যাওয়া, বিভিন্ন ঋতুতে জলের প্রবাহ বিভিন্ন রকম হওয়া, এর সঙ্গে মোকাবিলা করতেও বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এরপর জল সরবরাহের ক্ষেত্রেও অন্য রকমের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় এখানে। জলের সম-উচ্চতার নীতি এখানে প্রযোজ্য নয়। এখানকার ভূ-প্রকৃতি জল ওপর থেকে নীচে দ্রুত ধাবিত হতে সাহায্য করে। এমতাবস্থায় জলাধারে জল সঞ্চয় করে সরবরাহ করলে পাহাড়ি অঞ্চলে ওপর দিকে যারা থাকে তাদের মধ্যেই জল নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে নিচু অঞ্চলেও জল পাঠানোর জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। ড্রেন ব্যবস্থার জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। সুষ্ঠু ভাবে ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাস না করলে একজনের বাড়ির বর্জ্য পদার্থ অন্যজনের বাড়ির মধ্যে পতিত হবে। সমতলের সমান্তরাল ড্রেন ব্যবস্থার বদলে এখানে পাহাড়ের ঢালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

[25] MUNICIPAL DEPARTMENT, MARCH,1897, FILE NO.- M 1-W/5, PROCEEDING NO.-7

ড্রেন ব্যবস্থা তৈরি করতে হয়েছে। ভূ-প্রকৃতির পাশাপাশি দার্জিলিংকে শৈল শহর হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাও প্রকল্পগুলিকে সমতলের প্রকল্পগুলির থেকে অনেকাংশে আলাদা করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, দার্জিলিং-এ ক্রমবর্ধমান পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে প্রথমেই গুরুত্ব পায় হোটেল এবং বাংলো তৈরির বিষয়টি। এক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে হোটেল নির্মাণের জন্য লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[26] অন্যত্র কোথাও মিউনিসিপ্যালিটির তহবিল থেকে হোটেল নির্মাণের জন্য টাকা ধার দেওয়া বা উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ টাকা হোটেল-বাংলো নির্মাণের দৃষ্টান্ত নেই। সুতরাং প্রয়োজন ভিত্তিক ঔপনিবেশিক স্বার্থও অনেক ক্ষেত্রেই মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা রচনা করেছিল।

আবার ফিরে আসি দার্জিলিং-এর জল সরবরাহের প্রসঙ্গে। দার্জিলিং শহরে একটি সমস্যা ঔপনিবেশিকদের প্রায় নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল— হিল ডাইরিয়া। ইতিমধ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকেই ব্যাক্টেরিয়া সংক্রান্ত নানারকম গবেষণা হতে থাকে ইউরোপে। তাই হিল ডাইরিয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জলের প্রতি নজর পড়ে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন কমিটিও তৈরি হয়। প্রথমে এর জন্য এখানকার জলে স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুণ বেশি অ্যালবুমিনিয়ড অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিকে কারন হিসেবে দেখানো হয়। এরপর দার্জিলিং-এর জলে মাইকার উপস্থিতিকেও দায়ী করা হয়। বিভিন্ন হিল স্টেশনের পরিস্থিতি যাচাই করেও সঠিক দিশা পাওয়া যায় না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পাস্তুর চেম্বারলিন্ড ফিল্টার নামক একটি ত্রিস্তরীয় পোর্সিলিন ফিল্টার বসানো হয়। নির্মাতাদের দাবি অনুযায়ী মূলত পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের প্রেসার খুব বেশি, সেই সব অঞ্চলের জন্য এই ফিল্টার খুব কার্যকরী। কিন্তু কার্যত দেখা যায় এই ফিল্টারটি যে সময়ে যে পরিমাণ জল

[26] JUDICIAL PROCEEDINGS, PROCEEDINGS-145-146, JULY-1868

পরিশোধন করতে পারছে তা পরিস্থিতির তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল।[27] **১৯০১** খ্রিষ্টাব্দে তেত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে বালির ফিল্টার বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে সেটলিং ট্যাঙ্কের সংখ্যাও বাড়ানো হয়।[28] এর পরের বছর সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ মিউনিসিপ্যালিটি তার রিপোর্টে দাবি করে, এই নতুন জল পরিশোধনের ব্যবস্থার ফলে শহরের ডাইরিয়ার প্রকোপ অনেক কমেছে। ফাদার ন্যারিস মিউনিসিপ্যালিটিকে জানিয়েছেন, জলের উন্নতির জন্য সেন্ট যোশেফ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বেশ বেড়েছে।[29] জল পরিশোধনের জন্য এই জাতীয় কর্মকাণ্ড দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে পরিলক্ষিত হয়নি।

দার্জিলিং-এ বাড়িতে জল সরবরাহের ক্ষেত্রেও ভূ-প্রকৃতিজনিত কারণে বিভিন্নতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে স্টপককের একটা বড় ভূমিকা ছিল। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ওপর থেকে নীচে জল পাঠানোর সময় কোনও অঞ্চলের বা বাড়ির জল সরবরাহ স্টপককের মাধ্যমে বন্ধ করে পরবর্তী ঢালে জল পাঠাতে হত।[30] দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই স্টপককের প্রয়োজন হয়নি। অবশ্যই এই জাতীয় কর্মকাণ্ড বিভিন্নতার যুক্তিকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

উপনিবেশে যখন মিউনিসিপ্যালিটির প্রকল্পগুলি প্রযুক্ত হয়েছে তা শুধু বৃহত্তর ক্ষেত্রে ‘বর্ণ’-এর ভিত্তিতে আলাদা তা নয়, বরং আরও বহুবিধ বিভিন্নতা এই প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্যের কোলাজ।

‘বাধা-বিপত্তি’-র বিক্রিয়া

এবার এই পরিষেবাগুলি প্রসঙ্গে উদ্ভূত ‘বাধা-বিপত্তি’ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। এই বাধাবিপত্তিগুলো কি সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বর্জনমূলক প্রতিবাদ ছিল, নাকি

---

[27] MUNICIPAL, FILE M1-W/8, PROCEEDING-10, JANUARY 1898

[28] MUNICIPAL,FILE- M1W-1, PROCEEDINGS-42, MARCH,1903

[29] MUNICIPAL,FILE- M1W-1, PROCEEDINGS-43, MARCH,1903

[30] MUNICIPAL, FILE M-2R-17, NOVEMBER 1899

উদারনৈতিক 'রাজনৈতিক যৌক্তিকতা'-কে বর্জন না করে এই মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া ছিল, এই মর্মে বিষয়টি বোঝার একটি প্রচেষ্টা থাকবে।

আমাদের আলোচনা শুরু করি বর্ধমান শহরের জলকর বর্ধিত হারে আদায় করার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাগরিক প্রতিবাদ দিয়ে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কিছু নিয়মাবলী তৈরি হয়, যেখানে বর্ধিত হারে জলকর আদায়ের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই হারে জলকর দাঁড়ায়, মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে থাকা স্থাবর সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্যের প্রায় ৬ শতাংশ। অন্যদিকে, আবার এই নিয়মাবলীতে বলা ছিল যে, জলের কলের ১/৩ মাইল দূরবর্তী অঞ্চল থেকে জলকর আদায় করা যাবে না।[31]

বর্ধমান শহরের ওয়ার্ড C তে জলের সরবরাহ খুব ভালো নয় এবং এখানকার অধিবাসীরা পুকুরের জলেই অভ্যস্ত বলে দাবি স্থানীয় জনতার। তাই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বর্ধিত হারে জলকর দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু একই মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে দুইরকম নিয়ম ন্যায্যত কীভাবেই বা করা যাবে, সেই নিয়েও জল্পনা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের মধ্যে। এই নিয়ে মিটিং-ও হয়েছে বহু।

প্রয়াগ লাল পাণ্ডে নামে ওয়ার্ড C-এর এক বাসিন্দা তাঁদের উপর ১৮৮৪-এর নতুন জলকর যাতে না চাপানো হয়, সে জন্য মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারিকে চিঠি লেখেন। তিনি লেখেন, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষ্টসাগর, কমলসাগর, বার সর্বমঙ্গলা, লালা দিঘি, মনি সাগর, বাঁকা এছাড়াও অন্য বহু জলাশয়ের জল ব্যবহার করতে পারেন। তাই তাঁদের কাছে পাইপের জল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ নেই। নতুন জলের আইনের অতিরিক্ত জলকর দিতে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রায় অক্ষম। এই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা খুবই গরিব। গৃহকর দিয়ে আরও অতিরিক্ত জলকর দেওয়া তাঁদের উপর অত্যাচারের সামিল। এছাড়া এই অঞ্চলটিকে

[31] MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO.60-78, DEC 1885

পুরো শহর নয়, বরং শহরতলি বলা যায়। শহরের অন্য অঞ্চলে সম্পন্ন মানুষদের বসবাস। তাঁরা জলকরের এই অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে সক্ষম।[32] অন্যদিকে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন চেয়ারম্যান নলিনাক্ষ বসু এই চিঠির প্রতিক্রিয়া হিসেবে বর্ধমান শহরের ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান, প্রয়াগ লাল পাণ্ডে তাঁর চিঠিতে যে সব জলাশয়ের নাম করেছেন, তার বেশির ভাগই ওয়ার্ড C তে নেই। এইসব জায়গার বাসিন্দারা খরার সময়ে মিউনিসিপ্যালিটির জল দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত। বরং, এই অঞ্চলের অনেক বাসিন্দার কাছ থেকে অতিরিক্ত জলের কল স্থাপনের দাবি উঠে এসেছে।[33]

সরকারী ভাবে প্রয়াগ লাল পাণ্ডের দাবি নাকচ হয়। সরকারি তরফে জানানো হয়, খরার মরশুমে এবং শহরের স্বাস্থ্যে জল সরবরাহের প্রভাব অসামান্য। তাই জলকর কমানোর দাবি মানা হবে না।[34]

শেষপর্যন্ত, প্রয়াগ লাল পাণ্ডে আর এক চিঠিতে লেখেন ওয়ার্ড C-এর মূলত কৃষিজীবী বাসিন্দারা যদি কর দিতে বাধ্য হন, তবে এই অঞ্চলে ভালো ভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।[35]

বর্ধমান শহরে জল সরবরাহ প্রকল্প দেখলাম একটি প্রতিরোধের সম্মুখীন। তবে এই বাধাকে আদৌ প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলা যায় না। বরং মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকারিতার ধরন নিয়ে নানারকম প্রশ্ন তুলেছে শহরের একাংশের জনতা, এবং এই মর্মে সমস্ত নাগরিকবৃন্দ সহমত পোষণ করেননি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অভিযোগকারীও ব্যবস্থাটি প্রায় মেনেই নিলেন। সুতরাং এই বাধা কখনই মিউনিসিপ্যালিটির রাজনৈতিক বৈধতা/যৌক্তিকতার প্রশ্নটি অতিক্রম করেনি।

---

32 MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO.64

33 MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO.70

34 MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO.69

35 MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO. 71

বহরমপুর শহরেও আমরা একটু অন্যরকম প্রতিরোধের ধরন দেখতে পেয়েছি। এখানকার মহারানি স্বেচ্ছায় জল সরবরাহ প্রকল্পটির ব্যয় ভার বহন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত ছিল গঙ্গা নদীর জল সরবরাহ করতে হবে। একটি পর্যায়ে ব্রিটিশরা গঙ্গা দূষণের কথা চিন্তা করে গভীর নলকূপের জল সরবরাহ করার কথা ভাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনরা প্রবল প্রতিবাদ জানান। মহারানিও এক্ষেত্রে ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হন না। শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিকরা গঙ্গার জল পরিশোধন করে সরবরাহ করতে রাজি হন। সুতরাং এক্ষেত্রেও প্রতিরোধ ঠিক প্রতিষ্ঠান বিরোধী নয়। বরং তাঁরা স্বেচ্ছায় মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে জল সরবরাহের ব্যবস্থা চেয়েছেন। আবার তাদের কিছু স্বতন্ত্র দাবি মেটাতে প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা সেই ভাবে করতে হয়েছে ঔপনিবেশিকদের। যা বিভিন্নতার নিদর্শনের আরও পাল্লা ভারী করেছে। সেই সঙ্গে 'বাধা বিপত্তি' যে উদারনীতির 'রাজনৈতিক যৌক্তিকতা'-কে অতিক্রম করেনি তাও স্পষ্ট হল।

মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠানিক কার্যকলাপের মাধ্যমে শহরে বাস করার ডিসিপ্লিন, কীভাবে শহুরে নাগরিকদের মজ্জায় প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছিল সেই বিষয়টিও এই পরিসরে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নাগরিক দায়িত্ববোধ 'স্ব-ইচ্ছায়', দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতে এবং খুব ব্যক্তিগত কিছু অভ্যেসকে সংযত/ 'নিয়মানুগ' পথে চালিত করার অভ্যেস শহুরে অধিবাসীদের রপ্ত করানোর ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে এফ.এম. সিম কলকাতায় পরিষ্কার জল সরবরাহের একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এতে তিনি কলকাতা শহরে প্রচলিত জল ব্যবহারের অভ্যেস সম্পর্কে একটা চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কলকাতায় বহু পুকুর আছে। এখানকার অধিবাসীরা এই জলেই স্নান করেন, বাসন মাজেন, কাপড় কাচেন আবার এই জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহার করেন। ফলে, এই

অভ্যাস জনস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এছাড়া ভিস্তিদের মাধ্যমে খুব কম সংখ্যক নাগরিক জলের জোগান পান।[36]

এই রকম একটি পরিস্থিতি থেকে যখন কলকাতা শহরে পাইপের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর পরিশ্রুত জল পাইপের মাধ্যমে সরবরাহিত হয় এবং নাগরিকবৃন্দ হাইড্রোলেন্ট থেকে জল সংগ্রহ করা শুরু করে তখন থেকে প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ একটা পৃথক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মিউনিসিপ্যালিটির কলের জলে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে শুরু হয় শহরবাসীর পৌর নাগরিক জীবনের এক নতুন পর্ব। সর্বোপরি মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য রক্ষার বিধান একবার মাথায় ঢুকে যাওয়ার পরে জল নিয়ে নিজেদের কিছু অভ্যাস (যেমন- মিউনিসিপ্যালিটির কলে জল আসার সময় অনুযায়ী গৃহস্থালির কাজের বিন্যাস করা, ঘরে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি) বদল করতে বাধ্য হন শহরবাসী।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় Act IV (B.C)-এর নতুন আইন।[37] এই আইনে বলা হয়, যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটির সীমানায় গৃহকর দিয়ে বসবাস করেন, তাঁরা সার্ভিস পাইপ থেকে নিজস্ব যোগাযোগের পাইপ দিয়ে বাড়ির এলাকার মধ্যে জলের সংযোগ নিতে পারবেন। শুরু হয় নাগরিক অভ্যেস রদ-বদলের আরেকটি অধ্যায়। এর জন্য অবশ্য কতগুলি শর্ত দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে প্রথম শর্তই ছিল বাড়িতে ম্যাসনারি হাউস থাকতে হবে। সেখানেই জলের ট্যাপটি থাকবে।

সামগ্রিক ভাবে জল সরবরাহের বিষয়টি নাগরিকদের জীবনকে নিয়মতান্ত্রিকতার নিগড়ে বাঁধতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ আগের পুকুর বা নদীতে স্নান বা অন্যান্য গৃহস্থালির কাজ

---

[36] F.W. Simms, *Report on the Establishment of Water-Works to Supply the City of Calcutta,* Calcutta, Military Orphan Press, 1853, p. 9.

[37] MUNICIPAL,MUNICIPAL BRANCH, FILE :M2-R/9, JANUARY 1898, PROCEEDINGS-13-14 (WBSA)

সারাতে গোপনীয়তা বা ব্যক্তিগত পরিসরের ধারণাটি অনেকাংশেই অন্যরকম ছিল। কিন্তু নতুন ধরনের নিয়মতান্ত্রিকতায় নাগরিকতার 'গোপন' ব্যক্তিগত পরিসরের বিষয়টি বিশেষ মাত্রা পায়। এই নিয়মের নিগড় মিউনিসিপ্যালিটির প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায় নাগরিকদের মধ্যে এমন ভাবে ঢুকে গেছিল যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাব কলকাতা শহরের পরবর্তীকালে তৈরি হওয়া অন্যান্য শহরের পরিষেবার প্রকল্পগুলিতে। যেখানে কলকাতার নাগরিকতার নবনির্মাণের দৃষ্টান্তে পরিচিত হয়ে অন্যান্য শহরে এই প্রকল্পগুলি এখানকার অধিবাসীরা (অধিকাংশ) বেশ সাদরেই গ্রহণ করে। বহরমপুরের ক্ষেত্রে তো আমরা দেখলাম গঙ্গার তীরবর্তী শহর হওয়া সত্ত্বেও এখানকার নাগরিকবৃন্দ ঔপনিবেশিকদের কাছে মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে জল সরবরাহ করার আবেদন রাখেন। এমনকি এর জন্য কাশিমবাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্পের ব্যয় ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[38] বলেন জল সরবরাহ প্রকল্পটি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা বর্ধমান বা আরার মতো ভালো করে তৈরি করতে হবে।[39] এর থেকেই আমরা কিছুটা ধারণা পেতে পারি কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মতান্ত্রিকতা এবং হেজিমনি শহরের নাগরিকদের মজ্জায় গেঁথে গেছিল।

সুতরাং উদারনৈতিকতার একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশের মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকারিতায় 'বিভিন্নতা'-র প্রশ্নটি শুধুমাত্র 'বর্ণ'-এর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তা অতিক্রম করে আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, সার্বিক আলোচনায় এই বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করলাম। সেই সঙ্গে দেখলাম কার্যক্রম চলার পথে উদ্ভূত 'বাধা বিপত্তি'গুলি উদারনৈতিকতার রাজনৈতিক যৌক্তিকতাকে অতিক্রম করেনি। বরং ব্যক্তির ক্রমশ প্রতিষ্ঠানের বিষয় থেকে অঙ্গ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার অনুঘটক বা বলা ভালো বিক্রিয়কের কাজ করেছে।

---

[38] MUNICIPAL DEPARTMENT, JULY 9,1894, FILE NO.-M1-W/9, PROCEEDING NO.- 14

[39] MUNICIPAL DEPARTMENT, JULY 9,1894, FILE NO.-770, PROCEEDING NO.- 16

নাগরিকের আত্মজ্ঞান, স্ব –পরিচালনা ও মিউনিসিপ্যালিটি

এবারে বরং জ্ঞান প্রকাশ ও ঈশিতা দুবের বিতর্কের প্রসঙ্গটি মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডের সাপেক্ষে আলোচনা করি, তাহলে নাগরিক নির্মিতির সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির প্রকল্পগুলির সম্পর্কের একটি অন্য বিন্যাস বুঝতে পারব। জ্ঞান প্রকাশ বলেছেন ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নাগরিকের ঠিক সাবজেক্ট থেকে অবজেক্ট বা লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় না। কারণ ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে নাগরিকদের আত্মজ্ঞান লব্ধ করার এবং স্ব-পরিচালিত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। অন্যদিকে, ঈশিতা বলেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাষ্ট্রের উদারনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান লব্ধ করার এবং স্ব-পরিচালিত হওয়ার সুযোগ ছিল। বিশেষত স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই প্রক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছিল বলেই ঈশিতার অভিমত। মিউনিসিপ্যালিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমেও আত্মজ্ঞান লব্ধ করা ও স্ব –পরিচালনার সুযোগ ছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা দার্জিলিং শহরের জল পরিষেবার কথা বলতে পারি। যেখানে জলের সমউচ্চতার নীতি মেনে জল সরবরাহ করা যায় না। এখানে বাড়িতে মেন পাইপ থেকে কমিউনিকেশন পাইপের মাধ্যমে জল বিভিন্ন বাড়িতে পাঠানো হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়। ঠিক হয় কমিউনিকেশন পাইপগুলি মেন পাইপের সঙ্গে একটি ফেরুল এবং স্ক্রু-এর দ্বারা যুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক বাড়িতে স্টপ কক এবং স্টপকক বক্সের বিশেষ ভূমিকা ছিল। একটি বাড়ির স্টপকক বন্ধ হলে তবেই পাহাড়ের পরবর্তী ধাপে অন্যান্য বাড়িতে জল সরবরাহিত হতে পারত। সুতরাং এক্ষত্রে স্ব-পরিচালনার একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যাচ্ছে।

বর্ধমান শহরের একটি দৃষ্টান্তে দেখব, যেখানে স্ব-পরিচালনা এবং আত্মজ্ঞান, নাগরিকত্বের একটি নিজস্ব এক্তিয়ার তৈরি করছে। যে নাগরিকত্ব একান্তই মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক। শহরের একেবারে সীমান্তে থাকা গ্রামের সঙ্গে বিভেদের এমনকি বিবাদের ক্ষেত্রও রচিত হয়েছে এই সূত্রে। মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকা নাগরিকের স্ব-পরিচালনা এবং আত্মজ্ঞান নাগরিকত্বের এক নবরূপ-ও নির্মাণ করেছে প্রকারান্তরে।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জল সরবরাহ প্রকল্প কিছু নতুন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এতদিন দামোদর নদীর জল বাঁকার মাধ্যমে পাঠিয়ে তাকে পরিশোধন করে শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা চলত। কিন্তু এই বছর মে মাসে বর্ধমান শহরবাসী তীব্র জলকষ্টের সম্মুক্ষীন হন। দেখা যাচ্ছে বাঁকা নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস অবধি খুব শীর্ণ ধারায় জল প্রবাহিত হচ্ছে; মে মাসে এই জল প্রবাহ আরও কমে যাচ্ছে। বাঁকায় জল প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে জুজুটি গ্রামে দামোদর এবং বাঁকার মধ্যে যে জলের লকগেট আছে (এই লকগেটের মাধ্যমে এই অঞ্চল থেকে দামোদর নদের জল বাঁকা নদীতে সরবরাহ করা হোত) সেই অঞ্চলের আর একটু আগে বাঁকার পশ্চিম পাড়ের গ্রামগুলি বাঁকায় আরেকটি বাঁধ দিয়েছে। ফলে জলপ্রবাহ এত কমে গিয়েছে। এমতাবস্থায় কমিশনাররা খুব বুদ্ধি করে সঞ্চিত জল থেকে জল সরবরাহের সময় কমিয়ে শহরে জলের জোগান বজায় রাখেন। ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপিল করা হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঐ গ্রামের বাঁধগুলি ভাঙার নির্দেশ দেন। এতে বাঁকায় জলপ্রবাহের কিছুটা উন্নতি হয়। তবে এই ঘটনা থেকে এই বিষয়টি খুব পরিষ্কার যে, খরার মরশুমে দামোদরের জল থেকে জল সরবরাহ প্রকল্প চালানো খুব অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের এই জলসংকট আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী করে আমাদের। বর্ধমান শহরের সীমানায় প্রায় গায়ে লেগে থাকা গ্রামগুলির স্বার্থের সংঘাত। পরিষেবা ব্যাহত হলে শুরু হয়ে যায় শহর ও গ্রামের সংঘাত। সুতরাং, উনিশ শতক এবং বিশ শতকের শুরুতে গ্রাম নিয়ে যতই তাত্ত্বিক আবেগপ্রবণতা থাক, বাস্তবটা অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা। সুতরাং এই সংকট থেকে উদ্ভূত সংঘাতের মাধ্যমে, মিউনিসিপ্যালিটির নাগরিকদের স্ব-পরিচালনা এবং আত্মজ্ঞান-এর ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করা যায়। মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক এক নতুন ধরনের নাগরিকত্বের সূচনাকেও নির্ধারিত করতে পারি; যাকে 'পৌর নাগরিকত্ব' বলাই যায়। সুতরাং স্ব-পরিচালনা এবং আত্মজ্ঞান ব্যক্তির একাধিক আত্মপরিচয়ের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছিল প্রকারান্তরে।

তৃতীয় অধ্যায়

দক্ষিণবঙ্গের ছোটো শহরের নাগরিকতা ও মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ: কলকাতার প্রতিতুলনায় বর্ধমান ও বহরমপুর

বর্ধমানে আর যা-ই হোক জলের অভাব হওয়ার কথা নয়। প্রত্যেকটা বসতি-ই প্রায় চেনানো যায় কোনও না কোনও পুকুরের নামে। এ ছাড়া রাজাদের তৈরি সায়রগুলো তো আছেই। সময়টা গত শতকের নয়ের দশক। একটি পরিবার হঠাৎ করে প্রবল জলকষ্টের সম্মুখীন। বোরহাট-গোলপুকুর এলাকায় সুকুমার সেন রোডের একটি বাড়িতে মিউনিসিপ্যালিটি জলের সংযোগ হঠাৎ বিনা নোটিশে কেটে দেওয়া হল। অভিযোগ, ওই বাড়িটিতে মিউনিসিপ্যালিটি জলের কলের উচ্চতা রাস্তার পাইপের সমান স্তরে। আর সেই জন্য খানিক দূরের অন্য একটি বাড়িতে ঠিক মতো জল পৌঁছোচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, বর্ধমান মহারাজা তাঁর কোনও এক আত্মীয়কে জমিটি দান করেন। পরে ওই আত্মীয় জমিটি বিভিন্ন প্লটে ভাগ করে বিক্রি করেন ১৯৭০-এর দশকে। এই জায়গাটির বিন্যাসও একটু অদ্ভুত। যেহেতু রাজার খাসতালুক, তাই ইচ্ছে মতো জমি দান করেছেন আত্মীয়কে, আর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে। ফলত সুকুমার সেন রোড ধরে ব্যক্তিগত বসতি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনের মিলিয়ে-মিশিয়ে অবস্থান। ওই অঞ্চলে ওই বাড়িটির সুবাদেই মিউনিসিপ্যালিটির জলের সংযোগের সূত্রপাত তখনকার জল সরবরাহের নিয়ম মেনে।

ইতিমধ্যে কুড়ি বছরে মিউনিসিপালিটির নিয়মকানুন অনেক বদলেছে, তার প্রভাবেই এই জলের লাইন বিচ্ছিন্ন করার ঘটনা, টানা সাতদিন জল নিয়ে টানাপোড়েন। বাড়িটিতে একটিমাত্র প্রায় অব্যবহৃত টিউবওয়েল, যা থেকে প্রতিদিনের জল সংকুলান হওয়া বেশ কঠিন। টিউবওয়েল পাম্প করার অভ্যেস প্রায় চলে গিয়েছে বাড়ির সদস্যদের। উপরন্তু, টিউবওয়েলের

জলের স্বাদ আর গন্ধ মোটেই ভালো লাগছে না। আশপাশের পুকুরগুলির জল ব্যবহারের কথা পরিবারটি ভাবতেই পারছে না; কারণ পুকুরগুলিতে এসে পড়ছে চারপাশের বাড়ির ড্রেনের জল।

ঔপনিবেশিকদের মিউনিসিপ্যালিটি পত্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য বজায় রাখার তাগিদে পরিষেবার মাধ্যমে কিছু পৌর নাগরিক অভ্যেস তৈরি করা। আর শহরবাসীও শতাধিক কালের অভ্যেসে এই নাগরিক পরিষেবা আর স্বাস্থ্য সচেতনতার মিউনিসিপ্যালিটিয় প্রয়াসের সঙ্গে মানসিক ভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই পুকুরের জল কোনও ভাবে খাওয়ার জল হিসেবে ব্যবহার করা স্বপ্নাতীত। এরপর আসছে রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির জলের কল থেকে জল ব্যবহারের প্রসঙ্গ। সেখানে আবার অন্য সমস্যা। রাস্তার কল থেকে যে শ্রেণির মানুষ জল নেন, তাঁদের সঙ্গে লাইন দিয়ে জল নিতে দীর্ঘদিন বাড়িতে মিউনিসিপ্যালিটির জলে অভ্যস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারটি বেশ মানসিক অস্বস্তি ভোগ করছে। আসলে, তাঁরা নিজেরাই এতদিন মফস্বলের রাস্তায় জলের কলের লাইনে আগে জল নেওয়া এবং বেশি সময় ধরে জল নেওয়ার ঝগড়ার পরিচিত দৃশ্যকে মনে মনে বেশ নিন্দা করে এসেছেন ‘uncivic’ বলে। সেই সঙ্গে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্রেণিগতভাবে নিজেকে আলাদা ভেবে মনে মনে স্বস্তি পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা বা দরিদ্র-প্রেমী ডাক্তারির সুবাদে বর্ধমান শহরে শিক্ষিত-ভদ্র হিসেবে পরিচিত পরিবারটি তাই সত্যিই ১৯৯০-এর দশকে জল নিয়ে বেশ সংকটে পড়েছিল।

এই জল সংকটের কারণ অবশ্য জলের অভাব নয়; বরং দীর্ঘদিনের মিউনিসিপ্যালিটি পরিষেবার অভ্যেস। জলের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্ব, কীভাবে বিশেষ ধরনের পৌর নাগরিকতা গঠন প্রক্রিয়ার অন্যতম

মাধ্যম হয়ে উঠল, সেটাই আমরা দেখার চেষ্টা করব এই অধ্যায়ে। বোঝার চেষ্টা করব, ছোট শহরে নাগরিকতা গঠনে মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ কী ধরনের ভূমিকা পালন করল।

জলের এই নতুন অভ্যেস ও 'মিউনিসিপ্যাল টাউন'

জলের এই নতুন অভ্যেস 'জেলা সদর' থেকে 'মিউনিসিপ্যাল টাউন' হয়ে ওঠার পথে নিঃসন্দেহে একটা বড় পদক্ষেপ। আগের 'জেলা সদর', মিউনিসিপ্যালিটির এই পরিষেবাগুলির মাধ্যমে নিছক শাসন-তান্ত্রিক একক থেকে 'মিউনিসিপ্যাল টাউন'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে শহর চালানোয় শহরবাসীরা অংশগ্রহণ করেন। মিউনিসিপ্যালিটির কিছু নতুন পৌর অভ্যাসেও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে শহরবাসী। এর ফলেই জন্ম নেয় নিজেদের শহর সম্পর্কে এক নতুন ধরনের সচেতনতা। এই সব কিছু জড়িয়ে যায় ছোট শহরগুলোর নাগরিকতায়। এই ছোট শহরগুলোর সঙ্গে গ্রামের সীমানা প্রায় গায়ে লাগা দূরত্বে। এই পরিষেবার মাধ্যমে গড়ে ওঠা নাগরিকতা শহরবাসীকে গ্রাম থেকেও আলাদা করেছে। তাই পরিষেবার এক্তিয়ার ঠিক করার জন্য বারবারই মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

ইতিমধ্যে শহরের জল সরবরাহের ব্যবস্থার সূচনায়, এই ব্যবস্থা কী রকম হবে , তা নিয়ে ব্রিটিশ আধিকারিকদের মধ্যে শুরু হয় বিস্তর মতভেদ। শহরের বাসিন্দারাও নানারকমের মতামত জানান। জলের করের হার কী ভাবে বিন্যাস করা হবে, সেই নিয়েও নানা জল্পনা শুরু হয়। মিউনিসিপ্যালিটি যে জল সরবরাহ করছে, তা ব্যবহার করলে জাতপাতের শুদ্ধতা বজায় থাকবে কি না, সে নিয়ে বেশ বিতর্ক শুরু হয় শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে। এর ফলে সরকারি মহলও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই সব প্রারম্ভিক প্রতিকূলতা পেরিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কলের জলে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে শুরু হয় শহরবাসীর পৌর নাগরিক জীবনের এক নতুন পর্ব। সর্বোপরি মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য রক্ষার বিধান একবার মাথায় ঢুকে যাওয়ার পরে জল নিয়ে

নিজেদের কিছু অভ্যেস (যেমন: মিউনিসিপ্যালিটির কলে জল আসার সময় অনুযায়ী গৃহস্থালির কাজের বিন্যাস করা, ঘরে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি) বদল করতে বাধ্য হন শহরবাসী।

ইতিমধ্যে নতুন জলের ব্যবস্থা শহরের বহিরঙ্গেও বেশ কিছু পরিবর্তনের সূচনা করল। রাস্তায় নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর জলের কল, জল সরবরাহের জন্য জলের ট্যাঙ্ক, লক গেট, জল পরিশোধনের ব্যবস্থাপনা আর মাটির তলায় জলের পাইপ ছোট শহরগুলোকে বেশ অন্যরকম রূপ দিল। মিউনিসিপ্যালিটি এই জলের পরিষেবাকে পণ্য বানিয়ে শহরবাসীর কাছ থেকে বৈধ কর্তৃত্বের সঙ্গে কর আদায় করতে থাকল। সুতরাং শহুরে পরিষেবার বিনিময়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে কর দেওয়া ছোটো শহরগুলোর পৌর নাগরিকতা গঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শর্ত হয়ে দাঁড়াল। যেটা হয়তো ছোট শহরগুলোর 'জেলা সদর' থেকে 'মিউনিসিপ্যাল টাউন' হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটা বড় পদক্ষেপ।

শুধু মিউনিসিপ্যালিটির জলের পরিষেবা আর তার সঙ্গে শহরের জনতার মানিয়ে নেওয়া; শুধু এইটুকু বললেই ' পৌর নাগরিকতা' গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয় না। বিষয়টি খুবই জটিল এবং প্রতিনিয়ত এই প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে।

গণতন্ত্রে জলের 'Pressure' ও রাজনৈতিক বাস্তবতার বিশেষ দ্যোতনা

নিখিল আনন্দ মুম্বই শহরের মিউনিসিপ্যালিটির জলের পরিষেবা বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে খতিয়ে দেখেছেন (যদিও বহু পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষিতে)। তাঁর বক্তব্য আলোচনা করলে এর গভীরতা সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারি। নিখিল আনন্দ দেখানোর চেষ্টা করেছেন, জল সরবরাহের ধরন মুম্বই শহরে নাগরিকতা গঠন ও নাগরিকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্ক যুক্ত। মিউনিসিপ্যালিটি কীভাবে এই জটিল বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে সেটাই বিভিন্ন ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন নিখিল। জল সরবরাহ সংক্রান্ত

বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে সেখানে যুক্ত হয়েছে আরও অন্যান্য বহু অন্তরালবর্তী, অজানা বিষয়। কখনও রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্ন, কখনও বা জনবিন্যাসের নাগরিক বৈধতার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। যদিও এই জাতীয় সমস্যাগুলি উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতের। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঔপনিবেশিকদের হাত ধরে মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে শহরগুলিতে পত্তন হওয়া জল সরবরাহের প্রকল্পের নিজস্ব কিছু ইতিবৃত্ত ছিল। তাই পরিষেবার সার্বিক ঐতিহাসিক রূপ এবং তার বিবর্তন সম্পর্কে জানতে গেলে আজকে মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ এবং সেই সংক্রান্ত সমস্যাগুলির ধরনও আমাদের এই প্রসঙ্গে বুঝে নেওয়া দরকার। তাহলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে শুরু হওয়া জল সরবরাহের প্রকল্প নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা বোঝা একটু সহজ হবে।

নিখিল আনন্দ তাঁর *'Municipal Disconnect: On abject water and its urban infrastructures'*[১] (২০১৫) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, কীভাবে মুম্বাই-এর প্রেমনগর অঞ্চলের মুসলমান বাসিন্দারা বোম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অবহেলার স্বীকার। শহরের নাগরিক হিসাবে এঁদের অস্বীকার করার জন্য মিউনিসিপ্যাল পরিষেবাগুলি দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এখানে চল্লিশ বছর আগে জলের পাইপ বসানো হয়েছিল; সেগুলি কালক্রমে মরচে লেগে, জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে জল সরবরাহের অযোগ্য। এখানকার অধিবাসীরা বারবার 'আধুনিক, পরিশোধিত' মিউনিসিপ্যালিটির জলের দাবি জানিয়ে এসেছে। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। এম.এল.এ বা এম. পি-রা বারবার বলে আসছেন এখানে জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করা বা পরিশোধিত জল সরবরাহ করা ঠিক তাঁদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। এটা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ। বরং তাঁরা ভোটের আগে কিছু জলের কুয়ো তৈরি করে দিয়েছেন, যেগুলি কালক্রমে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে; নয়ত এগুলির নিয়ন্ত্রক হয়ে

[1] Nikhil Anand, *Municipal Disconnect: On abject water and its urban infrastructures*, Ethnography 13(4) 467-509, 2012,p-487

উঠেছে কিছু স্থানীয় মাফিয়া। অন্য দিকে, মিউনিসিপালিটির কাছে এখানকার অধিবাসীরা জল সরবরাহের দাবি নিয়ে গেলে তারা বলছে আগে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জলের কর মেটানো হোক, তারপরে নতুন ব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে। যে জলের পরিষেবা তাঁরা পানইনি তার বিল মেটানো খুব সঙ্গত কারণেই প্রেমনগরের বাসিন্দারা মেনে নিতে পারছেন না। মিউনিসিপ্যালিটি প্রথমেই এঁদেরকে 'ভোক্তা' হিসেবে দেখছে। 'নাগরিক' হিসেবে নয়।[2] মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রেমনগরের বাসিন্দারাও এখানকার জলের সমস্যা নিয়ে বেশ বিরক্ত। তাঁরা বলছেন এই ঘিঞ্জি জায়গায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা বেশ কঠিন। তাছাড়া এখানকার লোকজন বেশ খারাপ। এঁরা মুসলিম। বস্তিবাসী। মহারাষ্ট্রের লোকও নন। উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন। গঙ্গা-যমুনার জল ব্যবহারে এঁরা অভ্যস্ত। তাই জলের চাহিদা এঁদের কোনও দিনই মিটবে না। এই সব সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুটছেন কিছু প্লাম্বার। তাঁরা বিভিন্ন অনৈতিক উপায়ে প্রেমনগরে জলের জোগান দিয়ে চলেছেন। এঁরা প্রেমনগরেরই অধিবাসী এবং মিউনিসিপ্যালিটির আধিকারিকদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সরাসরি সংযোগের পথে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করছেন। সুতরাং, মিউনিসিপ্যালিটি জলের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে তার নাগরিকদের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিচার করছেন। ধর্ম, সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণি বিন্যাস, আঞ্চলিক পরিচয় ইত্যাদি। নিখিল আনন্দ এখান থেকেই দেখিয়েছেন, মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহের পরিকাঠামো এবং পরিষেবা বিত্তশালী 'সিভিল সোস্যাইটি'-র কথা মাথায় রেখেই নির্মিত। সেখানে বৃহত্তর 'পলিটিকাল সোস্যাইটি'-র দাবি (প্রেমনগরের অধিবাসীবৃন্দ যার অন্তর্ভুক্ত) নেহাতই প্রান্তিক।[3]

শুরুতে বর্ধমান শহরের মিউনিসিপ্যালিটির জলের লাইন বিচ্ছেদের যে ঘটনাটির কথা বললাম, বা নিখিল আনন্দ যে ভাবে মুম্বাই শহরের জলের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন সেগুলি

[2] Ibid, page-505

[3] Ibid, page-495

কোনওটাই খুব বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং, ঔপনিবেশিক আমলের সেই জলের কলের লাইনের মতোই ঠিক পরস্পর সংযুক্ত। মিউনিসিপ্যালিটির জল ঠিক মতো না পাওয়া নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা। কিন্তু জলের মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস; মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে তার যোগানে অভ্যস্ত হওয়ারও একটা ইতিহাস আছে। সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'পরিষেবার' সঙ্গে 'নাগরিকতার' যোগসাজশে ছোটো নগরের নাগরিকতা তৈরি হওয়ায় প্রক্রিয়া। আবার সমস্ত মিউনিসিপ্যাল টাউনের এই জল সরবরাহের প্রক্রিয়াও ঠিক একরকম নয়। এই জলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু প্রশ্ন—জাতপাতের প্রশ্ন, স্বাস্থ্যের প্রশ্ন, অভ্যেসের প্রশ্ন, পরিবেশের প্রশ্ন। আর একটা কথা না বললেই নয়-- জলের পরিষেবা বাবদ মিউনিসিপ্যালিটিকে কর দেওয়ার প্রশ্ন। কলকাতা শহরেই জল সরবরাহের প্রথম সূত্রপাত। এরপরে আস্তে আস্তে অন্য মিউনিসিপ্যাল টাউনগুলিতে জল সরবরাহের প্রকল্প নেওয়া হয়। আর সমস্ত ক্ষেত্রে মোটেই কলকাতা মডেল অনুসরণ করা হয় না। অঞ্চল ভেদে ভৌগোলিক বিভিন্নতা এবং সরকারি বিচারে শহরটির গুরুত্বের সাপেক্ষে জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের অর্থ মঞ্জুর, এক এক জায়গায় জল সরবরাহ প্রকল্পের এক এক রকম রূপ দিয়েছে। অঞ্চল ভেদে নতুন জল সরবরাহ প্রকল্পের সঙ্গে প্রতিরোধ বা মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াও ঠিক একরকম নয়। সেই কারণেই বোধহয় 'ছোটো নগরের নাগরিকতা' তৈরির প্রক্রিয়াও এত জটিল।

কলকাতা শহর: সর্বপ্রথম কলের জল

ঔপনিবেশিক কলকাতায় জল সরবরাহ প্রকল্প চালু হয়েছে সবচেয়ে আগে। তাই মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ প্রকল্প আলোচনা করতে গেলে খুব স্বাভাবিক ভাবে কলকাতার প্রসঙ্গ চলেই আসবে। এই অধ্যায়ে কলকাতা, বর্ধমান আর বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহের প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করব। কলকাতার সাপেক্ষে বাংলার অন্যান্য ছোট শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প আলোচনা করলে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার এক কোলাজ আমরা

পাব। দেখব, কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এক ছক মেনে একই মডেলে এটি নির্মিত নয়। বরং বিভিন্নতাই বেশি।

উনিশ শতক থেকেই কলকাতার পরিকাঠামোগত উন্নতির সূত্রপাত। এরপর বিশ শতকে ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের হাত ধরে আরও উন্নতি। ভালো রাস্তা, আবর্জনা ফেলার জায়গা, গ্যাস লাইট, জল সরবরাহ ইত্যাদি পরিষেবা চালু হয় কলকাতায়। Chris Otter(ক্রিস অটার) দেখিয়েছেন, পরিকাঠামোর কার্যকারিতা শহরের বাসিন্দাদের 'সাবজেক্ট' হিসেবে গড়ে তোলার 'প্রাকৃতিক প্রযুক্তি' হিসেবে কাজ করে। শহরের সমস্ত বাড়িতে জল সরবরাহ তাই 'হাইজিনিক সেলফ' গঠন করার অন্যতম প্রাকৃতিক ভিত্তি হয়ে ওঠে।[4]

ব্রিটিশদের জল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত খুব স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতা শহরে। প্রথম পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের সঙ্গে দেশীয় নাগরিকদের পরিচয় ঘটে কলকাতা শহরে। জলকে ঘিরে বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতির প্রভাব কাটিয়ে শহরবাসীকে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহে অভ্যস্ত করাতে বেশ প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয় কলকাতার জল সরবরাহ প্রকল্পের সূচনায়।

শহরবাসীর সামাজিক অবস্থা উন্নতির উদারনৈতিক দাবি এবং বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের মোকাবিলা করার জন্য জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর প্রচেষ্টার লক্ষ্যে শহরবাসীর কিছু আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে ব্রিটিশরা মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনের একটা নৈতিক ভিত্তি খাড়া করে। অন্য দিকে, ব্রিটেন থেকে উপনিবেশে সরকারি আধিকারিকদের উপর দেশীয় শহরগুলিকে মেট্রোপলিসের মতো নান্দনিক সৌষ্ঠব দেওয়ার

[4] Chris Otter, Making Liberalism Durable: Vision and civility in the late Victorian city, Social History, 27 no.1(2002) 1-15 page-7

চাপ আসতে থাকে।[5] এর সূত্র ধরেই জল সরবরাহ, ড্রেন ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, রাস্তার গ্যাস লাইট ইত্যাদি বিষয়গুলি শহর পরিচালনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কৌস্তুভমণি সেনগুপ্ত তাঁর *"Planned Spaces And Intimate Places: Ordering A City And Creating A Neighbourhood In Colonial Calcutta"* গবেষণায় দেখিয়েছেন কলকাতাকে নান্দনিক সৌষ্ঠব দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে এই শহরের পরিসরকে (Space) পুনর্নির্মাণ করার ঔপনিবেশিক প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৌস্তুভ দেখিয়েছেন অঞ্চলভিত্তিক নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠা, বিভিন্ন প্রকল্পর বাস্তব রূপায়ণে ইঞ্জিনিয়ারদের মতবিরোধ, প্রকল্প পিছু ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে ঔপনিবেশিকদের টালবাহানা, সর্বোপরি দেশীয় নাগরিকদের বিভিন্ন ওজরে কর দিতে অসম্মতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়। । বর্তমান গবেষণার দাবি, কৌস্তুভমণির থেকে একটু আলাদা। মিউনিসিপ্যালিটির নতুন প্রকল্পগুলির পরিষেবার মাধ্যমে কীভাবে এক নতুন নাগরিক সচেতনতা তৈরি হল তা দেখানোর চেষ্টা করা হবে এই গবেষণায়। একে আমরা পৌর নাগরিকতা বলে চিহ্নিত করব। ঔপনিবেশিকদের তরফে বলা হল জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং শহরবাসীকে শহর পরিচালনায় অংশগ্রহণ করানো মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য এক হলেও ভৌগোলিক বিভিন্নতা এবং গুরুত্বের নিরিখে শহরগুলির মধ্যে আর্থিক অনুদানের তরিতফাত কীভাবে প্রকল্প রূপায়ণ এবং পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়ায় বিস্তর পার্থক্য রচনা করল সার্বিক ভাবে তাও বোঝার চেষ্টা করা হবে।

আপাতত এই অধ্যায়ে জল সরবরাহ প্রকল্প নিয়েই আলোচনা। প্রথমে কলকাতা শহরের জল সরবরাহ দিয়ে আলোচনা শুরু করব।

---

[5] Kaustuvmani Sengupta, Planned spaces and intimate places: ordering a city and creating a neighbourhood in colonial Calcutta, page-168

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে F.W.Simm(এফ.ডাব্লু.সিম) কলকাতায় পরিষ্কার জল সরবরাহের একটি প্রস্তাব পেশ করেন। অপরিষ্কার জল ব্যবহারের সঙ্গে কলেরার মতো মহামারীর সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত। তাই পরিষ্কার জল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। তিনি বলেন, কলকাতায় বহু পুকুর আছে। এখানকার অধিবাসীরা এই পুকুরের জলেই স্নান করেন, বাসন মাজেন, কাপড় কাচেন, আবার এই জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহার করেন। এই অভ্যেস জনস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এছাড়া ভিস্তিদের মাধ্যমে খুব কম সংখ্যক নাগরিক নিজেদের বাড়িতে জলের যোগানের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। সিম কলকাতায় জল সরবরাহের একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন পলতায় গঙ্গা নদীর জল পরিশোধন করে দু'টি রিজার্ভারে জমা রাখা হবে। সেখান থেকে পাম্পের মাধ্যমে খুব বেশি প্রেসার দিয়ে শহরে জল সরবরাহ করা হবে। প্রতি বাড়িতে বাথরুম সংলগ্ন সিস্টার্ন থাকবে যেখান থেকে প্রয়োজন মতো স্নান, রান্না এবং পানীয় জলের সরবরাহ পাওয়া যাবে।[6]

এরপরে তিনি জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণ বাবদ খরচ-খরচা তোলার জটিলতার কথা বলেছেন। ইংল্যান্ডের মতো জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত গৃহকর ধার্য করা হলে কলকাতার নেটিভরা তা দেবে না। এছাড়া এখানকার ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা সম্পর্ক, ভাড়াটেদের স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান এই অতিরিক্ত কর দেওয়ার বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলবে-- এরকম সন্দেহ সিমের মনেও দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে সিম একটি উপায় বাতলেছেন। তিনি বলেছেন, জল সরবরাহ নির্মাণ প্রকল্প বাবদ প্রাথমিক খরচ, যে কোম্পানি এই নির্মাণ প্রকল্পের বরাত পাবেন তাকেই বহন করতে হবে। অতিরিক্ত গৃহকরের মাধ্যমে নেটিভদের থেকে এই খরচ আদায় না করে বরং জলকর-ই একটু বর্ধিত হারে ধার্য করলে অনেক জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে।[7]

---

[6] F.W. Simms, *Report on the Establishment of Water-Works to Supply the City of Calcutta,* Calcutta, Military Orphan Press, 1853, p. 9.

[7] Ibid,p-13

নেটিভদের মানসিক ভাবে লোহার পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এই প্রকল্পের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। জল নিয়ে ভারতবাসীর বিবিধ ছুঁতমার্গের সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে সেই নিয়ে সিম সাহেব বেশ চিন্তিতই ছিলেন। তবে সব কিছুর ওপর একটা ভরসার জায়গা গঙ্গা জলের পবিত্রতার ধারণা। গঙ্গা জলকে হিন্দুরা এতটাই পবিত্র মনে করে যে তাদের বিশ্বাস এই জলের সংস্পর্শে যা কিছু থাকবে সব পবিত্র হয়ে উঠবে। অবশ্য পাইপের সংযোগস্থলকে পিচ্ছিল রাখতে যে গ্রিস ব্যবহার করা হয় তা নিষিদ্ধ পশুর চর্বি থেকে তৈরি, এই নিয়েও একটা আলোড়ন তৈরি হতে পারে বলে তিনি বেশ চিন্তিত ছিলেন। তবে এই জল সরবরাহের প্রকল্পে যদি বর্ণ হিন্দুদের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করা যায়, তাহলে হয়তো জল প্রকল্পটির বৈধতা পেতে আরও সুবিধা হবে বলে তিনি আশা করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও হিন্দুদের একটা অংশ এই প্রকল্প শাস্ত্রসম্মত নয় বা ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত জলপ্রকল্প সম্পর্কে শাস্ত্রবিধান নেই বলে এই জল ব্যবহার করবে না এই বিষয়ে সিম সাহেব নিশ্চিত ছিলেন। তবে কালক্রমে বিনা ঝক্কি-ঝামেলায় একেবারে বাড়ির ভেতর গঙ্গা জলের সরবরাহের মতো লোভনীয় ব্যবস্থার বৈধতা পেতে বেশি দিন লাগবে না এই রকম একটা ভাবনাও তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল। তাই কলকাতায় জল সরবরাহ প্রকল্প চালু করতে কোনও বাস্তব সমস্যা নেই বললেই চলে। এমন মতামত দিয়েছেন সিম সাহেব তাঁর রিপোর্টে।[8]

সিম সাহেবের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। সরকার তখন ছেষট্টি লক্ষ টাকা খরচ করে কলকাতায় জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণ যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। তবে সিমের রিপোর্ট পুরোপুরি দূরে সরিয়ে রাখার মতোও ছিল না। আবার ১৮৬৫ সাল নাগাদ কলকাতায় জল সরবরাহের বিষয়ে কথাবার্তা শুরু হল। প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন Mr.Clerk(মিঃ ক্লার্ক্)। কলকাতার জাস্টিসের অধীনে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সিমের রিপোর্টের একটি পরিমার্জিত সংস্করণ পেশ করেন। এই মর্মে ওয়াটার সাপ্লাই কমিটি সরকারকে চাপ দিতে

[8] Ibid,p-26

থাকে। কমিটি দাবি করে কলকাতার জাস্টিসের তত্ত্বাবধানে কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে কলকাতায় জল সরবরাহ প্রকল্পের বরাত দেওয়া হোক। আপাতত লোনের মাধ্যমেই জল সরবরাহ প্রকল্পের টাকা জোগাড় করা হোক, তারপর প্রকল্প চালু হয়ে গেলে জলের ওপর কর চাপিয়ে সেই লোনের টাকা মেটানো হবে। গভর্নমেন্ট ফলতা, টালা আর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমি কিনলে এই জল সরবরাহ প্রকল্পকেন্দ্রগুলি স্থাপন করা যাবে।

ওয়াটার সাপ্লাই কমিটি তার রিপোর্টের তীব্র বিরোধিতা করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। বাবু জিতেন্দ্র মোহন ঠাকুর সেক্রেটারি অফ বেঙ্গলকে একটি চিঠির মাধ্যমে জানান, এই মুহূর্তে ছেষট্টি লক্ষ টাকা লোনের বোঝা বহন করার মতো ক্ষমতা মিউনিসিপ্যালিটির নেই। ড্রেন ব্যবস্থার নির্মাণ এখনও অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির করের বোঝা এমনিতেই যথেষ্ট বেশি। এই বোঝা সামলে আবার শহরবাসী জলের জন্য অতিরিক্ত কর মেনে নেবে কি না, তাও যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বরং কলকাতা শহরে জল সরবরাহ করার আরেকটি অন্যরকমের প্রস্তাব দেন। তারা বলেন, শহরে কয়েকটি বেশ বড় আকারের জলাশয় খনন করা গেলে জল সরবরাহের বিষয়টি অনেক সহজ হবে। এতে জল সরবরাহের খরচ অনেক কমে যাবে। এছাড়া শহরের মাঝখানে আলো- বাতাস খেলার মতো ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে এই পুকুরগুলিকে নদীর জলের মাধ্যমে ভরে রাখতে হবে। পরবর্তী তিন-চারমাস এই জল-ই সারা শহরের জলের জোগান দেবে। এই সময় নদীর জল ঠিক ব্যবহারের উপযোগী থাকে না। ফলে এই ব্যবস্থা খুব কাজে আসবে । আবার বর্ষাকালে এই পুকুরগুলি নদীর জলে ভরে রাখলে পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করা যাবে। এরপরে কখনও খরচে কুলোনো গেলে পুকুরগুলিকে পরিশোধিত জলের রক্ষণাগারে পরিণত করা যাবে। এই জল সরবরাহ ব্যবস্থায় হিন্দুদের কোনও ধর্মীয় আপত্তিও থাকবে না। এছাড়া জল ব্যবহারের

ক্ষেত্রে কিছু অভ্যাসেরও ব্যাপার থাকে। হিন্দু বা ইউরোপীয় উভয়ই যে পুকুরের জল ব্যবহার করে অভ্যস্ত, সেই পুকুরের জল ব্যবহার করতেই আশ্বস্ত হবে। ফলে সব মিলিয়ে এটি একটি সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থা হবে।

জাস্টিস যদিও মি. ক্লার্কের পরিকল্পনাকেই বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে এটাও জানতেন যে গভর্নর জেনারেলকে এই প্রকল্পে রাজি করাতে গেলে, প্রথমেই দেখাতে হবে এটা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক। এই মর্মে জাস্টিস চিন্তাভাবনাও শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি করে গভর্নর জেনারেলকে বোঝালেন এই জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভিস্তিবাহিত জল সরবরাহ ব্যবস্থার থেকে বেশি লাভজনক। জাস্টিস বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনাটি রূপায়ণে ছোটোখাটো সমস্যা এবং তার প্রতিবিধানের কথাও গভর্নর জেনারেলকে বোঝাতে ভোলেননি। যেমন, জলের স্ট্যান্ড পাইপ লাগানোর প্রাথমিক খরচ দরিদ্র মানুষদের ওপর একটু চাপ সৃষ্টি করবে ঠিকই; কিন্তু এই খরচ সারা বছর ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে নিলে সমস্যা হবে না। অন্যদিকে, ভাড়াটেদের থেকে জলের পাইপ লাগানোর খরচ বা জলকর আদায়ের দায়িত্ব বাড়িওয়ালার ওপর ছাড়লে এই সমস্যার সমাধান হবে।

এছাড়া হিন্দুদের ধর্মীয় ছুঁতমার্গের কথা মাথায় রেখে চেয়ারম্যানের মেমোরান্ডামে বলা হয়েছিল, ৫০০ কিউবিক ফিট মাপের জলাধারে জল রাখা হবে। এই জলাধার থেকে প্রতি বাড়িতে স্ট্যান্ড পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হবে। এতো বড় আয়তনে জল রাখা হলে উৎস যাই হোক না কেন, হিন্দুরা তাকে পবিত্র বলেই গণ্য করবেন। আরেকটা খুব বড় আপত্তি উঠেছিল, অর্ধসমাপ্ত এবং বহু ব্যয় সাপেক্ষ ড্রেন নির্মাণ সম্পূর্ণ না করে আরেকটি নতুন প্রকল্প শুরু করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হবে, তা নিয়ে! এক্ষেত্রে অবশ্য জাস্টিস বলেন, ড্রেন নির্মাণের সঙ্গে জল সরবরাহ প্রকল্পের কোনও সংযোগ নেই। আর তাছাড়া ড্রেন পরিষ্কার করার জন্য প্রচণ্ড বেগে

জলের সরবরাহ প্রয়োজন। এর জন্য কলের জলই উপযুক্ত। এখানে জল সরবরাহের দায়িত্ব কোনও বেসরকারি সংস্থাকে না দিয়ে সরকারকেই নিতে বলা হয়েছিল।

লেফট্যনেন্ট গভর্নর এই সব যুক্তিতে জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা বোঝেন। ড্রেন ব্যবস্থা পরিষ্কার রাখার জন্যও কলের জল কেন দরকার সেই বিষয়েও ধোঁয়াশা থাকে না। এর জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পাম্পিং স্টেশন চালু করার অনুমতি দেন। তবে গভর্নর পুকুর থেকে জল সরবরাহের বিষয়টি একেবারে বাতিল করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেন এগুলি পরিষ্কার রাখলে, পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করলে এবং সময়মতো জল পাল্টে নিলে অনেক কম খরচে জল সরবরাহ পাওয়া যাবে। আর তাছাড়া যেসব পুকুর কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সেগুলিও যদি সরকারি খরচেই রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে যায়, তাহলে পুকুরের মালিকও খুশি হবেন। সেই পুকুর জনসাধারণকে ব্যবহার করতে দেবেন।[9]

জল সরবরাহ প্রকল্পের পরিকল্পনা বেশ অনেকবার রদবদল করা হয়। প্রথমে বলা হয়েছিল উত্তর কলকাতার জল সরবরাহ ফলতা থেকে এবং দক্ষিণ কলকাতার জল সরবরাহ ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে করা হবে। কিন্তু পরে এই পরিকল্পনা বদলানো হয়। ঠিক হয় যে ফলতার পাম্পিং স্টেশন থেকেই ইটের অ্যাকুয়াডাক্ট-এর মাধ্যমে টালাতে জল পাঠানো হবে। সেখান থেকে দক্ষিণ কলকাতায় জল সরবরাহ করা হবে। কিন্তু পরে ইটের অ্যাকুয়াডাক্ট বদলে লোহার পাইপের মাধ্যমেই জল সরবরাহ করা হয়। আর্মি স্যানিটারি কমিশন অবশ্য এই নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এই কমিশনের তরফে বলা হয় যে, লোহার পাইপের বদলে ইটের অ্যাকুয়াডাক্ট-এর খরচ অনেক কম হত। কিন্তু এই বিষয়ে জাস্টিসের যুক্তি ছিল, ইটের অ্যাকুয়াডাক্ট পরবর্তীকালের বর্ধিত জলের চাহিদা অনুসারে জল বহন করতে পারবে না। লোহার পাইপ হলে এই বিষয়ে অসুবিধা হবে না। এভাবে কলকাতায় পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ অনিবার্য

[9] Kaustuvmani Sengupta, page-203

হয়ে গেল। জাস্টিস লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে বলে জলসরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি এবং পাইপ ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করতে হবে সেগুলির ওপর কর ছাড়ের বন্দোবস্ত করে দিলেন। মেসার্স ব্র্যাসি অ্যান্ড কোম্পানি কাজের বরাত পেল। কলকাতায় জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণ ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পুরোপুরি শেষ হল। ১৮৭০ থেকেই দিনে তিন মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ শুরু হয়েছিল। ১৮৭১-এ তা হল চার মিলিয়ন গ্যালন। ১৮৭৬ নাগাদ তা বেড়ে হল সাড়ে ছয় মিলিয়ন গ্যালন মতো। এই সময়ই কলকাতায় প্রায় ৯৬৭৫ টি বাড়িতে জলের কল ছিল। আর্মি স্যানিটারি কমিশনের সরকারি নথি বলছে এর থেকেই প্রমাণিত হয় "that the native population of India is prepared for the introduction of pure water and improved means of distribution whenever they may be made available."

বর্ধমান শহরের জল সরবরাহ প্রকল্পঃ জল ব্যবহারের নতুন নাগরিক অভ্যেস

আলোচনা শুরু করেছিলাম, ১৯৯০-এর দশকে বর্ধমান শহরের একটি পরিবারের জল সঙ্কটকে কেন্দ্র করে। এবার দেখা যাক এই পরিবারটি কীভাবে এই সঙ্কটের সম্মুখীন হল। বর্ধমান শহরে কীভাবে মিউনিসিপ্যালিটির জল ব্যবহারের পৌর অভ্যেস গড়ে উঠল সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখলে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাব। অবশ্য উত্তর যেমন হয়তো আমরা পাব, তেমনি সেই সঙ্গে আরও অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এই প্রশ্নগুলোর যথাযথ সদুত্তর পাওয়া সত্যি-ই কঠিন। বরং এই প্রশ্নগুলি আরও বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করবে।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির পত্তন। কলকাতার মতো বর্ধমান গঙ্গার ধারের শহর নয়। তাই জল নিয়ে ধর্মীয় ছুঁতমার্গের বিষয়টাও এখানে অন্যরকম। কলকাতার সঙ্গে এখানে জল সরবরাহ প্রকল্প চালু হওয়ার সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নয়। কলকাতায় পরিশোধিত

জলের সরবরাহ চালু হয়েছে ১৮৭৬ নাগাদ। বর্ধমানে নদীর জল সরাসরি চালু করার কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ। পরিশোধিত জল সরবরাহ চালু হয়েছে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ। কলকাতার জল সরবরাহ প্রকল্পের সঙ্গে মানসিক পরিচিতি ঘটে যাওয়াতে বা শহরে গঙ্গা জলের জোগান না থাকায় পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ নিয়ে নাগরিকদের মানসিক টানাপোড়েনের সম্মুখীন হতে হয়নি মিউনিসিপ্যালিটিকে। বরং এখানের সমস্যার ধরন একটু অন্যরকমের। বর্ধমানে জল সরবরাহ চালু করার পিছনে ব্রিটিশ তৎপরতার বিষয়টিও লক্ষ করার মতো। 'বর্ধমান জ্বর'-এর আতঙ্ক ব্রিটিশ শাসনের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল। যদি এই জ্বর শুধু নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু এই জ্বরের আগ্রাসনে ব্রিটিশরা সত্যি-ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।[10] তাই বর্ধমান শহরে জল সরবরাহ প্রকল্পের বাৎসরিক রিপোর্টের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্রিটিশদের এত মাথাব্যথা। আমরা এর পাশাপাশি বহরমপুরের জল সরবরাহ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করব, সেখানে দেখব জল সরবরাহ প্রকল্পের রিপোর্ট নিয়ম মাফিক জমা দেওয়া হলেও তার খুঁটিনাটি ততটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় না।

রাজার খাসতালুকের প্রজা, ব্রিটিশ সাবজেক্ট ও মিউনিসিপ্যালিটির নাগরিক বর্ধমানবাসীঃ

কলকাতা থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরের মফস্বল শহর বর্ধমান। দামোদর নদী প্রায় দেড় কিলোমিটারের ব্যবধান রেখে শহরের সমান্তরালে বয়ে চলেছে। বর্ষাকালে অবশ্য এই দেড় কিলোমিটারের ব্যবধান আরও কমে যায়। বর্ধমানের মহাতাব রাজাদের খাসতালুক এই শহর। তাই শহরের নাগরিক চরিত্রটাও বেশ অন্যরকম। বর্ধমানবাসী যে মহাতাব রাজাদের প্রজা, বিভিন্ন প্রথার মাধ্যমে তা বোঝাতে বেশ তৎপর, পাঞ্জাব থেকে আগত এই মহাতাব পরিবার। দোল পূর্ণিমার দিন রাজপরিবার এবং বিভিন্ন মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের দোল খেলা হয়। সেই জন্য প্রজারা দোল খেলবেন পরের দিন। আজও বর্ধমান শহরে এই প্রথা মানা হয়।

[10] অরবিন্দ সামন্ত, রোগ রোগী রাষ্ট্র, মহামারীর নির্মাণ এবং বিনির্মাণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪, পৃ-১৮

আবার এই শহরের আরেক প্রান্তে ব্রিটিশরা তাদের কোর্ট, কালেক্টরি অফিস তৈরি করেছেন বর্ধমান জেলার সদর শহরটিতে। সুতরাং বর্ধমানবাসী আবার আরেকদিকে যে 'ব্রিটিশ সাবজেক্ট'; নগর বিন্যাসে তার ছাপও বেশ প্রকট। এই দুই-এর পাশাপাশি তারা আবার পৌর নাগরিকও। অর্থাৎ তারা শহরে থাকেন, মিউনিসিপ্যালিটির কিছু পরিষেবা পান। শহরের বাসিন্দা হওয়ার কারণে তৈরি এই নাগরিকতাকেই আমরা পৌর নাগরিকতা বলছি। বিভিন্ন ভাবে মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকলাপের মাধ্যমে পৌর নাগরিকতা গঠনের প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছি। অবশ্যই পৌর নাগরিকতা একটি জটিল উভমুখী প্রক্রিয়া। মিউনিসিপ্যালিটি কিছু পরিষেবা দিল এবং পরিষেবার ভিত্তিতেই পৌর নাগরিকতা তৈরি হয়ে গেল বিষয়টি ঠিক ততটা সহজ নয়। বরং মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মের এক্তিয়ার বদল, দেশীয় প্রতিনিধির অনুপ্রবেশ, মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবাগুলিকে কেন্দ্র করে নগরবাসীর বিভিন্ন মতামত-প্রতিক্রিয়া এবং ক্রমশ এই পরিষেবাগুলিতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া---এই সবকিছু মিলেই তৈরি হয় পৌর নাগরিকতা।[11] পৌর নাগরিকতাই আবার বর্ধমানবাসীকে তার প্রান্তে মিলেমিশে থাকা গ্রামের থেকে আলাদা করেছে। এমনকি মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা কখনও সংঘাতেরও জন্ম দিয়েছে গ্রাম-শহরের মধ্যে। এমন নিদর্শনও বর্ধমান শহরে আছে। আমরা এখন বর্ধমান শহরে মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ ব্যবস্থাটি পর্যালোচনার মাধ্যমে 'পৌর নাগরিকতা' বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব।

'বর্ধমান জ্বর'-এর ভীতি ও বর্ধমান শহরে জল সরবরাহ প্রকল্প স্থাপনে ঔপনিবেশিক তৎপরতা

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট সি. টি. মেটাকাফ বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারকে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির মিটিং-এর প্রসিডিংস-সহ একটি রিপোর্ট পাঠান। এতে তিনি বলেন যে বর্ধমান শহরে জ্বর ক্রমশ মহামারীর আকার ধারণ করছে। এর মোকাবিলা

[11] JUDICIAL PROCEEDINGS, SEPTEMBER 1872, PROCEEDINGS NO.107(WBSA)

করার জন্য বর্ধমান শহরে ভালো জলের সরবরাহ করা আশু প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মর্মে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ অনুমোদন করার কথা বলেন।

এই রিপোর্টেই তিনি বর্ধমান শহরের জলের উৎসগুলির একটি বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ধমান শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে বাঁকা নালা। বর্ধমান শহরের প্রায় ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদী থেকেই এর উৎপত্তি। এটি ভাগীরথী নদীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। কিন্তু এই নালার অবস্থা খুব-ই খারাপ। বিশেষত বর্ধমানের কাছে এটি আবর্জনায় পরিপূর্ণ। এই নালা প্রাকৃতিক ড্রেন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি বাঁকা নালা দিয়ে মানুষ এবং পশুর মৃতদেহ অবধি ভেসে যেতে দেখা যায়। এছাড়া বাঁকা নালার তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষজন এখানে বর্জ্য পদার্থও ত্যাগ করেন।

অন্যদিকে, বর্ধমান শহরে প্রায় ৯১৭টি পুকুর আছে। কিছু বড় পুকুর বর্ধমান রাজারা খনন করিয়েছেন। এছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানাতেও কিছু ছোটোখাটো পুকুর আছে। এগুলি মূলত বাড়ি তৈরির মাটির প্রয়োজনে বা মাছ চাষের জন্য খনন করা হয়েছিল। বৃষ্টির জল ছাড়া এই সব পুকুরগুলিতে জল সরবরাহের অন্য ব্যবস্থা নেই। পুকুরগুলি ঠিক মতো সংস্কার করা হয় না। ছোটো পুকুরগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। বড় পুকুরগুলিও মানুষ ঠিক ভাবে ব্যবহার করে না। একই পুকুরের জলে কাপড় কাচেন, বাসন মাজেন, স্নান করেন, আবার এই জলই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করেন। পুকুর বা বাঁকা নালা উভয়ের জলই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করার অযোগ্য।

এই রিপোর্টে খুব আগ্রহ-জনক একটি প্রসঙ্গ আছে---“The process of deterioration goes on year by year, till the water which is drunk becomes most offensive to those unaccustomed to it.”

শহরবাসী যাঁরা জন্মাবধি এই সব জলই পান করে আসছেন, তাঁরা এই জলে অভ্যস্ত নন এমনটা বলা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। তাহলে খুব সহজ যুক্তিতেই বলা যায়, যাঁরা এই শহরে নবাগত তাঁরাই এই জলে অনভ্যস্ত এবং তাঁদের জল ভীতিটাই বেশি। এই সময়টাও আমাদের মনে রাখতে হবে বর্ধমান জ্বরের ভয়ে ব্রিটিশরা আচ্ছন্ন। ১৮৭০-এর দশকেই ব্যাক্টেরিওলজি এবং ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে নানা গবেষণা চলছিল ইউরোপে। টিউবারকিউলোসিস, কলেরা, অ্যানথ্রাক্স-এর জলবাহিত জীবাণুর চরিত্র নিয়ে বহু গবেষণা হচ্ছিল। সুতরাং একজন অনভ্যস্ত ব্যবহারকারী হিসেবে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শহরের জল নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

বর্ধমানের কাছাকাছি ভালো জল বলতে দামোদর নদীর জল। দামোদর নদীর প্রবাহ শহর থেকে প্রায় মাইল দেড়েক। দামোদরের জলকে কীভাবে শহরের মধ্যে সরবরাহ করা যায় সেই নিয়ে নানা কথাবার্তা শুরু হয়েছে। বাঁকা নদী শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত, সুতরাং কোনও ভাবে যদি দামোদরের জল বাঁকার মাধ্যমে পাঠানো যায় তাহলে খুব সহজেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই নিয়ে পি.ডব্লু.ডি-র সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয়। বাঁকা নালার মাধ্যমে জল পাঠাতে গেলে প্রথমেই এই নদীখাত পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া এই নদীতে মানুষের বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ বন্ধ করতে হবে। এইজন্য কম পক্ষে পাঁচটি শৌচাগার বানাতে হবে।

এরপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ বাঁকা নদীতে দামোদর নদের জল পাঠানো। বাঁকা এবং দামোদর পরস্পর সমান্তরাল ভাবে বয়ে চলেছে। বর্ধমান শহর থেকে ৮ মাইল পশ্চিমে যোজিতপুরে এই দুই নদীর অন্তর্বর্তী দূরত্ব সবচেয়ে কম। এখানে মোটামুটি ১০০ ফুট লম্বা একটি সংযোগকারী খাল খনন করলেই দামোদরের জল বাঁকায় প্রবাহিত হতে পারবে। উচ্চতার দিক থেকেও সমস্যা নেই। এখানে দামোদর নদী বাঁকার থাকে প্রায় ৬ ফুট উঁচুতে। তাই এক্ষেত্রে কোনও

কারিগরি সমস্যা হবে না। এমনটাই মত দিয়েছেন পি.ডব্লুউ.ডি-র সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং দামোদর নদের ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।

এরপর এই বাঁকা থেকে জল, শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর পালা। এই বিষয়ে রিপোর্টটিতে বিশদে কিছু বলা নেই। শুধু বলা হয়েছে, বাঁকার থেকে ৩০০ ফুট উঁচুতে ট্যাঙ্ক স্থাপন করে স্টোন পাইপের মাধ্যমে শহরে জল সরবরাহ করতে হবে।

এই রিপোর্টের বাস্তব প্রয়োগে মূলত দু'টি সমস্যা দেখা যায়। প্রথমটি খাল খনন করার জমি ক্রয় করা নিয়ে, দ্বিতীয়টি সমস্যাটি বাঁকার জল কীভাবে বর্ধমান শহরে সরবরাহ করা হবে সেই প্রকল্প রূপায়ণ এবং তার বাজেটকে কেন্দ্র করে।

প্রথম সমস্যাটি সমাধানের জন্য, অর্থাৎ, যোজিতপুর গ্রামে বাঁকা এবং দামোদর নদীর মধ্যে খাল কাটার জন্য বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা জমির মালিকদের কাছে প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু জমির মালিকরা প্রথমেই রাজি হন না। ফলে মিউনিসিপ্যালিটিও এই জমি কিনতে পারে না।[12] ১৮৭০-এর দশ নম্বর অ্যাক্ট-এর সেকশন ৬-এ বলা ছিল, সরকার জনস্বার্থে যে কোনও জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। এই ধারা প্রয়োগ করে সরকার ১৫০০ হাজার টাকা ব্যয় করে ২৪৯৮ ফুট লম্বা ১৪২ ফুট চওড়া জমিটি খাল কাটার জন্য ক্রয় করে। মিউনিসিপ্যালিটি সরকারকে এই জমিটির মূল্য শোধ করতে দায়বদ্ধ থাকেন।[13] খাল খনন করার সরকারি অনুমতিও দিয়ে দেওয়া হয়।[14]

এরপর বর্ধমানে জল সরবরাহের বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় নর্দান ড্রেনেজ এবং এমব্যাঙ্কমেন্ট ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র মি.জে.হুইটফিল্ডকে। তিনি মেটাকাফের

[12] JUDICIAL PROCEEDINGS, SEPTEMBER 1872, PROCEEDINGS NO.115(WBSA)

[13] JUDICIAL PROCEEDINGS, SEPTEMBER 1872, PROCEEDINGS NO.116(WBSA)

[14] JUDICIAL PROCEEDINGS, SEPTEMBER 1872, PROCEEDINGS NO.117(WBSA)

রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বলেন, মেটাকাফের রিপোর্টে বর্ধমান শহরে কীভাবে এবং কত পরিমাণে জল সরবরাহ করা হবে, সেই বিষয়ে কিছু বলা নেই। তিনি বলেন, বর্ধমান শহরে জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার। পানীয় জল, গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জল, রান্নায় ব্যবহারের জল---সব নিয়ে দৈনিক মাথাপিছু ছয় গ্যালন করে জল ধরলে ৩৫ থেকে ৪০ কিউবিক ফুট জল সরবরাহ প্রয়োজন।

পীরবাহারাম বর্ধমানের সব চেয়ে উঁচু অঞ্চল। তাই এখানে পাম্পের সাহায্যে বাঁকা থেকে জল তিরিশ ফুট উঁচুতে তুলে নিলে সমস্ত শহরে জল সরবরাহের কোনও সমস্যা থাকবে না। সরাসরি এই জল সরবরাহ করা হবে, নাকি রিসার্ভারে জমা রেখে সরবরাহ করা হবে, এই নিয়ে খানিক দোলাচলের পরে হুইটফিল্ড রিজার্ভার ব্যবস্থাকেই এগিয়ে রাখেন। পীরবাহারাম থেকে মেইন পাইপ বড়বাজারে যাবে। সেখান থেকে ডিস্ট্রিবিউটারি পাইপের মাধ্যমে জল শহরের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছবে। ডিস্ট্রিবিউটারি পাইপের বিভিন্ন জায়গায় জল সংগ্রহের জন্য হাইড্রান্ট থাকবে।[15] হুইটফিল্ড সাহেবের পরিকল্পনায় অবশ্য জল সরবরাহের খরচ চল্লিশ হাজার থেকে বেড়ে হয় একষট্টি হাজার টাকার মতো। মেটাকাফ সাহেব আগেই জানিয়েছিলেন, শহরে ১৮০০-১২০০টি বাড়ি আছে। প্রত্যেক বাড়ি পিছু ২ টাকা করে সংগ্রহ করলে চব্বিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। এছাড়াও হাতে থাকছে লোনের চল্লিশ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে, জল সরবরাহের খরচ উঠে আসছে।

তবে, এই আর্থিক সামর্থে বর্ধমানের সব জায়গায় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না এটা ভালোই বুঝেছিলেন হুইটফিল্ড সাহেব। এছাড়া বর্ধমান শহরের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি পাইপ পাতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।[16] তাই বর্ধমান শহরের পুকুরগুলিকে সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে পাইপের ভালো জল দিয়ে ভর্তি করতে হবে। পুকুরের পাড়গুলি উঁচু করে দিলে বাইরের

[15] JUDICIAL PROCEEDINGS, SEPTEMBER 1872, PROCEEDINGS. 119 (WBSA)

[16] JUDICIAL PROCEEDINGS, SEPTEMBER 1872, PROCEEDINGS NO.119(WBSA)

অপরিষ্কার জল পুকুরে ঢোকার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। এই পুকুরগুলি শহরের সার্বিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও সাহায্য করবে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসে, মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবাগুলি কি শহরের সবার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযুক্ত হত না? নাগরিকদের বৈধতা নিয়ে তৈরি হওয়া প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডের সকলে কি সমান বৈধ দাবিদার ছিলেন না? তাহলে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের প্রথমস্তরেই এই রকম স্থানিক বিভাজন করা হল কেন? প্রথম শহরের সর্বত্র পাইপের জল সরবরাহ করা হবে না। দ্বিতীয়ত, বড়বাজার-এ মেইন পাইপ যাবে এবং সেখান থেকে সার্ভিস পাইপের মাধ্যমে শহরের অন্যত্র পাঠানো হবে। অর্থাৎ, জলসরবরাহ ব্যবস্থাটি বড়বাজার অঞ্চলকেন্দ্রিক। বড়বাজার অঞ্চল মেইন পাইপের সন্নিকটে হওয়ায় এখানে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জলের ফোর্স বেশি থাকবে। মেইন পাইপ থেকে সার্ভিস পাইপগুলি যত দূরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে পড়বে, জলের গতিজাড্যের স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে জলের ফোর্স কম হবে। বড়বাজার অঞ্চলটি ১৮৭০-এর দশকের বর্ধমানের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বর্ধমান রাজবাড়ির দরবার মহল, অন্দরমহল, দেওয়ানি বাড়ি, চাঁদনিচক পেরিয়েই শুরু হচ্ছে বড়বাজার। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শহরের সম্পন্ন মানুষদের বসবাস। বর্তমানেও যদি আমরা এই অঞ্চলের পুরোনো বাড়ি এবং পরিবার থেকে এই অঞ্চলের বিন্যাস বোঝার চেষ্টা করি, তাহলেও বিষয়টা আমাদের সামনে পরিষ্কার হবে। উগ্রক্ষত্রিয় (যারা বাংলার বাইরে থেকে রাজাদের জমিদারিতে যোদ্ধা হিসেবে কাজ করতে আসেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বিস্তর স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হন), রাজাদের আত্মীয়, খুব বিশ্বস্ত, গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী এবং গ্রামে অনুপস্থিত শহরে বসবাসকারী জমিদার---এঁরাই মূলত রাজবাড়ি-বড়বাজার এলাকায় বসবাস করতেন। সুতরাং, মিউনিসিপ্যালিটি তার পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে শ্রেণি-বর্ণ ভিত্তিক বৈষম্যকেই প্রশ্রয় দিয়েছে, একথা বলাই যায়।

অচিরে হুইটফিল্ড সাহেবকে বর্ধমান শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। পি.ডব্লুউ.ডি-র বদলে জেনারেল ব্রাঞ্চকেই এই বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব

দেওয়া হয়। হুইটফিল্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি সরকারি টাকা এই কাজে ব্যয় করছেন। কাজটি পুরোপুরি ভাবে মিউনিসিপ্যালিটির টাকায় হওয়া উচিত। এখানে আরও একটি সংঘাতের কথা উঠে আসছে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি সরকারি সম্পর্কের খানিক আভাস মিলছে হুইটফিল্ড বরখাস্তের ঘটনায়। সরকার কিছু লোন দেবে নাগরিক পরিষেবার জন্য। মিউনিসিপ্যালিটি কর আদায় করে দীর্ঘমেয়াদি এই ঋণ পরিশোধ করবে। সুতরাং, মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে তোলার বিষয়টিকে সরকার একটা উদারনৈতিক-জনহিতকর তাত্ত্বিক মোড়ক দিলেও, সরকারি টাকাপয়সায় হাত পড়লে আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। হুইটফিল্ডের বরখাস্তের ঘটনাকে আমরা এভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারি।

বর্ধমান জল সরবরাহ বিষয়ে দায়িত্ব পেয়ে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ডব্লুউ.স্মিথ একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট দেন এবং তার ভিত্তিতেই বর্ধমানে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের সূত্রপাত ঘটে। এই রিপোর্টটি মূলত হুইটসনের পরিকল্পনার কার্বন কপি। শুধু এর সঙ্গে একটি নতুন বিষয়ের দিকে আলোকপাত করেন স্মিথ। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা বর্ষা বাদে অন্য ঋতুর ক্ষেত্রে একদম ঠিক আছে। কিন্তু, বর্ষাকালে নদীর জল এতটাই ঘোলা থাকে যে, তা ব্যবহার করার অযোগ্য। কিন্তু, বর্তমানে খরচের দিকে তাকিয়ে এই ব্যবস্থাটিই প্রণয়ন করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। শহরের পুকুরগুলি পরিষ্কার রাখলে সেই জল বর্ষাকালে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে রিজার্ভারগুলির সঙ্গে ফিল্টারবেড যুক্ত করে জল সরবরাহ ব্যবস্থাটিকে সার্বিক ভাবে ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব।

বর্ধমান শহরে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ নিয়ে এক দশক কাল আর্কাইভসের নথিপত্র বেশ নীরব। হতে পারে বর্ধমানবাসী এই ব্যবস্থার সঙ্গে আস্তে আস্তে মানিয়ে নিচ্ছিলেন এবং জল সরবরাহ প্রকল্প বাবদ হিসাবপত্রও মোটামুটি ঠিক ছিল, তাই বিতর্কিত ঘটনা বিশেষ একটা ঘটেনি বলেই সরকারি নথির এই নীরবতা।

বর্ধিত জলকর ও নাগরিক প্রতিবাদ

জল সরবরাহ নিয়ে পরবর্তী বিতর্কের সূত্রপাত ১৮৮৪-১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ।[17] পরিশোধনের নতুন ব্যবস্থা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বিভিন্ন কনট্রাক্টরদের কাছে ধারের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকার মতো। সরকার কিছু টাকা লোন দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির পুঁজির অবস্থাও খুব সংকটজনক। এমতাবস্থায় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কিছু নিয়মাবলী তৈরি হয়, যেখানে বর্ধিত হারে জলকর আদায়ের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই হারে জলকর দাঁড়ায়, মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে থাকা স্থাবর সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্যের প্রায় ৬ শতাংশ। অন্যদিকে, আবার এই নিয়মাবলীতে বলা ছিল যে, জলের কলের ১/৩ মাইল দূরবর্তী অঞ্চল থেকে জলকর আদায় করা যাবে না। এই দুই নিয়মের মাঝে বেশ ফাঁপড়ে পড়েন বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা।

হুইটফিল্ডের পরিকল্পনাতেই আমরা দেখেছিলাম বড়বাজার চত্বরে মেইন পাইপ যাবে এবং সেখান থেকে সারা শহরে সার্ভিস পাইপ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু এই সার্ভিস পাইপ শহরের কোথায় কীভাবে যাবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা ছিল না। এদিকে বর্ধমান শহরের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। বহু প্রান্তিক এলাকা, গ্রাম ঢুকে পড়ছে শহরে। খাতায় কলমে এগুলি মিউনিসিপ্যালিটির অধীন হলেও বহু পরিষেবাই এখানে পৌঁছয় না। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের নতুন জল সরবরাহের আইন অনুযায়ী জলকরের বন্দোবস্ত করতে গিয়েই সমস্যার সূত্রপাত। ঠিক এই ধরনের সমস্যার কথা আমরা দেখেছিলাম নিখিল আনন্দের লেখায়। বর্ধমান শহরে C, D এবং E ওয়ার্ড পরে মিউনিসিপ্যালিটির আওতাভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ওয়ার্ড D এবং E বাঁকা নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত। এই অঞ্চলে জলের পাইপলাইন সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে এই অঞ্চলগুলি জলের কলের ১/৩ মাইলের এক্তিয়ারে পড়ে না। সুতরাং, নতুন জলের আইন

[17] MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO.60-78, DEC 1885

অনুযায়ী এই অঞ্চলে জলকর আদায় করা মুশকিল। ওয়ার্ড C, বাঁকা নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত হলেও এখানে জলের সরবরাহ খুব ভালো নয় এবং এখানকার অধিবাসীরা পুকুরের জলেই অভ্যস্ত বলে দাবি স্থানীয় জনতার। কিন্তু একই মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে দুইরকম নিয়ম ন্যায্যত কীভাবেই বা করা যাবে, সেই নিয়েও জল্পনা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের মধ্যে। এই নিয়ে মিটিং-ও হয়েছে বহু।

প্রয়াগ লাল পাণ্ডে নামে ওয়ার্ড C-এর এক বাসিন্দা তাঁদের উপর ১৮৮৪-এর নতুন জলকর যাতে না চাপানো হয়, সে জন্য মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকে চিঠি লেখেন। তিনি লেখেন, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষ্টসাগর, কমলসাগর, বার সর্বমঙ্গলা, লালা দিঘি, মনি সাগর, বাঁকা এছাড়াও অন্য বহু জলাশয়ের জল ব্যবহার করতে পারেন। তাই তাঁদের কাছে পাইপের জল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ নেই। নতুন জলের আইনের অতিরিক্ত জলকর দিতে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রায় অক্ষম। এই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা খুবই গরিব। গৃহকর দিয়ে আরও অতিরিক্ত জলকর দেওয়া তাঁদের উপর অত্যাচারের সামিল। এছাড়া এই অঞ্চলটিকে পুরো শহর নয়, বরং শহরতলি বলা যায়। শহরের অন্য অঞ্চলে সম্পন্ন মানুষদের বসবাস। তাঁরা জলকরের এই অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে সক্ষম।[18]

তদানীন্তন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নলিনাক্ষ বসু, বর্ধমান শহরের ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান, প্রয়াগ লাল পাণ্ডে তাঁর চিঠিতে যে সব জলাশয়ের নাম করেছেন, তার বেশির ভাগই ওয়ার্ড C তে নেই। লাকুড্ডি, পাহাড়পুর, টিকরহাট, হাজিডাঙ্গা এইসব জায়গার বাসিন্দারা খরার সময়ে মিউনিসিপ্যালিটির জল দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত। বরং, এই অঞ্চলের অনেক বাসিন্দার কাছ থেকে অতিরিক্ত জলের কল স্থাপনের দাবি উঠে এসেছে।[19]

[18] MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO.64

[19] MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO.70

শেষপর্যন্ত সরকারি ভাবে প্রয়াগ লাল পাণ্ডের দাবি নাকচ হয়। সরকারি তরফে জানানো হয়, খরার মরশুমে এবং শহরবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষায় জল সরবরাহের প্রভাব অসামান্য। তাই জলকর কমানোর অন্যায্য দাবি মানা হবে না।[20]

শেষপর্যন্ত, প্রয়াগ লাল পাণ্ডে আর একটি চিঠিতে লেখেন ওয়ার্ড C-এর মূলত কৃষিজীবী বাসিন্দারা যদি কর দিতে বাধ্য হন, তবে এই অঞ্চলে বিশেষত কাটরাপোতা, পাহাড়পুর অঞ্চলে ভালো ভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।[21]

এইসব দাবিদাওয়া থেকে অনেকগুলি বিষয় সামনে আসছে। প্রথমত, শহরের সর্বত্র পরিষেবা সমান ভাবে পৌঁছায় না। দ্বিতীয়ত, শহরের নাগরিকরা তাদের বিভিন্ন পৌর দাবিদাওয়া আদায় করতে যথেষ্ট সরব হয়ে উঠেছেন। এমনকী শহরতলি বা তার চরিত্র সম্পর্কেও তাঁরা বেশ ওয়াকিবহাল। তৃতীয়ত, কী কী পরিষেবা থাকলে পুরোপুরি শহর এবং কী কী হলে তাকে শহরতলি বলে এই ধরনের একটা সচেতনতা গড়ে উঠেছে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে। সুতরাং, এগুলিকে আমরা নিঃসন্দেহে পৌর নাগরিকতা গঠনের একটি পর্যায় বলতেই পারি।

ওয়ার্ড D এবং ওয়ার্ড E-তে নতুন জল সরবরাহ আইন কার্যকর করা নিয়ে আরও বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে জলের পাইপ লাইন নেই, অথচ অঞ্চলটি মিউনিসিপ্যালিটির এক্তিয়ারভুক্ত। এখন কীভাবে এই অঞ্চলটি থেকে জলকর আদায় করা যাবে, এই নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের মধ্যে বারবার মিটিং হয়েছে। মিটিং-এ কখনও এই অঞ্চলে কর আদায়ের দিকে পাল্লা ভারি হয়েছে, তো কখনও কর না দেওয়ার দিকে।[22] মিটিং-এর প্রসিডিংস সরকারি উপরমহলেও পাঠানো হয়। শেষপর্যন্ত, মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্ট বর্ধমানের কমিশনারদের এই সব দাবি নাকচ করে দেয়। বলা হয়, বর্ধমান শহরের একটি

[20] MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO.69

[21] MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO. 71

[22] MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO. 71

যথাযথ বাউন্ডারি ঠিক করতে। তার ভিত্তিতেই জলকর ধার্য করা হবে। মিউনিসিপ্যালিটিভুক্ত কোনও ওয়ার্ডের দেয় জলকর মকুব করা যাবে না। ওয়ার্ড D এবং E-এর অধিবাসীদের তরফ থেকেও প্রতিবাদ আসে। বাবু পি.এম রুদ্র অন্য অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ থেকে একটি বেশ সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন। চিঠিটি বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি গঠন এবং জল সরবরাহ পরিষেবা চালু হওয়ার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবুদ। মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার পন্থায় শহরের স্থানিক, শ্রেণীয় বিভাজনের চিত্রটি এখানে খুব সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। স্থানীয় মানুষ কীভাবে মিউনিসিপ্যালিটির কার্যক্রমকে গ্রহণ করেছিলেন, সেটিও ফুটে উঠেছে এই চিঠিতে।

এই চিঠিতে বলা হয়, ওয়ার্ড D এবং E-এর অধিবাসীবৃন্দের পক্ষে স্থাবর সম্পত্তির সাড়ে চার শতাংশ হারে জলকর দেওয়া খুবই সমস্যার। এই জল সরবরাহ প্রকল্প মূলত বাঁকা নদীর উত্তরপাড়ের বাসিন্দাদের জন্যই পরিকল্পিত। তাই এর রক্ষণাবেক্ষণও বাঁকা নদীর উত্তরপাড়ের বাসিন্দাদের থেকেই সংগ্রহ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররাই এই অঞ্চলে জলকর চালু করার বিষয়ে সহমত পোষণ করেননি। বহু মিটিং-এ এই অঞ্চল থেকে জলকর আদায় না করার দাবি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু, শেষপর্যন্ত মার্চ মাসের মিটিং-এ এই অঞ্চল থেকে জলকর আদায়ের প্রস্তাবটি স্বীকৃত হয়। ছয়টি ভোটের মধ্যে পাঁচটি ভোট এই অঞ্চল থেকে জলকর আদায় করার সপক্ষে পড়ে। এই দুইটি ওয়ার্ড থেকে বাঁকার উত্তর পাড়ের কমিশনারদের সংখ্যা বেশি। তাই বাঁকার দক্ষিণ পাড়ের দাবিদাওয়াগুলি বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিতে নেহাত-ই প্রান্তিক হয়েই থেকে যায়। তৃতীয়ত, এই চিঠিতে, মিউনিসিপ্যালিটি জেনারেল ফান্ড থেকে জল সরবরাহ প্রকল্পে ৯০০০ হাজার টাকা দেওয়ার আবেদন করা হয়। জেনারেল ফাণ্ডে ওয়ার্ড D এবং E-থেকে গৃহকর বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ বিভিন্ন সময়ে জমা পড়েছে। তাই সেই ভাবে দেখতে গেলে জল সরবরাহ প্রকল্পে এই দু'টি ওয়ার্ডের তরফ থেকে কিছু অর্থ জমা পড়েইছে। তাছাড়া এই দু'টি ওয়ার্ডে অদূর ভবিষ্যতে জল সরবরাহের কোনও সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং, শহরের একাংশ যে পরিষেবা ভোগ করবে তার

ব্যয় ভার শহরের অন্য অংশ বহন করবে, এইরকম দাবিও খুব অন্যায্য। এমতাবস্থায় এই দু'টি ওয়ার্ডে জলকর চাপানো হলে এখানকার অধিবাসীরা মিউনিসিপ্যালিটির এক্তিয়ার ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করবে।

পি এম রুদ্র-র চিঠিতে অনেক দাবি এবং নাগরিকদের তরফ থেকে কিছু অধিকারের প্রশ্ন উঠে আসে। বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার এলউইস সাহেবও শেষ অবধি মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্টে চিঠি লিখে অনুমতি চান, যদি বর্ধমান শহরে দুই ধরনের জলকর চালু করা যায়! যাঁরা জল সরবরাহ পরিষেবা ভোগ করেন, তাঁরা ছয় শতাংশ হারে আর যাঁরা জল সরবরাহ পরিষেবা ভোগ করেন না তাঁরা চার শতাংশ হারে জলকর দেবেন।[23]

কিন্তু শেষপর্যন্ত এই দাবি খারিজ হয়। কমিশনার সাহেব-ই শহরবাসীকে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান "The burden is one incurred by the municipality as a whole, and must be shared by all the members. It is quite impossible to drw a hard- and- fast line of demarcation between those who enjoy the filtered water and those who do not. There is certainly one hydrant close to a bridge over Banka River which is quite accessible to persons living to the North of it." [24]

সুতরাং, শহরের সার্বিক জনস্বাস্থ্যের উন্নতির যে উদারনৈতিক দাবি নিয়ে ব্রিটিশরা মিউনিসিপ্যালিটির সূত্রপাত করেছিলেন, তা সর্বতোভাবে সত্য নয় তা যথেষ্ট পরিষ্কার। বরং, শহরের পৌর নাগরিকতাজনিত অধিকার কিছু বিশেষ নিয়ামকের দ্বারা নির্ধারিত হয় একথা আরেকবার প্রমাণিত হয়ে যায়।

---

[23] MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO. 72

[24] MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3, PROCEEDINGS NO. 73

এরপর আবার বর্ধমানের জল সরবরাহ প্রকল্প নিয়ে কথাবার্তা ওঠে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নলিনাক্ষ বসু সরকারের কাছে বর্ষাকালে দামোদরের কাদাযুক্ত জল পরিশোধনের জন্য ৩৯২৩৫ টাকা লোন চান।[25] মূলত একটি ফিল্টার, দু'টি মাটির তলার রিজার্ভার, একটি সেটলিং ট্যাঙ্ক এবং একটি নতুন ইঞ্জিন পাম্পের জন্য এই টাকা চাওয়া হয়। সরকারি তরফে এই ঋণ মঞ্জুরও হয়।

বাড়িতে কলের জল

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান শহরের জল সরবরাহের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। কলকাতা শহরে জল সরবরাহ প্রকল্প চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতেও জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্ধমানে বাড়িতে মিউনিসিপ্যালিটির জলের সংযোগ পেতে প্রায় দুই দশক কাল অপেক্ষা করতে হয়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি Act IV (B.C)-এর মাধ্যমে।[26] এই আইনে বলা হয়, যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটির সীমানায় গৃহকর দিয়ে বসবাস করেন, তাঁরা সার্ভিস পাইপ থেকে নিজস্ব যোগাযোগের পাইপ দিয়ে বাড়ির এলাকার মধ্যে জলের সংযোগ নিতে পারবেন। এর জন্য অবশ্য কতগুলি শর্ত থাকবে। সেগুলি মানলে বাড়িতে জলের সংযোগ নেওয়া যাবে।

১। বাড়িতে ম্যাসনারি হাউস থাকতে হবে। সেখানেই জলের ট্যাপটি থাকবে।

২। বাড়ির ভ্যালুয়েসন নূন্যতম বাৎসরিক ৬০ টাকার কম হলে জলের সংযোগ পাওয়া যাবে না।

৩। বাড়ির মালিক বা বাড়িতে বসবাসকারীদের মিউনিসিপ্যালিটির ফর্মে জলের সংযোগের জন্য আবেদন করতে হবে।

---

[25] MUNICIPAL,MUNICIPAL BRANCH, FILE :M1-W/12, OCTOBER 1893, PROCEEDINGS-38 (WBSA)

[26] MUNICIPAL,MUNICIPAL BRANCH, FILE :M2-R/9, JANUARY 1898, PROCEEDINGS-13-14 (WBSA)

৪। একটা জলের সংযোগ থেকে একাধিক কলে জল পাওয়া যাবে না।

৫। ব্যবহৃত পাইপগুলি ভিতর এবং বাইরে গ্যাল্ভানাইজড হতে হবে। কমিশনার গুণমান পরীক্ষা করলে, তবেই সেই পাইপ ব্যবহার করা যাবে।

৬। পাইপের মেরামত, পরিষ্কার এবং প্রয়োজনে বাড়াতে গেলে কমিশনারের অনুমতি লাগবে।

৭। পরিদর্শনের ফি আবেদন করার সময়-ই জমা দিতে হবে।

৮। দোতলা বা তার উপরে কল নিজ দায়িত্বে বসাতে হবে। এক্ষেত্রে জল পৌঁছনোর দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটি নেবে না।

বাড়িতে জল সংযোগের ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির এইসব নিয়মাবলী সরকারি অনুমতির জন্য পাঠানো হলে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয় ১৮৯০-এর বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী যে সব ব্যক্তি ঠিক মতো জল কর দিয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে জল সরবরাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত এই দাবি অনুযায়ী বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিও বাড়িতে জল সরবরাহের পূর্বশর্তে কিছু রদবদল ঘটায়। বাড়ির ভ্যালুয়েশনের শর্তটি বাদ দেয়। জলের সংযোগ পেতে গেলে ভ্যালুয়েশনের শর্তটি বাদ গেল ঠিকই; কিন্তু বিভেদ তাও থেকেই গেল। ভ্যালুয়েশন অনুযায়ী বাড়িতে জলের কলের সংখ্যা, ফেরুলের মাপ বা ডাইমেনসন পাইপের স্টপককের মাপ নির্ধারিত হল। অর্থাৎ, ভ্যালুয়েশন বেশি হলে বাড়িতে জলের পরিমাণও বেশি। বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নলিনাক্ষ বসু বাড়ি পিছু কলের সংখ্যা নির্দিষ্ট না রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখার কথা বলেন। কিন্তু বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট বা বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার এই দাবি খুব একটা যুক্তিযুক্ত বলে

মনে করেন না।[27] শেষ পর্যন্ত, ১৮৯৮ সালের ১১-ই জানুয়ারি বর্ধমানের বিভিন্ন বাড়িতে জল সরবরাহ সরকারি অনুমতির সিলমোহর পায়।[28]

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের যে সমস্যাটি দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম, তার মোটামুটি একটা সূচনার ইতিহাস পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, কোন ভ্যালুয়েশনে কটি কল থাকবে, ফেরুলের মাপ কেমন হবে, বা ডাইমেনশন পাইপ রাস্তা থেকে কত উচ্চতায় থাকবে, মিউনিসিপ্যালিটি সেগুলি নির্ধারণ করবে। বিভিন্ন সময়ে এই বিধান বিভিন্ন রকম হয়েছে। বাড়িতে জল সরবরাহ প্রকল্প শুরু হওয়ার মুহূর্তেই দেখলাম এই নিয়ে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটির মতবিরোধ শুরু হয়েছে। শহর ভেদে এই সমস্যাগুলিও ভিন্ন। কারণ জলের পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ভূমির ঢাল একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। অর্থাৎ, শহরের নীচু ভূমির ঢালযুক্ত অঞ্চলে জল পৌঁছে যায় খুব সহজে। আর অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলগুলি জল পায় কম। সুতরাং নিয়ম এক হলেও ভৌগোলিক অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি করে।

জলের স্বাস্থ্য ও ঔপনিবেশিক শঙ্কা

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আবার বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ বিষয়ে সরকারিস্তরে কথাবার্তা শুরু হয়। অবশ্যই কিছু বিতর্ককে কেন্দ্র করে। এবারের অভিযোগ বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ নিয়ে রিপোর্ট মোটেই সন্তোষজনক নয়। এছাড়া আগে স্যানিটারি কমিশন যে ত্রুটিগুলি শুধরে নেওয়ার কথা বলেছিল, সেগুলিও যথাযথ পালিত হয়নি। এই নিয়ে বেশ কড়া সরকারি জবাবদিহির মুখে পড়তে হয় মিউনিসিপ্যালিটিকে। বাদ জান না বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেটও।

[27] MUNICIPAL,MUNICIPAL BRANCH, FILE :M2-R-8/9, JANUARY 1898, PROCEEDINGS-13-14 (WBSA)

[28] MUNICIPAL,MUNICIPAL BRANCH, FILE :M2-R-9/9, JANUARY 1898, PROCEEDINGS-13-14 (WBSA)

মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে স্যানিটারি কমিশন কয়েকটি বিষয়ের খুব পরিষ্কার উত্তর চান। নতুবা বলা হয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নিযুক্ত জল সরবরাহ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক Mr. Bission(মিঃ বিসন) বরখাস্ত করা হবে। বিষয়গুলি হল---

১। জল মজুত করা বিষয়ক ব্যবস্থা।

২। বয়লার এবং মেশিনারিগুলির অবস্থা।

৩। ফিল্টার বেড-এর ব্যবহার।

৪। বায়োলজিক্যাল টেস্টের খতিয়ান।

৫। খরচাপাতির হিসাব। [29]

এই প্রসঙ্গগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। এক্ষেত্রে তাঁর উত্তরের বয়ানও দুইরকম। প্রথম ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধিকার বজায় রেখে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন। পরের চিঠিতে পরিস্থিতির চাপে সুর খানিকটা নরম করতে বাধ্য হয়েছেন চেয়ারম্যান।

জল মজুত রাখা এবং জল পরিষ্কার বিষয়ে চেয়ারম্যান প্রথমে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, বর্ষাকালে নদীর জল ঘোলা থাকে বলে জল পরিশ্রুত করার জন্য চারকোল ব্যবহার করা হয়। বছরের অন্য সময়ে চারকোলগুলি তুলে নিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে স্টোরে রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু পরের চিঠিতে সুর বদলে যায়। সেখানে চেয়ারম্যান বলেন স্যানিটারি কমিশন কেন সারা বছর জল পরিশ্রুত করার কথা বলেছেন, সেটা ঠিক মিউনিসিপ্যালিটি বুঝতে পারেনি। এই বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য স্যানিটারি কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

[29] M 1-W/6, JUNE 1903, PROCEEDINGS-3, (WBSA)

বয়লারগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে চেয়ারম্যান বলেন, সমস্ত ইঞ্জিনগুলি একসাথে সারানো সম্ভব নয়। আপাতাত একটি ইঞ্জিন ঠিক করা হয়েছে, অচিরেই অন্য ইঞ্জিনটিও ঠিক করা হবে।

ফিল্টারবেডগুলির রক্ষণাবেক্ষণ-এর বিষয়ে চেয়ারম্যান বেশ কড়া ভাষায় আগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ. স্মিথ-এর ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দেন। এছাড়া তিনি বলেন, বয়লারের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি স্থানীয় ওয়ার্কশপে তৈরি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে এগুলি আনানোর ব্যবস্থা করতে হয়। সেই জন্য বয়লার রক্ষণাবেক্ষণে বেশ কিছুটা দেরি হয়।

ফিল্টারবেড রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়েও সুপারিন্টেন্ডন্টের ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দেন। বালি এবং অন্যান্য রিচার্জ বিষয়ে স্মিথ যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন না। তবে, নতুন সুপার মিঃ. বিসন ফিল্টার বেড সারানো নিয়ে যথেষ্ট তৎপর। তিনি শ্রীরামপুরে বালি এবং ফিল্টার রিচার্জ করা শিখতে গিয়েছিলেন। অচিরেই এই বিষয়টির যথাযথ উন্নতি সাধন করা হবে বলে চেয়ারম্যান স্যানিটারি কমিশনকে আশ্বস্ত করেন। এছাড়াও চেয়ারম্যান তাঁর চিঠিতে লেখেন, স্মিথ বায়োলজিক্যাল টেস্টও ঠিক মতো জানতেন না। বিসন শ্রীরামপুরে বায়োলজিক্যাল টেস্ট শিখে এসেছেন। মাসে দু'বার বায়োলজিক্যাল টেস্ট করানো হচ্ছে। [30]

স্মিথ জল সরবরাহ প্রকল্পের হিসাবপত্র যথাযথ ভাবে দেননি। তাই চেয়ারম্যান জানান, মিউনিসিপ্যালিটি এই বিষয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত, চেয়ারম্যান প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তাঁর রিপোর্ট শেষ করেন:-“We respectfully beg to submit that though we have not been able to carry out all the instructions of the sanitary Board, and the sanitary engineer, we have tried our best to carry

[30] M 1-W/6, JUNE 1903, PROCEEDINGS-6 (WBSA)

out the instructions regarding the intake and filter beds and thus insured a sufficient supply of good filter water to the town, and we can assure that every endeavour will be made to reduce all the other defects pointed out and hope that the sanitary Engineer will be quite pleased with our water works during the next visit.[31]

চেয়ারম্যানের রিপোর্টের পাশাপাশি বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট Mr. B.Foley(মিঃ. বি. ফোলে)-ও স্যানিটারি কমিশনকে বর্ধমানের জল সরবরাহ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দেন। অবশ্য তিনি এই রিপোর্টে জলসরবরাহ প্রকল্প সম্বন্ধে খুব সন্তোষজনক মতামত দেননি। তাঁর মতে বর্ধমানের জল সরবরাহ প্রকল্প সবচেয়ে সমস্যাবহুল এবং অসন্তোষজনক বিভাগ। গত চার বছরে এই বিভাগ নিয়েই সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠেছে। শুধুমাত্র Major Vogan যখন বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, অর্থাৎ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে মে মাস অবধি বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে। এখন চেয়ারম্যান দেবেন্দ্রনাথ মিত্র জল সরবরাহ প্রকল্পের ত্রুটির সমস্ত দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন পূর্বতন সুপারিন্টেন্ড স্মিথ সাহেবের ঘাড়ে। এই বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেট খুব ভাল ভাবে দেখেননি। তিনি বলেন ভেগানের আমলে স্মিথকে নিয়ে কোনও অভিযোগ ওঠেনি। সুতরাং, মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনগত ত্রুটি এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অতীত কাজের দৃষ্টান্তই বলে দিচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি ভবিষ্যতেও দায়িত্বপূর্ণ ভাবে জল সরবরাহ প্রকল্পটি চালাতে পারবে না। কিন্তু শহরের সার্বিক স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করলে এই প্রকল্পের মূল্য অনস্বীকার্য। তাই মিউনিসিপ্যাল হসপিটাল এবং ডিস্পেন্সারিগুলিকে যেভাবে মিউনিসিপ্যালিটির কাজের আওতা থেকে বের করা হয়েছে, জল সরবরাহের ক্ষেত্রেও তা-ই করা হোক। জল সরবরাহের জন্য যদি আলাদা একটি কমিটি তৈরি করা যায়, যার সদস্য

[31] M 1-W/6, JUNE 1903, PROCEEDINGS-7 (WBSA)

থাকবেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জেন এবং ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার; তাহলে জল সরবরাহ প্রকল্পটি আরও ভাল ভাবে পরিচালনা করা যাবে।[32]

ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ফোলের স্বাধীন কর্মকাণ্ডের পক্ষে শহরের মানুষ দ্বারা পরিচালিত মিউনিসিপ্যালিটি নিঃসন্দেহে একটা বড় বাধা। আবার ম্যাজস্ট্রেটের স্বজাতিপ্রীতিও লক্ষ করার মতো। ভেগান সাহেবের আমলে মিউনিসিপ্যালিটির কোনও গণ্ডগোলই চোখে পড়েনি। জল সরবরাহের পূর্বতন সুপারিন্টেন্ডন্ট স্মিথকেও বাঁচানোর একটা ক্ষীণ চেষ্টাও চোখে পড়ে ফোলের চিঠিতে।

ম্যাজিস্ট্রেট এবং চেয়ারম্যানের চিঠি খতিয়ে দেখে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্ট তার বিধান জানায়। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে বলা হয়, বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্যানিটারি কমিশনের রিপোর্ট যথাযথ ভাবে পালন করেনি (এখানে মনে রাখতে হবে ভেগান সাহেব চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং ফোলে সাহেবের বিধান অনুযায়ী ভেগানের আমলে কোনও গণ্ডগোল নেই এই কথা সর্বতো ভাবে সত্যি নয়)। ফিল্টারে নতুন বালি দেওয়া হয়নি, বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা যথাযথ ভাবে করা হয়নি, ইঞ্জিনের দেখভাল করা হয়নি। জলের গুণমান নিয়েও বহু শঙ্কা আছে। এছাড়া রক্ষণাবেক্ষণের খরচ জল সরবরাহের সাপেক্ষে খুব বেশি । এক্ষেত্রে স্যানিটারি কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, মিউনিসিপ্যালিটি সব দোষ স্মিথের ওপরে চাপিয়ে দায়মুক্ত হতে চাইছে, যা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মি.হ্যামিল্টনের সময় কয়লার হিসেব গরমিল থেকেই মিউনিসিপ্যালিটির সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট যে ভাবে সব দোষ মিউনিসিপ্যালিটির উপর চাপিয়ে দায়মুক্ত হতে চাইছেন, তা-ও মানা যায় না। তারও ঠিক মতো জল সরবরাহ প্রকল্প পরিদর্শন করা উচিত ছিল।

[32] MUNICIPAL , BRANCH MUNICIPAL, M 1-W/6, JUNE 1903, PROCEEDINGS-11 (WBSA)

সব কিছু বিবেচনা করে স্যানিটারি কমিশন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যদের আর একটা সুযোগ দেন।

এই ভাবে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি কড়া সরকারি নজরদারিতে নিজেকে প্রমাণ করার আর একটি সুযোগ পায়। নতুন উদ্যমে তারা কাজ শুরু করে। এই ঘটনা সেই সঙ্গে আরও একটা বিষয় প্রমাণ করে। বর্ধমানের জল সরবরাহ প্রকল্প সব সময় কড়া সরকারি নজরদারির মধ্যে থেকেছে। আমরা যখন বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ প্রকল্প আলোচনা করব, দেখব সেখানে নজরদারি এতটা জোরালো নয়। তাহলে প্রশ্ন, এই কড়া নজদারির কারণ কী?

১৮৩০-১৮৪০ এর দশকে ইংল্যান্ডে ‘পাব্লিক হেলথ মুভমেন্ট’ শুরু হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে নবনির্মিত কলকারখানায় কাজ করতে গ্রামাঞ্চল থেকে কাতারে কাতারে মানুষ চলে আসছেন শহরে। দুই-তিন দশকের মধ্যে শহরের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নানা ধরনের নতুন সমস্যার সূত্রপাত ঘটায়। শহরে কাজের সন্ধানে আসা স্বল্প মজুরির শ্রমিকরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘিঞ্জি বস্তির মধ্যে বসবাস করে অচিরেই বিভিন্ন রোগের শিকার হয়। চার্লস ডিকেন্সের লেখাপত্র আমাদের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিচিত করে। শ্রমিকরা এক শহরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করত না। তারা প্রায়শই এক শহর থেকে আর এক শহরে যেত কাজের সন্ধানে। সেই সঙ্গে রোগও ছড়িয়ে পড়ত শহর থেকে শহরে। নতুন দরিদ্র আইন তৈরি হয়েছে ইংল্যাণ্ডে, যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি। এই বিষয়ে ‘স্যানিটেশন-এর’ ধারণা খুব জনপ্রিয় হয়। প্রায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি এই ধারণা ব্রিটেনে খুব জনপ্রিয় ছিল। স্যানিটেশন ক্রমশ একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়।[33]

[33] Cristopher Hamlin,Public Health And Social Justice In The Age Of Chadwick,Britain,1800-18054,Cambridge University Press, 1998, Page-4

বর্ধমানের ক্ষেত্রেও খানিকটা এই রকম ব্যাপার। বর্ধমানের সঙ্গে কলকাতার সংযোগ বরাবরই নিবিড়। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা খনির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য হাওড়া থেকে রেলপথ স্থাপিত হয়েছে বহু আগেই। এই পথেই বর্ধমান স্টেশন। তাই রেলপথ বর্ধমান ও কলকাতার মধ্যে যোগাযোগের সেতু রচনা করেছে। পণ্য, মানুষজনের সঙ্গে খুব সহজেই পরিবাহিত হয়েছে রোগও। ১৮৭০-এর দশকের শেষের দিকে বর্ধমান জ্বরের ভীতি তো আছেই।

যাই হোক, আবার আমরা ফিরে আসি বর্ধমানের জল সরবরাহ প্রকল্পে। মিউনিসিপ্যালিটির নতুন সদস্যরা আরেকবার সুযোগ পেয়ে জলের গুণমান বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে লেফটনেন্ট গভর্নর একবার বর্ধমানে আসেন। তাঁর সামনে মিউনিসিপ্যালিটি তাদের কাজের খতিয়ান পেশ করে ও কিছু দাবি-দাওয়া জানায়। মিউনিসিপ্যালিটি এই দাবিপত্রে জানায়, শহরে রাস্তায় এবং বাড়িতে জলের কলের সংখ্যা বেড়েছে। এছাড়া দামোদর নদীর জলে ফেরো সালফেট প্রয়োগ করে অ্যালুমিনিয়াম-সহ অন্য ফরেন পার্টিক্যাল-এর প্রকোপ কমানো গেছে। স্যানিটারি কমিশন জানিয়েছে, বয়লার এবং ইঞ্জিনগুলি ভালই কাজ করছে।[34] লেফটনেন্ট গভর্নরও অবশ্য স্বীকার করেন, বর্ধমান শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থার সত্যি-ই আগের থেকে উন্নতি হয়েছে।[35] অবশ্য এই সময়টাও আমাদের মনে রাখা দরকার। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বর্ধমান রাজার প্রতি ব্রিটিশ সরকার বিশেষ সদয়। তাই বর্ধমান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বেশ সহযোগিতাপূর্ণ।

বাঁকার দক্ষিণ পাড়ে জল সরবরাহের জন্য আবারও আর্জি জানান লেফটনেন্ট গভর্নরের কাছে। কিন্তু এই বিষয়ে তখনই কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। তবে তিনি আশ্বস্ত করেন, আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিকে খুব অল্প কিছু সাহায্য সরকারি

[34] MUNICIPAL , BRANCH MUNICIPAL, M 22-A/22, NOVEMBER 1904, PROCEEDINGS-58 (WBSA)

[35] MUNICIPAL , BRANCH MUNICIPAL, M 22-A/22, NOVEMBER 1904, PROCEEDINGS-60(WBSA)

তরফে করা যেতে পারে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দেও বাঁকা নদীর দক্ষিণ পাড়েও জল সরবরাহের কোনও সুরাহা হয়নি।

ক্রমবর্ধমান বর্ধমান শহরে জলসরবরাহ সম্প্রসারণের দাবি

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আবার বাঁকার দক্ষিণ পাড়ে জল সরবরাহ নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি সরব হয়ে ওঠে। এই সময় লেফটনেন্ট গভর্নর আর একবার বর্ধমানে আসেন। মিউনিসিপ্যালিটি দাবি জানায়, শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প সার্বিক জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। তাই শহরের সমস্ত অংশে জল সরবরাহ আশু প্রয়োজন। স্যানিটারি কমিশন জানিয়েছেন বাঁকা নদীর দক্ষিণ পাড়ে মাথাপিছু ১০ গ্যালন জল সরবরাহ করতে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা খরচ হবে। মিউনিসিপ্যালিটির এই বিষয়ে আর্থিক অনুদান প্রয়োজন। মিউনিসিপ্যালিটি লেফটনেন্ট গভর্নরের কাছে এই বিষয়ে বর্ধমান মহারাজার কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করার অনুমতি চায়। এখানে লক্ষণীয় মহারাজার কাছে মিউনিসিপ্যালিটি অনুদান চাইতে পারে কি না, তা-ও লেফটনেন্ট গভর্নরের অনুমতি সাপেক্ষ। সেই সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা খুব বিনীত ভাবে জানান, এই বিষয়ে কিছু সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লেফটনেন্ট গভর্নর আগেরবার বর্ধমান ভ্রমণের সময় দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই তা মনে রেখেছেন।

এই বিষয়ে লেফটনেন্ট গভর্নরের উত্তর, “ you will find my friend as able to assist you in this matters as his liberality would incline him to do, and I can only say for the government, that when we know definitely what assistance it requires, we shall be ready to do what we reasonably can to help”।

এখানে শব্দগুলি লক্ষ করার মতো। মহারাজার সাহায্য তার দানশীলতা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু, ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য সবটাই যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত।

বর্ধমানবাসী দ্বারা পরিচালিত মিউনিসিপ্যালিটি যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে জল সরবরাহ প্রকল্প চালাতে পারছেন। স্যানিটারি কমিশনের রিপোর্ট এবং লেফটনেন্ট গভর্নরের ভাষণে অন্তত সেই স্বীকারোক্তি আছে। এর পাশাপাশি মিউনিসিপ্যালিটি তার দাবিদাওয়া আদায়েও যথেষ্ট সরব। সুতরাং 'পৌর নাগরিকতা' গঠনের পথে অনেকটাই এগিয়েছে বর্ধমানবাসী।

অপ্রতুল জল সরবরাহ, গ্রাম-শহরের সংঘাত ও পৌর নাগরিক বর্ধমানবাসী

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জল সরবরাহ প্রকল্প কিছু নতুন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। আগের সমস্যাগুলি আবর্তিত হয়েছিল মূলত জলকর আদায়, প্রকল্প নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য বা জল সরবরাহ প্রকল্প পরিচালনজনিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এখনকার সমস্যা জলাভাব এবং তাকে কেন্দ্র করে গ্রাম ও শহরের সংঘাত।

এতদিন দামোদর নদীর জল বাঁকার মাধ্যমে পাঠিয়ে তাকে পরিশোধন করে শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা চলত। কিন্তু ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে বর্ধমান শহরবাসী তীব্র জলকষ্টের সম্মুখীন হন। দেখা যাচ্ছে বাঁকা নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস অবধি খুব শীর্ণ ধারায় জল প্রবাহিত হচ্ছে; মে মাসে এই জল প্রবাহ আরও কমে যাচ্ছে। বাঁকায় জল প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে জুজুটি গ্রামে দামোদর এবং বাঁকার মধ্যে যে জলের লকগেট আছে সেই অঞ্চলের আর একটু আগে বাঁকার পশ্চিম পাড়ের গ্রামগুলি বাঁকায় আরেকটি বাঁধ দিয়েছে। ফলে জলপ্রবাহ এত কমে গেছে। এমতাবস্থায় কমিশনাররা খুব বুদ্ধি করে সঞ্চিত জল থেকে জল সরবরাহের সময় কমিয়ে শহরে জলের জোগান বজায় রাখেন। ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপিল করা হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঐ গ্রামের বাঁধগুলি ভাঙার নির্দেশ দেন। এতে বাঁকায় জলপ্রবাহের কিছুটা উন্নতি হয়। তবে এই ঘটনা থেকে এই বিষয়টি খুব পরিষ্কার যে, খরার মরশুমে দামোদরের জল থেকে জল সরবরাহ প্রকল্প চালানো খুব অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

এই ঘটনা থেকে দু'টি বিষয় লক্ষ করার মতো। প্রথমত, জলের উৎস হিসেবে নদীর জলের পরিবর্তে অন্য কোনও উৎসের সন্ধান করা। আর সেক্ষেত্রে মাটির তলার জলই একমাত্র ভরসা। সুতরাং বর্ধমান শহরে জল সরবরাহের ইতিহাসের এক নতুন পালাবদলের ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। বর্তমানেও এই শহরে মাটির তলার জলই সরবরাহ করে মিউনিসিপ্যালিটি। দ্বিতীয়ত, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের এই জলসংকট আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী করে আমাদের। বর্ধমান শহরের সীমানায় প্রায় গায়ে লেগে থাকা গ্রামগুলির স্বার্থের সংঘাত। শহরবাসী কিছু পরিষেবার বিনিময়ে পুরোপুরি ভাবে পৌর নাগরিক। যেখানে পরিষেবা ব্যাহত হলে শুরু হয়ে যায় শহর ও গ্রামের সংঘাত। সুতরাং, উনিশ শতক এবং বিশ শতকের শুরুতে গ্রাম নিয়ে যতই তাত্ত্বিক আবেগপ্রবণতা থাক, বাস্তব অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা।

কলকাতা গঙ্গা নদীর তীরবর্তী শহর। এই নদীকে ঘিরে এখানকার মানুষ তাদের দৈনন্দিনতায় অভ্যস্ত। এই নদীর পবিত্রতার বিশ্বাস অন্য উৎসের জল ব্যবহার করতে বাধা দেয় এখানকার অধিবাসীদের। তাই এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি অনেকাংশেই ঠিক করে দিয়েছে এখানকার জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রকৃতি। অন্যদিকে, বর্ধমান গঙ্গা নদীর তীরবর্তী শহর নয়। তাই এখানকার অধিবাসীরা দৈনন্দিন কাজে গঙ্গা জল ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়। অন্যদিকে, দামোদর নদীও শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। দামোদর নদীর জল শহরে পাঠানো হয় বাঁকা নালার মারফত। সুতরাং, এক্ষেত্রেও শহরের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর জল সরবরাহের ধরন নির্ভর করছে। আবার ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের জলের অপ্রতুল যোগানে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি আভাস পেয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র দামোদরের জলে জল সরবরাহ প্রকল্প চালানো যাবে না। কারণ, দামোদর নদীতে খরার মরশুমে জলের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। প্রকৃতির খেয়ালখুশি অনুযায়ী পুরোনো পদ্ধতিরও কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হচ্ছে। সুতরাং জল সরবরাহ প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্য এক হলেও ভৌগোলিক বিভিন্নতায় প্রকল্পগুলি আলাদা হয়ে গিয়েছে।

ভৌগোলিক কারণ ছাড়াও বিভিন্নতার আরেকটি কারণ অবশ্যই সরকারি অর্থ সাহায্যের পরিমাণ। যা গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন রকম। বলাই বাহুল্য, কলকাতা শহরের স্থান এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে। কলকাতা শহরে প্রথম থেকেই নদীর জল পরিশোধন করে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ধমানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কলকাতা শহরে প্রথম থেকেই বাড়িতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ধমান শহরে তা হয়েছে বহু পরে। সুতরাং রাজধানী এবং মফস্বলের একটা পরিকাঠামোগত ব্যবধান রচিত হয়েই চলেছিল। আর্থিক অনুদান এই পার্থক্য রচনার প্রক্রিয়া জারি রেখেছিল।

বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ

বহরমপুরের জল সরবরাহ প্রকল্প নিয়ে ঔপনিবেশিক মহলে কথাবার্তা শুরু ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। কলকাতা শহরে পরিশোধিত জল সরবরাহ চালু হয়েছে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। বর্ধমান শহরে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ চালু হয়েছে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ। আর পরিশোধিত জল সরবরাহের সূচনা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং, খাতায় কলমে প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে জল সরবরাহ প্রকল্প চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। সার্বিক জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে ঔপনিবেশিকরা খুব সচেতন ভাবে উন্নত পরিশোধিত জল সরবরাহের কথা ভাবছেন মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে। যুক্তির দিক থেকেও এই দাবি মেনে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু, প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অর্থ বরাদ্দের সময় খুব সুচারু ভাবে কলকাতা এবং মফস্বল শহরগুলির মধ্যে পরিকাঠামোগত বিভিন্নতা রচিত হচ্ছে। এমনকি মফস্বল শহরগুলির মধ্যেও অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে থাকছে, গুরুত্বের ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক চয়ন। ভৌগোলিক বিভিন্নতাও প্রকল্পগুলির রূপায়ণ, পরিকাঠামো এবং কার্যকারিতায় বহুরূপতাই ফুটিয়ে তুলেছে বেশি। সঙ্গে আঞ্চলিক বিভিন্ন দাবিদাওয়াও প্রকল্প নির্মাতাদের মাথায় রাখতে

হয়েছে। কলকাতা, বর্ধমান এবং বহরমপুর এই তিনটি শহরের জল সরবরাহ প্রকল্পের তুলনামূলক আলোচনায় এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণ ও ঔপনিবেশিক অনুসন্ধান

বহরমপুর শহরে জল সরবরাহ প্রকল্প নিয়ে ব্রিটিশ আধিকারিক মহলে কথাবার্তা শুরু হয় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ। প্রকল্পটি কার্যকর করতে প্রায় দুই বছর লেগে যায়। তাও শেষ পর্যন্ত এর ব্যয় ভার নির্বাহ করেন কাশিমবাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী। বহরমপুরে জল সরবরাহ নিয়ে শুরুতেই খুব ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখান না ব্রিটিশরা। মহাফেজখানার নথি বহরমপুরকে বর্ধমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ, ক্রমবর্ধমান চরিত্রের শহর হিসেবে প্রতিভাত করেনি। বরং, নেতিবাচক চিত্রই তুলে ধরেছে বেশি। তাই জল সরবরাহ প্রকল্প যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। জল সরবরাহ প্রকল্পের রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে মহাফেজখানার নথি বহরমপুর শহর সম্পর্কে বলছে বহরমপুর মুর্শিদাবাদের সদর শহর। সেন্সাস অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ২৩৫১৫ মতো। তাই ২৫০০ লোকের জল সরবরাহের ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট। কারণ, খালি হয়ে পড়ে থাকা বাড়ি আর দোকানগুলি দেখে এটিকে একটি ক্রমবর্ধমান শহর বলা যায় না।[36]

বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ নিয়ে স্যানিটারি বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার A.E.Silk(এ.ই.সিল্ক) এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। ভাগীরথী নদীর গতি পরিবর্তনের ধরন এবং শহরের ভূমির ঢাল দেখে ব্রিটিশ আধিকারিকরা মতামত দেন, বহরমপুর শহরের উত্তরে গঙ্গার ওপর পাম্পিং স্টেশন তৈরি করলে ভাল হয়। এক্ষেত্রে বহরমপুর শহরের বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে পরিশ্রুত জলের সংযোগ ঘটারও ভয় নেই বিশেষ। জল সরবরাহ বিষয়ে সিল্ক বলেন, গঙ্গা থেকে অপরিশ্রুত জল তোলার জন্য ৫ এইচ.পি ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি পাম্প এবং পরিশ্রুত জল সরবরাহের জন্য ২৭ এইচ.পি ক্ষমতা বিশিষ্ট দু'টি পাম্প প্রয়োজন। জল সরবরাহের জন্য প্রায়

[36] MUNICIPAL DEPARTMENT, DECEMBEBER 1894, PROCEEDING NO.- 11

সাড়ে নয় মাইল লম্বা পাইপ লাইন দরকার। পাইপের একটি শাখা যাবে বহরমপুর শহরে। আরেকটি শাখা যাবে কাশিমবাজারের দিকে। প্রতিদিন আড়াই হাজার শহরবাসীর জন্য জনপ্রতি আট গ্যালন করে জল ধরলে মোট কুড়ি হাজার গ্যালন জল সরবরাহের সংকুলান এই ব্যবস্থায় হয়ে যাবে। এই প্রকল্পটিতে আনুমানিক খরচ হবে ২২১৮০০ টাকা মতো। এই খরচের সাপেক্ষে জনপ্রতি খরচ পড়ছে প্রায় ৯ টাকা। ঢাকার জল সরবরাহ প্রকল্পে এই খরচ পড়েছে জনপ্রতি ৫.১ টাকা আর বর্ধমান জল সরবরাহ প্রকল্পে এই খরচ জনপ্রতি ১১.২১ টাকা । পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে বর্ধমান জল সরবরাহে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।[37] মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট J.Kenedy(জে.কেনেডি), সিল্কের রিপোর্ট প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনারকে ফরোয়ার্ড করতে গিয়ে খুব পরিষ্কার করেই ব্যক্ত করেন, তিনি মিউনিসিপ্যালিটিকে খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে রেখেছেন বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ভাগলপুর বা বর্ধমানের মতো সাহায্য বহরমপুর পাবে না।[38] এখান থকে আমরা খুব সোজাসাপটা ভাবে বহরমপুর শহরের গুরুত্ব এবং ঔপনিবেশিকদের তরফে গুরুত্বের সাপেক্ষে বিভিন্ন শহরের মিউনিসিপ্যালিটির প্রতি বিভিন্ন রকম আচরণের চিত্রটি খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাই।

সরকারি তরফে এই সব আলোচনা চলার কয়েকদিনের মধ্যেই কাশিমবাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী দেবী প্রথমে অসরকারি ভাবে (বিভিন্ন সংবাদ পত্রে এই ঘোষণা প্রকাশিত হয়) এবং পরে সরকারি ভাবে ঘোষণা করেন তিনি বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্পের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।[39] মহারানি শুরুতেই ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দেন, তিনি তিন বা চার বছরে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর দাবি ছিল, জল সরবরাহ প্রকল্পটি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা বর্ধমান বা আরার মতো ভাল করে তৈরি করতে হবে।[40]

---

[37] MUNICIPAL DEPARTMENT, DECEMBEBER 1894, PROCEEDING NO.- 11

[38] MUNICIPAL DEPARTMENT, JULY 18,1894, FILE NO.- 134 M, PROCEEDING NO.- 15

[39] MUNICIPAL DEPARTMENT, JULY 9,1894, FILE NO.-M1-W/9, PROCEEDING NO.- 14

[40] MUNICIPAL DEPARTMENT, JULY 9,1894, FILE NO.-770, PROCEEDING NO.- 16

জলের উৎস বিচার: গঙ্গা জল বনাম গভীর নলকূপের জল

এরপর স্বর্ণময়ী দেবী জল সরবরাহ বাবদ সমস্ত টাকা মেটালে এ.ই সিল্ক জল সরবরাহ বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় কোন উৎস থেকে বহরমপুর শহরে জল সরবরাহ করা হবে? গঙ্গা নদীর জল? না গভীর নলকূপের জল? এই নিয়ে বেশ জটিলতার মুখে পড়তে হয় বহরমপুর জল সরবরাহ প্রকল্পকে। S.Rudolf(এস.রুডলফ্) এবং Mr. Norman(মি. নরম্যান) নামে দুইজন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৯-ই সেপ্টেম্বর স্নানের ঘাট থেকে জল নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁরা মতামত দেন, এই জল একেবারে ব্যবহারের অনুপযুক্ত, 'তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত'। এরপর স্যানিটারি কমিশন নিজের দায়িত্বে পরের বছর এপ্রিল মাসে জল পরীক্ষা করান এই পরীক্ষার রিপোর্টেও দেখা যায় গঙ্গার জল পরিশোধন না করে পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

গঙ্গা নদীর জল পানীয় হিসেবে ব্যবহারের জটিলতা দেখে বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জে.কেনেডি বলেন এর থেকে গভীর নলকূপের জল ব্যবহার করলে অনেক সহজ উপায়ে পানীয় জল পাওয়া যাবে। কিন্তু এতে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা বেঁকে বসেন। তারা বলেন এই যাবৎকাল শহরবাসী গঙ্গার জল ব্যবহার করে এসেছে। গঙ্গার জলকে তারা পবিত্র হিসেবে গণ্য করে। তাই গঙ্গা জলের পরিবর্তে অন্য জল সরবরাহ করা হলে সাধারণ মানুষ তা ভাল ভাবে নেবে না। অন্য দিকে স্বর্ণময়ী দেবীর তরফ থেকেও জানানো হয় গঙ্গার জল ব্যবহার না করলে কোনও টাকা দেওয়া হবে না। পরিস্থিতির চাপে স্যানিটারি কমিশনার এইচ.জে. ডাইসন বহরমপুর শহরের উত্তরে ফরাস ডাঙ্গা থেকে জল সরবরাহ করে পরীক্ষা করেন। তিনি এই জলকে 'অর্গানিক্যালি সেফ' বলে ঘোষণা করেন। ডায়সন অবশ্য স্বীকার করেন ধর্মীয় অভ্যেসের খাতিরে তিনি এই গঙ্গা নদী থেকে জল সরবরাহ বিষয়টি মেনে নিচ্ছেন।[41] সুতরাং স্বর্ণময়ী দেবীও জল সরবরাহ প্রকল্পের ব্যয়ভার বহনের পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।

[41] MUNICIPAL DEPARTMENT, MARCH,1897, FILE NO.- M 1-W/5, PROCEEDING NO.-7

বহরমপুর জল সরবরাহ প্রকল্পে এবার জটিলতা দেখা যায়, শহরবাসীর থেকে কী ভাবে জলকর আদায় করা হবে, তা নিয়ে। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান, বর্ধমান, ঢাকা বা ভাগলপুর জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের জন্য সরকারের থেকে বহু অর্থ সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু বহরমপুর জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারকে কোনও ব্যয় ভার গ্রহণ করতে হয়নি। তাই শহরের দরিদ্র মানুষজনের কথা মাথায় রেখে সরকার যদি এই প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন তাহলে খুব ভাল হয়। নতুবা কোনও স্থানীয় জমিদার বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের থেকে যদি এই অর্থ পাওয়া যায় তাহলে খুব ভাল হয়। জলকর ধার্য করা হলে বহরমপুর শহরে মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স সাড়ে চার টাকা থেকে বেড়ে ছয় টাকায় দাঁড়াবে। যা বহন করা দরিদ্র নাগরিকদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।[42] কিন্তু বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে কোনও ভাবেই জলকর মকুব করা যাবে না। স্থানীয় কোনও জমিদারের কাছ থেকেও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ টাকা নেওয়া যাবে না।[43] এখানে আমরা আবার সেই করের বিনিময়ে পরিষেবা ভোগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ‘পৌর নাগরিকতা’ গঠনের প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি।

এরপর বহরমপুর জল সরবরাহ প্রকল্প সম্পর্কে আবার সরকারি নথি, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের স্যানিটারি কমিশনের রিপোর্ট। এর মাঝে বর্ধমান জল সরবরাহ প্রকল্প যেমন বহু ঘটনার সাক্ষী হয়েছে, তেমন বহরমপুর জল সরবরাহ প্রকল্পের চলার পথ ততটা ঘটনাবহুল নয়। সমস্যাগুলির ধরণও আলাদা। অন্যদিকে স্যানিটারি কমিশনের রিপোর্টের মাপকাঠিগুলিও বর্ধমানের থেকে আলাদা।

---

[42] MUNICIPAL DEPARTMENT, DECEMBER,,1894, FILE NO.- M 1-W/9, PROCEEDING NO.-19

[43] MUNICIPAL DEPARTMENT, NOV 7,1894, FILE NO.- M 1-W/9, PROCEEDING NO.- 20

জল সরবরাহ প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ

১৯০৩ সালের স্যানিটারি কমিশন তার রিপোর্টে বলেছে, এই জল সরবরাহ প্রকল্পের রিপোর্ট খুব একটা 'অসন্তোষ জনক' নয়। তবে পরিকাঠামোগত ভাবে কিছু বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এই শহরের ভৌগোলিক অবস্থান, মাটির ধরন এবং গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তন এই জল সরবরাহ প্রকল্পে কিছু বিশেষ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের বন্যা, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইঞ্জিন এবং বয়লার রাখার ঘরে বেশ বড় ফাটলের সৃষ্টি করে। অবিলম্বে এর মেরামতি প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়া বন্যার ফলে বেশ কিছু পাইপে পলি জমে গেছে। সেগুলি পাল্টানোর ব্যবস্থা করাও আশু প্রয়োজন হয়ে ওঠে। এছাড়া সেটলিং ট্যাঙ্কে ইঁদুর কিছু বড় বড় গর্ত তৈরি করেছে সেগুলি সারানোর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। পরিষ্কার জল রাখার ট্যাঙ্কে প্রায়শই গঙ্গা নদীর নুড়ি বালি ঢুকে যাচ্ছে। সে বিষয়েও নজর দিতে বলা হয় স্যানিটারি কমিশনের রিপোর্টে ।[44]

ভৌগোলিক বিভিন্নতা, বাস্তব পরিস্থিতি ও অর্থ বরাদ্দের বিভিন্নতায় কলকাতা, বর্ধমান ও বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প

আমরা দক্ষিণবঙ্গের তিনটি জেলা কলকাতা, বর্ধমান এবং বহরমপুরের জল সরবরাহ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম এক এক জায়গায় এই প্রকল্প নির্মাণ, প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন এক এক রকম। কলকাতায় জল সরবরাহ প্রকল্প প্রথম নির্মিত হয়। পুকুরের জল পরিশোধন করে পাইপের মাধ্যমে পাঠানো হবে, না গঙ্গা নদীর জল সেই নিয়ে ঔপনিবেশিকদের মধ্যেই বহু বাদানুবাদ চলে। গঙ্গা নদীতে কোথায় পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে সেই নিয়েও একাধিক মতামত দেখা যায়। জল ইটের অ্যাকুয়াডাক্টের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে না লোহার পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে, তা নিয়েও

[44] MUNICIPAL DEPARTMENT, JANUARY,1903, FILE NO.- M 1-W/3, PROCEEDING NO.- 1-3

ঔপনিবেশিক মহলে এক একজন এক এক রকম মতামত দেন। এই সব প্রারম্ভিক টালবাহানা, স্থানীয় মানুষের জল ব্যবহার নিয়ে ছুঁতমার্গ কাটিয়ে কলকাতা জল সরবরাহ প্রকল্পের যাত্রা শুরু। এখানে সমস্যাগুলি মূলত কলকাতা শহরের সম্প্রসারণের সঙ্গে জল সরবরাহ প্রকল্পকে কী ভাবে অভিযোজিত করা যায় তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ব্রিটিশদের রাজধানী কলকাতা। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই অর্থ বরাদ্দও হয়েছে বেশি।

বর্ধমান শহরে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটি, তার পরিষেবা এই সব আদর্শগত তাত্ত্বিক কথাবার্তার পাশাপাশি কাজ করেছে কিছু বাস্তব সমস্যা; বলা ভাল আতঙ্ক। বর্ধমান জ্বরের ভয়, জলবাহিত জীবাণুর ভীতি বর্ধমান জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। নিকটবর্তী দামোদর নদী শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। খাল খনন করে দামোদরের জল শহরের মাঝ বরাবর প্রবাহিত হতে থাকা বাঁকা নালার মধ্যে চালনা করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সুতরাং প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। বাঁকা নালার এতদিন যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। বর্জ্য পদার্থে পরিপূর্ণ এই শীর্ণ খাতকে জল সরবরাহের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা, খাল খননের জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কিছু আঞ্চলিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বর্ধমান জল সরবরাহ প্রকল্প। বর্ধমান জ্বরের ভীতি, কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং ব্রিটিশদের কাছে গুরুত্বের কারণে এই শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প সব সময় কড়া নজরদারিতে থেকেছে। ফিল্টার বেডগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, বায়োলজিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট এই সব নিয়ে স্যানিটারি কমিশন বারবার প্রশ্ন তুলেছে। এরপর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বর্ধমান জল সরবরাহ প্রকল্প একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। দামোদরের জল সংকট। এই প্রসঙ্গে দামোদরের পশ্চিমপাড়ের কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতও এসে পড়ে। এই জল সরবরাহ প্রকল্পটি তাই দামোদর নদের খেয়ালখুশির ওপর একান্ত নির্ভরশীল।

অন্যদিকে বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প ও তার রক্ষণাবেক্ষণের ধরন এর থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। ব্রিটিশরা জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের শুরুতেই এই শহরের চরিত্র সম্পর্কে বেশ নেতিবাচক মনোভাব দেখান। শেষ পর্যন্ত মহারানির অনুদানে তৈরি হয় এই জল সরবরাহ প্রকল্প। রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সমস্যার মুখে পড়তে হয় এই জল সরবরাহ প্রকল্পটিকে। গঙ্গা নদীর ভাঙন এবং বন্যার প্রভাবে প্রায়শই পাম্পের ঘর বা ফিল্টার বেডের ঘরে ফাটল দেখা দেয়। এই ফাটল দিয়ে ইঁদুর অন্যান্য পোকামাকড়, নুড়ি পাথর বালি ফিল্টার বেড ও রিজার্ভারে ঢুকে পড়ছে।

সুতরাং ভৌগোলিক বিভিন্নতা এবং প্রকৃতির খেয়াল খুশি জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রচনা করেছে। তাই ব্রিটিশরা যে মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে শহরগুলিতে জল সরবরাহ এবং সেই পরিষেবা বাবদ কর আদায়ের সরল সমীকরণের হিসেব তৈরি করেছে তাকে জটিল করে তুলেছে আরও আনুষঙ্গিক কিছু অবিচ্ছেদ্য শর্ত। আর সেই জটিল হিসেব 'পৌর নাগরিকতা' গঠনের প্রক্রিয়াও ক্রমশ জটিলতর হয়েছে।

তিনটি শহরে মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে জল সরবরাহ ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে জল সরবরাহ প্রকল্পের এক বিবর্তনের পথও পেরিয়ে এলাম আমরা। যেখানে কলকাতায় পাইপের জলের সঙ্গে দেশীয় জনতাকে অভ্যস্ত করাতে গিয়ে বেশ নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে ব্রিটিশদের। তার জন্য ব্রাহ্মণদের জল সরবরাহ প্রকল্পে বেশি মাত্রায় নিযুক্ত করা এই সব নানারকম পন্থার আশ্রয় নিতে হয়েছে। বর্ধমান শহরে জল নিয়ে এই ছুঁতমার্গ অনেক কম। কারণ, গঙ্গা থেকে এই শহর বেশ দূরে। তবে জল সরবরাহ প্রকল্পের উচ্চ হারে কর নিয়ে শহুরে জনতার একাংশ থেকে বেশ তীব্র প্রতিবাদ উঠে এসেছে। বহরমপুরে এই জাতীয় কোনও প্রতিবন্ধকতাই দেখা যায়নি। বরং বর্ধমান বা আরার জল সরবরাহ প্রকল্প দেখে আপ্লুত হয়ে কাশিমবাজারের মহারানি নিজেই স্বেচ্ছায় এই প্রকল্পের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন।

শহরের নাগরিকদের পক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান জলকর মকুব করার এবং ব্রিটিশদের এই প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহন করার আবেদন করলে তা ধোপে টেকে না। মহরাণী স্বর্ণময়ীর অবশ্য এক্ষেত্রে একটিই শর্ত আরোপ করেছিলেন, পাইপের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর জলই সরবরাহ করতে হবে। বহরমপুরবাসী ততদিনে কলকাতা, বর্ধমান ইত্যাদি শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প দেখে এই ব্যবস্থার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। পরিশোধিত জল সার্বিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং শহুরে জীবন-যাপনের অন্যতম শর্ত। অন্যদিকে গঙ্গার জলের ধর্মীয় মাহাত্ম্যকেও অস্বীকার করা যায় না। তাই পাইপের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর জল পরিশোধন করে সরবরাহ করার ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিধান এবং 'পৌর নাগরিকত্ব' গঠনের প্রক্রিয়াকে এক রকম মানিয়েই নিয়েছে শহরবাসী।

তবে মনের দোলাচল কী অত সহজে বোঝা যায়? রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ' গল্পটি লিখছেন ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ। রোগশয্যায় নীরজা। স্বামী আদিত্যকে ফুলের বাগানের দেখভালে সহায়তা করতে এসেছে দূর সম্পর্কীয়া বোন সরলা। সরলার অস্তিত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ অসহ্য ঠেকছে নীরজার। প্রতিদিন সকালে আদিত্য নীরজাকে বাগানের বাছাই করা ফুল দিয়ে যায়। একদিন সকালে আদিত্যের বদলে 'একটি পাপড়ির আগায় বেগুনি রেখার' শুভ্র অর্কিড সরলা দিয়ে যায় নীরজাকে। জানায় আদিত্যকে হঠাৎ নিউ মার্কেটের দোকানে যেতে হয়েছে বলে সে নিজে দিয়ে যেতে পারেনি। আদিত্যর মনে এল না "ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজে হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।"[45]

অথচ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনেই বেশি সময়ের জন্য থাকেন। এখানকার জলের কষ্ট, খরা এবং কুঁয়োতে জল শুকিয়ে যাওয়ার কথা সর্বজন বিদিত। নবনীতা দেবসেন এক স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, তাঁর বিবাহের দিন নির্ধারিত হয়েছিল বর্ষাকালে। কারণ

[45] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ-৪৬৮, পৌষ ১৪১৭,বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতনে কুঁয়োতে তখন জল থাকবে। যাই হোক এহেন পরিস্থিতিতে নলের মাধ্যমে জলের সরবরাহ দেখে রবীন্দ্রনাথের আপ্লুত হয়ে যাওয়ার কথা। ষাট বছরের অধিক সময় পেরিয়ে আসা কলকাতার জল সরবরাহ প্রকল্পকে এমন নেতিবাচক উপমা হিসেবে ব্যবহার করা 'পৌর নাগরিকত্ব' গঠনের জটিল রূপকেই প্রকাশ করছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শহরের জল সঞ্চালনে দূষিত জল নিষ্কাশন: কলকাতার প্রতিতুলনায় কৃষ্ণনগর

খাওয়ার জলের না হয় একরকম বন্দোবস্ত হল। গৃহস্থালির প্রয়োজনের জলের ব্যবস্থাও মোটামুটি বোঝা গেল। মিউনিসিপ্যালিটির জলের অভ্যেসে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পরে সাতদিন কোনও কারণে জল বন্ধ থাকলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে ঠিক-ই, তাও জল কিনে বা টিউবওয়েল থেকে জল তুলে যেমন হোক কোনও মতে দিন গুজরান করার কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির যে পরিষেবা ছাড়া বিশেষত শহরাঞ্চলে একটি দিনও কাটানো অসম্ভব; তা হল ড্রেন ব্যবস্থার পরিষেবা। বাড়ির বাথরুম বা রান্নাঘরের কাজে ব্যবহৃত নোংরা জল যদি কোনও কারণবশত নিষ্কাশন করা না যায়, তাহলে পরিস্থিতি সত্যিই অননুমেয়। একটু গ্রামঘেষা মফস্বল শহর যেখানে তাও বাড়ির আশপাশে নিচু জলাভূমি, পুকুর, মজে যাওয়া নদীখাত বা নদী আছে, সেগুলি সাময়িক ভাবে প্রয়োজন মেটাতে হয়ত সক্ষম হবে। কিন্তু পুরোদস্তুর শহরে এই রকম পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করা খুব কঠিন। খোদ কলকাতা শহরের বুকে এই রকম পরিস্থিতির সঙ্গে একদিন সহবাস করতে হলেই মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেনের উপযোগিতার কথা মালুম হবে।

আগে আমরা উনিশ শতকের উদারনীতিবাদের ব্যক্তি-বস্তু-মতামতের স্বাধীন চলাচল বিষয়ে আলোচনা করেছি। সতেরো শতকে মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পরে ক্রমশ শহরকে দেহ হিসেবে কল্পনা করে জল সঞ্চালিত করার দৃষ্টান্ত দেখেছি ইউরোপে। জল সঞ্চালনের প্রকল্প কীভাবে উপনিবেশে প্রযুক্ত হল তাও আলোচনা করেছি। বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু জেলার সদর শহরভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পটির বাস্তব রূপায়ণে অঞ্চলভিত্তিক তারতম্য এবং প্রকল্প পরিচালনায় মিউনিসিপ্যালিটির ভূমিকা আলোচনা

করেছি। দেখেছি মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত শহর ভিত্তিক পরিষেবার সঙ্গে নাগরিকদের অভ্যস্ত হওয়ার বিভিন্ন পর্বে 'পৌর নাগরিকত্ব' গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত।

এখনও অবধি জল সঞ্চালনের একটি দিক আমরা দেখলাম। এখনও আরেকটি দিক অর্থাৎ দূষিত জল নিষ্কাশনের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হয়নি। এখন ছোট শহরগুলিতে ড্রেনের মাধ্যমে দূষিত জল নিষ্কাশন কী ধরনের পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তা বোঝার চেষ্টা করব। অবশ্যই কলকাতার সাপেক্ষ এই আলোচনায় আসবে। কারণ কলকাতার মডেল মফস্বলগুলিতে প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন ঔপনিবেশিকরা। তাই কীভাবে আঞ্চলিকতা, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং পরিচালনায় পার্থক্যের সূচনা করেছিল এই বিষয়টি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হলে পরিষেবাকেন্দ্রিক 'পৌর নাগরিকতা' গঠনের জটিল প্রক্রিয়াটির বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে ধারণা পাব।

প্রতিষ্ঠিত একটি শহরে ড্রেন নির্মাণ করতে হলে বেশ কতকগুলো বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমেই বলতে হয়, শহরের পূর্ববিন্যস্ত পাব্লিক স্পেসে নতুন অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ড্রেনগুলিকে বিন্যস্ত করা। বর্তমান রাস্তাগুলির মধ্যে কীভাবে ড্রেন তৈরি করা হবে তাও বেশ সমস্যাবহুল হয়ে ওঠে, বিশেষত রাস্তা সংকীর্ণ হলে। ঢাকা দেওয়া পাকা ড্রেন নাকি কাঁচা ড্রেন? কোন ড্রেন বেশি কার্যকরী ভাবে দূষিত জল অপসারণ করতে সক্ষম হবে সেই নিয়েও বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়। এরপরের প্রশ্ন হল বাড়িগুলিকে কীভাবে ড্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে? শহর ভেদে দূষিত ড্রেনের জল কোথায় অপসারণ করা হবে সেই নিয়েও নানা রকম মতামত এবং মতভেদ লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত প্রশ্নগুলির সমাধানসূত্র খোঁজার পথেই শহরগুলিতে ড্রেন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত দক্ষিণবঙ্গের দু'টি জেলা সদর কলকাতা এবং কৃষ্ণনগর শহরের ড্রেন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব। দু'টি শহরের তৈরি হওয়া এবং বিন্যাস একেবারে আলাদা রকম। কলকাতা ঔপনিবেশিক স্বার্থে নতুন তৈরি হওয়া শহর। আর

কৃষ্ণনগর শহরটি অনেক পুরোনো। সুতরাং এই শহরের প্রতিষ্ঠিত কাঠামোয় ঔপনিবেশিক মডেল হুবহু প্রতিষ্ঠা করা বেশ পরিশ্রমসাধ্য কাজ। আর শহরে বর্জ্য যেখানে ড্রেনের মাধ্যমে নিক্ষেপ করা হবে, সেই অঞ্চলের প্রচলিত মালিকানার সঙ্গে সমঝোতায় আসাও বেশ দুরূহ ব্যাপার।

এই সমস্ত কিছুর পরেও শহরের সুষ্ঠু ড্রেন ব্যবস্থা নির্মাণ করা— যার দ্বারা দৈনন্দিন দূষিত জল নিষ্কাশনের সঙ্গে বর্ষার অতিরিক্ত জলোচ্ছ্বাসও নিষ্কাশিত হতে পারবে যথেষ্ট কঠিন। কারণ ভূমির ঢাল, রাস্তার ব্যাপ্তি (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে), বাস্তব পরিস্থিতি সব কিছু মাথায় রেখে ইঞ্জিনিয়ারদের বহু হিসেব নিকেশ সত্ত্বেও, প্রকল্পটি মূর্ত রূপ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সঠিক ভাবে বোঝা সম্ভব হয় না, সেটি কীভাবে এবং কতটা বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম।

এরপরে দ্বিতীয় আর একটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, ড্রেন ব্যবস্থার যথাযথ কার্যকারিতার ক্ষেত্রে। শহরের অভ্যন্তরে বা অনতিদূরে নিম্ন জলাভূমিতে যেখানে ড্রেনের জল জমা হয়, সেখান থেকে সেই জল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিকটবর্তী নদীতে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতা বা কৃষ্ণনগর দু'টি ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলার সদর শহরগুলি কোনও না কোনও নদীর তীরে অবস্থিত। সুতরাং সার্বিক ভাবেই প্রত্যেক শহরের ড্রেন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই নীতি গৃহীত হয়েছিল একথা বলাই যায়। এই প্রকল্পে ড্রেন ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর শেষপর্যন্ত নির্ভর করছে। তা হল শেষ পর্যন্ত যে নদীতে ড্রেনগুলি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তার বহন ক্ষমতা।

সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন পরিষেবার এতগুলি শর্তের সোপান পেরিয়ে নাগরিক অন্তরঙ্গের অঙ্গ হয়ে ওঠার পথ যথেষ্ট ঘটনাবহুল এবং চ্যালেঞ্জিং। এবং তার সঙ্গে 'পৌর নাগরিকতা' গড়ে ওঠার সঞ্চারপথও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। শহরের গোলকধাঁধায় শিরা-ধমনীতে (ড্রেন ও জলের পাইপ) নিরন্তর সঞ্চালনের স্পন্দন তো এই পৌর নাগরিকতার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়।

কলকাতা শহরে ড্রেন বিন্যাস প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক অনুসন্ধান

প্রথমে আলোচনা করব, কলকাতা শহরের ড্রেন পরিষেবা নিয়ে। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই কলকাতা শহরে বারবার জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। দেশীয় জনতার জন্য ফিভার হসপিটাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সময় জেমস মার্টিন নামক নেটিভ হসপিটালে কর্মরত এক ডাক্তার কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য ক্রান্তীয় জলবায়ুর পাশাপাশি দায়ী করেন শহর পরিষ্কার রাখার যথেষ্ট পরিকাঠামোর অভাবকে। এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শহরের স্যানিটেশনের ওপর জোর দেন। সেই প্রসঙ্গে ড্রেন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে।

উনিশ শতকে কলকাতা শহরে কলেরার প্রাদুর্ভাব আবার নতুন করে শহরের স্যানিটেশন রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে। ওয়েলেসলির আমলের 'Dual city'-র তত্ত্ব আর সেভাবে ধোপে টেকে না। কারণ কলেরা রোগটি শুধুমাত্র দেশীয় জনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ব্রিটিশরাও বেশ অনেকে এই রোগে কাবু হয়ে পড়েন। মাছি বাহিত এই রোগটি মোকাবিলা করার জন্য সার্বিক ভাবেই শহরের বর্জ্য নিষ্কাশন-ড্রেন ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্ব পায়। ইশিতা পাণ্ডে দেখিয়েছেন শহরে বর্ণগত বা সাংস্কৃতিক বিভাজনের কঠোর বিভাজন রেখা ক্রমশ রোগের মোকাবিলায় আবছা হয়ে যেতে শুরু করল।

ঈশিতা পাণ্ডে কলকাতার প্রেক্ষাপটে তাই বলেছেন, " Sanitation thus came to be attached to a new moral and social order and to good government."[1]

ইতিমধ্যে শহরের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে ইংল্যান্ডের শহরগুলিতে জল সঞ্চালনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। উপনিবেশের রাজধানী কলকাতাতেও সেই মডেলটিই প্রযুক্ত হল। দুর্গন্ধের সঙ্গে রোগ

---

[1] Pande, Ishita, *Medicine , Race And Liberalism in British Bengal, Symptoms Of Empire*, Abingdon, Routledge, 2010, pp-34

ছড়িয়ে পড়ার সমীকরণ খুঁজতে ড্রেন ব্যবস্থার প্রকল্প তাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কলকাতাতে কীভাবে পরিষ্কার জল দিয়ে ড্রেনগুলি ফ্লাশ করা যায়, সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা বা কোথায় জল জমে থাকে সেই বিষয়েও অনুসন্ধান শুরু হয়।

James Princep(জেমস প্রিন্সেপ) ফিভার হসপিটালের রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, "Objection and complaints have been heard against the offensive odour from the tunnel drains which pass to the river, one along Espalnade Row, another through Tank Square. The nuisance here is confined to the dry weather, when the flow is next to nothing. The modes of obviating it are simple—Pass a scouring current now and then, at low water, from the aqueduct into it, so that no bad air shall escape upward.[2]

ড্রেন বিন্যাসের ফিভার কমিশনের রিপোর্টে Lt. Abercrombie (লেফটেন্যান্ট অ্যাবারক্র্যাম্বি) Capt.Thomas(ক্যাপ্টেন থমাস)-এর কলকাতার ড্রেন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তাতেও দেখা যায় তিনি জেমস প্রিন্সেপের সপক্ষেই কথা বলছেন।

তিনি বলেন, "As a plan to carry off the filth of the Town, as well as the water, I approve of in general. The River flows off by his plan, through the whole sewers, except at the season when it is at the highest...There is to be a continual flow from the river."[3]

ড্রেন বিন্যাসের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বিবিধ মতামত

শহরের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উন্নতির স্বার্থে, কলেরার অবাধ ছড়িয়ে পড়াকে প্রতিহত করতে শহর কলকাতার ড্রেন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বেশ উদগ্রীব হয়ে

[2] Fever Hospital, vol-3, page-117

[3] Ibid, page-62

ওঠে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুতে আরও দ্রুত হারে বর্জ্য পদার্থের পচন ও সেই সঙ্গে দূষণ ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়া ঔপনিবেশিকদের বিচলিত করে তোলে। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে Justices of the peace for Calcutta দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার Mr. Clark কলকাতা শহরের ড্রেন ব্যবস্থা নিয়ে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করেন। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল শহরের প্রান্তে জমা হওয়া নোংরা আবর্জনা এবং এগুলি থেকে নির্গত দূষিত দুর্গন্ধ নিরসনের যথাযথ ব্যবস্থা করা। ক্লার্ক তাঁর পরিকল্পনা করার সময় শহরের ভূ-প্রকৃতির ওপর বিশেষ ভাবে নজর দেন। ক্লার্ক লক্ষ করেন শহরের ঢাল পূর্ব দিক বরাবর লবণাক্ত জলের হ্রদের দিকে। তিনি তাই শহরের ড্রেন গুলিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা করেন। শহরের পশ্চিম দিক বরাবর হুগলী নদী বয়ে চলেছে। তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক বরাবর তিনি ড্রেনগুলিকে বিন্যস্ত করেন। শহরের পশ্চিম থেকে পূর্বে অর্থাৎ নদী থেকে শুরু করে পূর্ব দিক বরাবর মাটির তলায় মোট পাঁচটি ড্রেন তৈরির কথা বলেন। সমস্ত ড্রেনগুলিই ধর্মতলা স্ট্রিটের পরে সারকুলার রোড বরাবর বিন্যস্ত হবে এমন পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। প্রতিটি ড্রেনেই মাইলে দুই-তিন ফুট ঢালু করার কথা বলেন। এতে তিনি ভেবেছিলেন হুগলি নদীতে যখন জোয়ার হবে, সেই জলোচ্ছ্বাসে ড্রেনগুলির নোংরা জল নিষ্কাশিত হয়ে যেতে পারবে। এই পাঁচটি ড্রেনকে First Class ড্রেন বলে চিহ্নিত করা হল। এরপর Second Class ড্রেনগুলিকে বিন্যস্ত করা হল। সেগুলিকে প্রতি মাইলে ছয় ফুট ঢালু রেখে First Class ড্রেনগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হল। ড্রেনগুলির ঢাল ঠিক থাকলেই সেগুলি স্বাভাবিক বহমানতার নিয়মেই পরিষ্কার থাকবে, এমনটা ভেবেছিলেন ক্লার্ক। এই ড্রেনগুলিকে ক্লার্ক শহরের প্রধান প্রধান রাস্তার তলদেশে বিন্যস্ত করেছিলেন। এছাড়া ড্রেনগুলির পরিকল্পনা এমন ভাবে করেছিলেন যাতে সমগ্র শহর বেশ কিছু বর্গাকার এককে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই Second Class ড্রেনগুলিতে Third Class ড্রেনগুলি নিক্ষিপ্ত হয়। এই Third Class ড্রেনগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাইপের মাধ্যমে পরিবাহিত হত। খুব সংকীর্ণ রাস্তায় বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য পাইপ

ব্যবহার করা হয়।[4] ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ড্রেন সম্প্রসারিত হয়েছিল যথাক্রমে ৫ মাইল, ১১.৭৫ মাইল এবং ১০ মাইল। পরে ড্রেন ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত হয় এবং এই তিন ধরনের ড্রেন যথাক্রমে ১০.৭৫ মাইল, ২৩ মাইল ও ৭৯ মাইল এলাকা জুড়ে সম্প্রসারিত হয়।

উত্তর কলকাতাতে আদৌ ড্রেন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে কি না; বা হলেও কীভাবে তা সম্ভব, সেই নিয়ে বেশ একটা সংশয়ের সম্মুখীন হন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা। তবে ক্লার্ক পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে বেশ আশাব্যঞ্জক কথাই বলেন তাঁর রিপোর্টে। বলেন এখানকার সমস্ত রাস্তা এবং তার ধারে বিন্যস্ত বিল্ডিংগুলির একটি নিজস্ব চরিত্র আছে। তিনি বলেন এখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি বুঝেছেন ড্রেন তৈরি হলে বিল্ডিংগুলির ক্ষতির কোনও আশু সম্ভাবনা নেই। তবে এই বিষয়ে আগে থেকে কিছু বলাও অবশ্য বেশ কঠিন তা স্বীকার করে তিনি একটি সতর্কবার্তা দেন। তিনি বলেন, প্রকল্পটি নির্মিত হলে এই ব্যাপারটি সম্পর্কে পরিষ্কার চিত্র পাওয়া সম্ভব হবে।[5]

ক্লার্ক তাঁর পরিকল্পনায় বলেন, ড্রেনগুলি মূলত তিন ধরনের জল পরিবাহিত করবে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ জল, গৃহস্থালির জল এবং বৃষ্টির জল। ক্লার্ক বলেন কলকাতায় মাটির এত কাছাকাছি জলের উপস্থিতি ড্রেন ব্যবস্থার পক্ষে খুব সমস্যাজনক। এই জলই বাস্পায়িত হয়ে বাড়িগুলিতে ড্যাম্পের সৃষ্টি করবে। গভীর এবং চওড়া ভাবে ড্রেনগুলি বিন্যস্ত করলে এই ড্রেন থেকেই বাস্পায়নের প্রক্রিয়াটি হবে। ফলে বাড়িগুলি কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[6]

ক্লার্কের এই পরিকল্পনার অনেকেই সমালোচনা করেন। এই পরিকল্পনাটির বিরুদ্ধে বলা হয়, ক্লার্কের পরিকল্পনা মাফিক মাটির নীচের ড্রেন ব্যবস্থাটি বিস্তর খরচ সাপেক্ষ। বলা হয় মাটির

---

[4] W. Clark, *The Drainage Of Calcutta*, A Paper read at the Bengal Social Science Congrss, held at the Town Hall, Calcutta, on the 2nd February 1871, Calcutta, Thacker, Spink and Co., 1871, p-10

[5] Ibid., p-11

[6] Ibid., p-12

উপরে ড্রেন নির্মাণ করলে এর থেকে অনেক কম খরচে হয়ে যাবে। ক্লার্ক এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দিনে একবার একঘণ্টা পরিষ্কার জল প্রবাহিত করে ড্রেনগুলি পরিষ্কার করলেও বাকি তেইশ ঘণ্টায় এগুলি কার্যত আবর্জনার স্তূপে পর্যবসিত হবে। বিশেষ করে দরিদ্ররা যে সব অঞ্চলে থাকে ড্রেনগুলি সেই অঞ্চল অতিক্রম করে আসলে তো কথাই নেই। এই আবর্জনার স্তূপ থেকে যে দুর্গন্ধ নির্গত হবে তার মোকাবিলা করা খুবই কঠিন।[7]

ক্লার্ক কলকাতার ড্রেন ব্যবস্থা নির্মাণের যে রূপরেখাটি তৈরি করেছিলেন সেটিকে বেশ আধুনিকই বলা যায়। তিনি ড্রেনগুলিতে প্রবাহ যাতে বন্ধ না হয়, সেই জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা করেন। তিনি ড্রেনগুলি পরিষ্কার করার জন্য প্রতি এক হাজার ফুট অন্তর 'Side Entrance' এবং দু'শ ফুট অন্তর 'Man-hole' রাখার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া ড্রেনগুলিতে 'Ventilating grid' রাখারও ব্যবস্থা করেন, যাতে বায়ু চলাচল করতে পারে ড্রেনগুলিতে।[8]

ক্লার্কের ড্রেন ব্যবস্থার সঙ্গে এটিকে পরিষ্কার রাখার স্বার্থে জল সরবরাহ ব্যবস্থাও খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। এছাড়া এই ড্রেন ব্যবস্থায় বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য পূর্ব দিকের লবণাক্ত জলের হ্রদ অঞ্চলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বেন্টিঙ্কের সময় ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে এই জলমগ্ন অঞ্চলটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সদর্থক কিছু হয় না। ক্লার্কের পরিকল্পনায় এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিগত অবস্থানকে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়।

খরচের কথাটি বাদ দিলেও ক্লার্কের পরিকল্পনাটি নিয়ে আরও নানান প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন মহলে। Dr. Chevers(ড: শেভার্স) বলেন এই পরিকল্পনাটি স্বাস্থ্যসম্মত নয় একেবারেই। বরং বেশ ত্রুটিপূর্ণ। তিনি বলেন যারা ম্যানহোলের মাধ্যমে ড্রেনে নেমে পরিষ্কার করবে তাদের অবস্থা হবে খুবই সঙ্গিন। এছাড়া বর্ষাকালে ড্রেনের জলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রেও

[7] Ibid., p-12

[8] Ibid., p-14

পরিস্থিতি বেশ বিপজ্জনক। এছাড়া বেলেঘাটা ক্যানেলে সর্বপ্রথম নোংরা জল পতিত হওয়ার কথা বলা হয়। সেভার্স বলেন, সেখান থেকে এই অঞ্চলে দুর্গন্ধ ও নোংরা জলের মাধ্যমে দূষণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়া সেভর্স লবণাক্ত জলের হ্রদে শহরের সমস্ত নোংরা পতিত হওয়ার বিষয়টির বিরুদ্ধেও সওয়াল করেন।

H. Leonard(এইচ. লিওনার্ড) সার্বিক ভাবে ক্লার্কের প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনাগুলির পর্যালোচনা করেন। তিনি প্রথমেই বলেন, প্রকল্পটি খরচসাপেক্ষ হলেও শহরবাসীর দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যোন্নতির কথা মাথায় রাখলে এই প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে কার্যকারী। ইতিমধ্যেই অভিযোগ ওঠে কলকাতার ভূ-প্রাকৃতিক গঠনের কারণে এখানে ড্রেনগুলির স্বাভাবিক ঢাল বেশ কম। তাই অচিরেই এগুলি জমা জলের বদ্ধ জলায় পরিণত হবে। এছাড়াও বলা হয় ঢাকা ড্রেনগুলি যখন ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে পরিষ্কার করা হবে তখন প্রচণ্ড দুর্গন্ধ নির্গত হবে। লেনার্ড অবশ্য বলেন ড্রেনগুলিতে যাতে নোংরা জল জমতে না পারে সেই জন্য এন্টালিতে পাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ড্রেনের জমা নোংরা বার করা যায়। এই পাম্পটি বিকল হলে যাতে কোনও ভাবেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেই জন্য বিকল্প আরেকটি পাম্পেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যাটি অর্থাৎ নির্গত দুর্গন্ধের বিষয়ে লেনার্ড কোনও সদুত্তোর দিতে পারেন না।

তিনি বলেন, “ I do not know any practical means for conveying away the night soils of Calcutta without causing bad smells. At present both the smells and sights are, I think thoroughly objectionable; the system which is being carried out will remove the latter objection alltogether and though the drains will certainly be offensive to those who enter them, or who may have to examine them, the inhabitants of Calcutta need know

nothing about it unless some of us wish to open a trap, or climb up ten feet above the roof of some hnuse and get one's head over a ventilator."[9]

লেনার্ড অবশ্য বলেন এই ঢাকা ড্রেনে বর্জ্য পদার্থ দৃষ্টিগোচর হবে না, এটা অন্তত একদিক থেকে ভাল। সেই আবার ক্রিস্ট অটারের বলা ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের শহরের মতো নান্দনিক সৌষ্ঠব বজায় রাখার একটা অছিলা লক্ষ করা যাচ্ছে। এছাড়া লেনার্ড বলেন, ঢাকা ড্রেন পরিষ্কার করার সময় শুধুমাত্র অল্প কিছু লোক এর সংস্পর্শে আসবে।

এরপরের বিতর্ক শুরু হয়, বাড়িগুলি সঙ্গে পাব্লিক ড্রেনের সংযোগকে কেন্দ্র করে। অনেক ডাক্তাররা বলতে থাকেন, ড্রেনগুলি প্রচুর আবর্জনা-জীবাণু বহন করে এনে গৃহস্থালিতে রোগ ছড়ানোর কারণ হয়ে উঠতে পারে। এরপর একটা সমাধানসূত্রও বেরোয়। প্রতি বাড়ি থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য আলাদা নর্দমার মধ্যে এসে প্রধান ড্রেনের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়। লেনার্ড এই ড্রেন ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন। তিনি বলেন পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গায় যদি এই মডেল ফলপ্রসূ হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতাতেও এটি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে।[10]

ক্লার্কের পরিকল্পনাটি Messrs. M and G Rendel(মেসার্স এম অ্যান্ড জি রেণ্ডেল) ইংল্যান্ডে এদের মূল প্রতিষ্ঠানের সামনে উপস্থাপিত করেন। তারা অবশ্য এই পরিকল্পনাটিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার কথা বলেন। ড্রেনগুলিকে আরও এক ফুট ছয় ইঞ্চি নিচু করার কথা বলা হয়। বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে তাঁরা বলেন, বছরে আটমাস ড্রেনের বর্জ্য গঙ্গা নদীতে নিষ্কাশন করা হোক, আর বর্ষা ঋতুতে চার মাস পূর্ব দিকের ক্যানেলে। ড্রেনের ঢাল পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়। অর্থাৎ পরিকল্পনাটি ক্লার্কের ঠিক পরিকল্পনার বিপরীত দিকে ড্রেনগুলির ঢাল বিন্যস্ত করার কথা বলে।[11]

---

[9] Ibid., 26-29

[10] Ibid., 30

[11] Ibid.,31

ক্লার্ক এই পরিকল্পনাটির বিস্তর সমালোচনা করেন। বলেন এমনিতেই নদীর অবস্থা বেশ খারাপ। তার মধ্যে ড্রেনের জল পতিত হলে আর দেখতে হবে না। David.B. Smith (ডেভিড. বি. স্মিথ), স্যানিটারি কমিশনার অব বেঙ্গল, এই বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে বলেন, মেসার্স এম অ্যান্ড জি র্যাণ্ডেল যে পরিকল্পনা করেছে তা যথেষ্ট বাস্তবজ্ঞানহীন। তাদের আঞ্চলিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই।

তিনি লেখেন, " The gentleman, with an utter want of local knowledge of Calcutta and its environs, seated in an office in London, had suggested what seemed to them most desirable... what they attempted might be compared to a physician trying to cure a patient whom he never had seen."[12]

তিনি বলেন লন্ডনের ড্রেনের বর্জ্য টেমস নদীতে নিষ্কাশনের মডেল কলকাতায় প্রয়োগ করার কথা ভেবেছেন তারা; যা কলকাতার ভূ-প্রকৃতিতে কার্যত অসম্ভব। টেমস্ নদীতে বর্জ্য নিষ্কাশনের মডেলটিও সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এটিকে নিয়ে 'Great stink' বিতর্কটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[13]

সুতরাং সল্টলেক অঞ্চলে ড্রেন নিষ্কাশনের মডেলটিতে ডেভিড.বি. স্মিথ, স্যানিটারি কমিশনার অব বেঙ্গল, বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর পাশাপাশি তিনি ড্রেনগুলি পরিষ্কার করার জন্য জল সরবরাহ প্রকল্পের ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন। বলেন এই দু'টি পরস্পর সংযুক্ত প্রকল্প।

তিনি রিপোর্টে লেখেন, "It is now intimately associated with the two other great undertakings—the drainage of Calcutta and its water supply. The

[12] David. B. Smith, Report on the Drainage and Conservancy of Calcutta, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1869, P.30-31

[13] Ibid., 33

water-service is to be subservient to the cleansing of the sewers; the sewerage itself is to be voided in the Salt Lake."[14]

তবে সল্টলেকে ড্রেন নিষ্কাশন নিয়ে ঔপনিবেশিক মহলে দ্বন্দ্ব সহজে কাটে না।

Dr. Chevers সল্ট লেক পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে তার রিপোর্টে লেখেন, " Here the city's dilema becomes the land's greatest... what the now deadly swamps eastward of Calcutta may be made in ten years—the garden of the country."[15]

ঔপনিবেশিক আধিকারিক মহলেও সল্টলেকে ড্রেন নিষ্কাশনের মডেলটিতে খুব একটা সমর্থন পাওয়া যায় না। সরকারি আধিকারিক Mr. Longridge(মি. লঙরিজ) সল্ট লেকে বর্জ্য নিষ্কাশনের বদলে ক্যানেলের মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্কাশনের কথা বলেন। স্মিথের সঙ্গে লঙরিজের এই ড্রেন ব্যবস্থার পরিকল্পনা নিয়ে বেশ বিরোধও বাধে। মি.লঙরিজ বলেন ড্রেন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের বলা পথের ওপরেই বেশি ভরসা করা উচিত। কিন্তু স্মিথ বলেন এক্ষত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের বিচক্ষণতার ওপর খুব বেশি ভরসা না করাই ভাল।

স্মিথ তাঁর রিপোর্টে লেখেন, "I presume to submit that the judgment of the engineer is really of extremely little value on such a point as this, as might be the opinion of a sanitarian on particular plans of drain-construction or the weak point of a steam engine. Reasoning not from analogy, but from actual experience, physicians have learnt to dread the presence of excrement-tainted water, in however large quantities they may be present."

---

[14] Ibid., 56

[15] Ibid.,57

তিনি আরও বলেন, সরকারি আধিকারিক হিসেবে অবশ্যই লঙরিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ড্রেন ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। এক্ষেত্রে তিনি বলেন, গভর্নমেন্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের বিচার বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখলেও খুব সমীচীন ভাবেই চিকিৎসা শাস্ত্র এবং স্যানিটেশন বিষয়ে ফিজিশিয়ানদের মতামতের ওপরেই বেশি আস্থা রাখবেন।[16]

অনেক ডাক্তার আবার সমস্ত বর্জ্য নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ড্রেন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। ডঃ সেভার্স 'Dry Conservancy'-র পক্ষে কথা বলেন। তিনি বলেন, এয়ার টাইট লোহার বাক্সে শুকনো বর্জ্য পদার্থ বাক্সজাত করে ঘোড়ায় টানা গাড়ি করে যদি আলাদা ভাবে নিষ্কাশন করা যায়, তাহলে ড্রেন ব্যবস্থার ওপর চাপ খানিকটা কমানো সম্ভব হবে। কিছু দেশীয় ডাক্তারও এর পক্ষেই মত দেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ চক্রবর্তী, ডাঃ ফারুকার প্রমুখও শুষ্ক বর্জ্যের সঙ্গে ড্রেনের জলীয় বর্জ্য একত্রিত করে নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। ক্রান্তীয় অঞ্চলের জন্য এই ব্যবস্থাটিই বেশি কার্যকরী বলে ডাঃ সরকার মনে করেছিলেন। তিনি বলেন এখানকার উষ্ণ -আর্দ্র জলবায়ু এবং বৃষ্টিপাত বর্জ্য পদার্থের পচনের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে। সুতরাং শুরুতেই যদি এই পচনশীল শুষ্ক পদার্থগুলিকে আলাদা করে ফেলা যায় তাহলে বাতাসে দুর্গন্ধ ও দূষণ ছড়িয়ে পড়া অনেকাংশে আটকানো সম্ভব হবে। অন্যদিকে ঢাকা ড্রেনও কোনও রকম বাধা ছাড়াই প্রবাহিত হতে পারবে।[17]

কলকাতা শহরে ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাসের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসতে থাকে বিভিন্ন মহল থেকে। প্রথমেই বলা হয় এই ড্রেনগুলি যে জলাশয়ে পতিত হবে সেই জলাশয়গুলি দূষিত হবে। এছাড়া নাগরিকদের মল-মূত্র ড্রেনের মাধ্যমে সমস্ত শহরে সঞ্চালিত হবে এবং অন্যত্র নিষ্কাশিত হবে, এই ব্যাপারটি নিয়েও অনেকে আপত্তি করেন। এছাড়া ড্রেনের

[16] Ibid.,33

[17] Ibid.,42

মধ্যে জমা হওয়া নোংরা কাদা পরিষ্কারকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন সমস্যার কথা উঠে আসে।[18] আবার কলকাতার মতো বড় শহরে 'Dry Conservancy'- এর প্রকল্পটি কার্যকর করার প্রস্তাবটিও সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয় না। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তদানীন্তন হেলথ্ অফিসার, A.C. Macrae (এ. সি. ম্যাক্রে), 'Dry Conservancy' এবং ড্রেনের মাধ্যমে বর্জ্য নিষ্কাশনের একটি একত্রিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেন। বিশেষত উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায় যেখানে ড্রেন নির্মাণ করা অত্যন্ত দুরূহ সেই সব অঞ্চলে এই 'Dry Conservancy' ও কিছু সংকীর্ণ খোলা ড্রেন নির্মাণের কথা বলেন। কিন্তু স্মিথ এই 'যৌথ ব্যবস্থা'-র বিপক্ষেই কথা বলেন। তিনি বলেন এই ব্যবস্থা অযথা খরচ বাড়াবে। এছাড়া জেল বা ব্যারাকের মতো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাটি বাস্তবায়িত করা গেলেও কলকাতার মতো বড় শহরে এই ধরনের ব্যবস্থা কার্যত অসম্ভব বলেই স্মিথ মনে করেন।[19]

স্মিথ, কলকাতায় ড্রেন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে ক্লার্কের প্রস্তাবের সঙ্গে খানিকটা সহমত হন। যদিও কলকাতায় কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে সফল ড্রেন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে, সেই বিষয়েও কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না।

কলকাতায় ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে স্মিথ তাঁর রিপোর্টে লেখেন, "Closely analysed, sharply criticised, roughly handled and even well-abused as it has been, its advantages are still very conspicuous... since 1859 constant deliberations have been held not only upon this scheme itself, but also regarding its bearings on the latest scientific experiences in Europe."[20]

---

[18] Ibid., 70

[19] Ibid., 70

[20] Ibid.,79

শহর কলকাতায় প্রথম ড্রেন বিন্যাস

শহরের দক্ষিণ দিকে প্রথম মাটির নীচে ঢাকা ড্রেনগুলি বিন্যস্ত করা হয়। এরপর ড্রেনের একটি শাখা চলে যায় উত্তর দিকে। কিন্তু উত্তর কলকাতায় প্রত্যেক বাড়িকে ড্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয়নি। বস্তিগুলির অত্যধিক জনসংখ্যা এবং অবর্ণনীয় অবস্থার ওজরে এগুলিকেও প্রত্যক্ষ ভাবে ড্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় না। এছাড়া ড্রেনগুলি পরিষ্কার করার মতো যথেষ্ট পরিষ্কার জলের অভাব উত্তর কলকাতার বাড়িগুলিকে ড্রেনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ আরও ২৫০৩ টি নতুন বাড়ি সংযুক্ত করা হয়। কলকাতা শহরে মোট ৭২১৪টি বাড়ি ড্রেনের পরিষেবার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়। কিন্তু ড্রেন ব্যবস্থা দক্ষিণ কলকাতায় যথেষ্ট প্রচলিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও উত্তর কলকাতায় সেই ভাবে বিন্যস্ত হয় না। ঔপনিবেশিক বিভেদের এক চূড়ান্ত নিদর্শনের সাক্ষী থাকে কলকাতা। স্টুয়ার্ট হগ, তদানীন্তন চেয়ারম্যান টু দ্য জাস্টিস ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ্যেই বলেন, মাটির নীচের ড্রেন ব্যবস্থা বেশ সফল ভাবেই কলকাতা শহরের ইউরোপিয়ানরা যে অংশে বসবাস করে, সেখানে কার্যকরী। স্টুয়ার্ট হগ তাঁর রিপোর্টে এরপর যে দু'টি কথা লেখেন তা বেশ স্ববিরোধী। এক দিকে তিনি লেখেন, বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কলকাতায় সর্বত্র সমান ভাবে ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাস সম্ভব নয়।

অন্য দিকে তিনি লেখেন, এখানকার শহরের বিন্যাস শুধু ড্রেন ব্যবস্থা নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল নয়, বরং দরিদ্র শহরবাসীর কিছু অভ্যেসও ড্রেন ব্যবস্থার পূর্ণ কার্যকারিতা স্থাপনের পরিপন্থী... "For not only are many of the streets and lanes narrow and tortuous, but the habits of nearly all the poor class of natives would, for many a long year to come, preclude the possibility of each house and hut being connected with an underground sewer."

উদারনৈতিক জনহিতৈষণার মুখোশের আড়ালে বিভেদকে প্রতিষ্ঠা করতে কোনও জনগোষ্ঠীকে ‘পৃথক’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের নিকৃষ্ট অভ্যেসজনিত ‘অসভ্যতা’-কে দায়ী করার প্রবণতা, মনে হয় সভ্যতার ভারে ন্যুব্জ সাদা চামড়ার প্রভুত্বকে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট।

নতুন রেলপথ, সড়কপথ ও দক্ষিণবঙ্গের সার্বিক জল নিকাশি ব্যবস্থার অবনতি সম্পর্কিত অনুসন্ধান

কলকাতা শহরের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য কিছু শহরে কীভাবে ড্রেন ব্যবস্থা বিন্যস্ত করা হল সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করলে উপনিবেশে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পর্কে একটি সার্বিক রূপ পাওয়া সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্রও আরও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে। আঞ্চলিক পরিস্থিতি, স্থান বিশেষে বিভিন্ন সমস্যার প্রকারভেদ, ভৌগোলিক তারতম্য কীভাবে প্রকল্পগুলির মধ্যে পার্থক্য রচনা করেছিল সেই সম্বন্ধেও একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

এমনিতেই দক্ষিণবঙ্গের নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের ভূমির ঢাল অত্যন্ত কম হওয়ায় এখানে জল নিষ্কাশিত হওয়া বেশ সমস্যাজনক। এই অঞ্চলের শহরগুলি ঠিক কলকাতার মতো নবনির্মিত নয়। ফলে পুরোনো শহরে এই নতুন প্রকল্পকে কীভাবে প্রয়োগ করা গেল সেই বিষয়টিও আলোচনার দাবি রাখে।

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কৃষ্ণনগরের উদাহরণে জলনিকাশি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা আমাদের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে। প্রাক ঔপনিবেশিক পর্বে কৃষ্ণনগর শহর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে সমস্ত দক্ষিণবঙ্গে বেশ প্রাগ্রসর ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের শাসনকালে নদীয়া জেলার এই শহরটি সমস্ত দিক থেকেই হয়ে উঠেছিল অবিসংবাদী। আবার এই শহরে ঔপনিবেশিক মডেলের ড্রেন ব্যবস্থা নির্মাণ অন্য এক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠারও সূচক। সুতরাং শহর পরিচালনার এই নতুন পরিকাঠামো কর্তৃত্ব বদলেরও নির্ণায়ক। ভৌগোলিক দিক থেকেও এই শহরটির একটু অন্যরকম গুরুত্ব আছে। কর্কটক্রান্তিরেখা এর প্রায় প্রান্ত ঘেঁষে

বিন্যস্ত। শহরটি জলঙ্গি নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। শহরের ভেতর দিয়ে অঞ্জনা নামে একটি শীর্ণ জলধারা প্রবাহিত হয়ে জলঙ্গি নদীতে মিশেছে। আবার জলঙ্গিও কৃষ্ণনগর থেকে কিছুদূর গিয়েই গঙ্গা নদীতে গিয়ে মিশেছে। সুতরাং জলঙ্গির মোহনার একেবারে কাছে কৃষ্ণনগর শহরটি অবস্থিত। জলঙ্গির নদীখাতের স্বাভাবিক ঢাল এখানে একেবারেই কম। আর তাই কৃষ্ণনগরটি ভূ-প্রকৃতিগত ভাবে অতি সমতল। ভূ-প্রকৃতির ঢাল কম হওয়ায়, জল নিষ্কাশিত হওয়ার স্বাভাবিক ব্যবস্থাটিই এখানে অত্যন্ত সমস্যাজনক। সুতরাং এই শহরে কীভাবে জলনিকাশি ব্যবস্থা বিন্যস্ত হল, কতটা কার্যকারী হল এই ব্যবস্থা, বা আদৌ এর কোনও কার্যকারিতা থাকল কি না, শহরের অধিবাসীবৃন্দ কীভাবে এই প্রকল্পটিকে দেখল, এই প্রকল্প নির্মাণে কী জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হল এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার এবং মিউনিসিপ্যালিটির বৃহত্তরের সার্বিক মঙ্গলের কর্মসূচীর ঘাত-প্রতিঘাতে পৌর নাগরিকত্বের গড়ে ওঠাও আমাদের আলোচনায় আসবে।

১৮৬০-এর দশকে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে এক ভয়াবহ জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঔপনিবেশিকদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। এই সময় রেলপথের বিস্তার দক্ষিণবঙ্গের স্বাভাবিক জলনিকাশি ব্যবস্থা নষ্ট করে দিচ্ছে এই রকম একটা অভিযোগ উঠতে থাকে। ঔপনিবেশিক সরকারের চাপানো প্রযুক্তি প্রতিবেশকে নষ্ট করছে এবং একেই মহামারীর কারণ ধার্য করেন অনেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রেলপথ স্থাপনের প্রথম পর্বে দেশীয় জনতার প্রাথমিক মুগ্ধতা থাকলেও ক্রমশ রেল সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম নিতে থাকে। সরকারি তরফেও রেলপথ স্থাপন জনিত পরিবর্তনের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সম্পর্ক নিয়ে তদন্ত করা হয়।

বাবু দিগম্বর মিত্র একটি মেমোর‍্যান্ডামে রেলপথ এবং নতুন নির্মিত সড়কপথগুলিকে দক্ষিণবঙ্গের প্রচলিত জল নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ বলে ধার্য করেন। এই অবরুদ্ধ জল থেকেই বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে বলে তিনি দাবি করেন। নদীয়া জেলার

কমিশনারও খানিকটা এই অভিযোগের সপক্ষেই কথা বলেন। তিনি বলেন জলনিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে রাস্তা ও রেলপথ জুড়ে প্রচুর কালভার্ট নির্মাণ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে রেলপথ বরাবর জল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন খনন করার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি জানান।[21]

রেলপথ নির্মাণজনিত কারণে স্বাভাবিক জলনিকাশি ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও মহামারীর ছড়িয়ে পড়া বিষয়ে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে নদীয়া জেলার কমিশনারের প্রায় বিপরীত কথা বলেন এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেট বলেন নদীয়া জেলায় মহামারী এবং রেলপথের কোনও সংযোগ নেই। তিনি বলেন নদীয়াতে গ্রামের চেয়ে শহরে জ্বরের প্রকোপ অনেক বেশি। অথচ গ্রামের ঠিক পাশ দিয়েই রেলপথ বিস্তৃত হয়েছে। কৃষ্ণনগর শহরটি রেলপথ থেকে প্রায় এগারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই শহরের দূষিত জল জলঙ্গি নদীতে নিষ্কাশিত হয়। তাই রেলপথ জনিত কারণে এখানে আলাদা করে জল জমার কোনও কারণ নেই। অথচ এখানেই জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। নদীয়া জেলার মুড়াগাছা নামক অঞ্চলটিতেও জ্বরের প্রকোপ বেশ বেশি। এই অঞ্চলটিও রেলপথ থেকে প্রায় এগারো মাইল দূরে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলের জল গঙ্গা নদীতে নিষ্কাশিত হয়। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আরও কতকগুলি শহরের দৃষ্টান্ত দেন, যে শহরগুলির সঙ্গেও আপাতভাবে রেলপথ স্থাপনের সংযোগ নেই। তিনি বলেন হুগলী, ত্রিবেণী, পাণ্ডুয়া এবং কালনা এই সব ক'টি শহরই গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। সুতরাং জল নিষ্কাশনের প্রাকৃতিক পথ এখানে অবরুদ্ধ নয়। আবার এর মধ্যে কালনা রেল লাইন থেকে প্রায় বারো-চোদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত। অথচ এই সব ক'টি জায়গাতেই প্রায় একই সময়ের ব্যবধানে জ্বরের প্রকোপ দেখা গেছে। তাই, রেল লাইন, জলনিকাশি ব্যবস্থা এবং মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কোনও সরল সমীকরণ করা যায় না বলে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট দাবি করেন।[22] এই দাবি যে ঔপনিবেশিক

---

[21] GENERAL, BRANCH SANITATION, PROCEEEDINGS-15, MARCH 1869

[22] Ibid, PROCEEEDINGS-16

প্রযুক্তির প্রয়োগের দ্বারা কোনও রকম নেতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এমন সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নস্যাৎ করার প্রয়াস তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনারের বক্তব্য আলোচনা করলে রেলপথ, জলনিকাশি ব্যবস্থা ও মহামারীর প্রকোপের পারস্পরিক সম্পর্কের সম্ভাবনা যে সরাসরি ভাবে সামনে আনা হচ্ছে না, বরং খানিকটা গোপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা আরও পরিষ্কার হবে।

বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার তাঁর রিপোর্টে জানান ইস্টার্ন রেলপথের দ্বারা এই জেলার কোথাও কোথাও স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থা ব্যাহত হলেও, সড়কপথের মাধ্যমে এমন ঘটনা ঘটেনি। এরপরে আবার তিনি বলেন বর্ধমান জেলায় রেলপথ এবং সড়কপথের সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তিনি তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট R.V.Cockerell(আর ভি কক্রেল)-এর একটি রিপোর্ট যুক্ত করে পাঠান। এই রিপোর্টটিতে দেখা যাচ্ছে সার্বিক ভাবেই হুগলি জেলার ড্রেন ব্যবস্থার হাল বেশ খারাপ। প্রাকৃতিক জলখাতগুলি ভর্তি হয়ে যাওয়ার ফলে জল নিষ্কাশনের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে, নতুন নির্মিত রাস্তাগুলি জল জমা হওয়ার বেসিনগুলিকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে বলেও জমা জল বেরোতে পারছে না। এই রিপোর্টে ককরেল বলেন নতুন রাস্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ড্রেন ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।[23] সুতরাং বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনারের বক্তব্যে স্ববিরোধিতা বেশ স্পষ্ট। একদিকে তিনি বলছেন রেলপথ বা সড়ক পথের জন্য তাঁর ডিভিসনে কোথাও জল অবরুদ্ধ থাকার কারণে মহামারির প্রকোপ দেখা দেয়নি। আবার অন্যদিকে, তিনি এমন একটি রিপোর্ট বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করছেন যাতে ঠিক এর বিপরীত মত-ই ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এর থেকে বলা যেতে পারে, হয়তো ওপরমহল থেকে কোনও চাপের মুখে সরাসরি একজন সরকারি আধিকারিক হিসেবে বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার তাঁর স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারছিলেন না।

[23] Ibid, PROCEEEDINGS-17

এরপর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কাছে রেলপথ ও সড়কপথের বিন্যাস কীভাবে জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংযুক্ত সেই বিষয়ে মতামত চাওয়া হয় সরকারি তরফে। এই অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্যেও দেখা যায় রেলপথ বিন্যাসের নেতিবাচক প্রভাবকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা যথেষ্ট স্পষ্ট। অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বলা হয়, যে সব গ্রামে ড্রেন ব্যবস্থা এমনিতেই খারাপ সেখানে জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে বেশি। অন্য দিকে রেলপথ এবং সড়কপথ এই ঘটনায় খানিক অনুঘটকের কাজ করেছে। বাবু দিগম্বর মিত্রের মেমোর‍্যাণ্ডামের কথা উল্লেখ করে তারা বলেন, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রেলপথ বা সড়কপথকে দায়ী করা উচিত নয়।[24]

সরকারি তরফে ইঞ্জিনিয়ারদের কমিটি তৈরি করেও বিষয়টি অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হয়। সড়ক পথ এবং রেলপথ জলের স্বাভাবিক বহমানতাকে রুদ্ধ করছে কি না এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য M.T.S. Isaac (এম টি এস আইস্যাক) নামক একজন ফার্স্ট গ্রেড এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়োগ করা হয়। কখনও কখনও সাউথ ইস্টার্ন সার্কেলের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মি. লেনার্ড তাঁর সঙ্গে পরিদর্শনে যান। তাঁরা প্রায় দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তারা পরিদর্শনের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, হরিপাল থেকে ওল্ড বেনারস রোড এবং ওল্ড বেনারস রোডের অন্যান্য প্রায় সমস্ত অংশই জলের প্রাকৃতিক নির্গমনের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। এছাড়া বিগত কয়েক বছর বৃষ্টিপাত বেশি হয়েছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় মি.আইজ্যাক অবশ্য তাঁর নিজস্ব বিচারে জনস্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে নবনির্মিত রেলপথ বা সড়কপথের কোনও নির্দিষ্ট সম্পর্ক খুঁজে পাননি।

[24] Ibid, PROCEEEDINGS-17

তিনি লেখেন, “That fever of a bad epedemic type should now and then break out in Lower Bengal, can scarcely be a cause of surprise to any one who has seen its numerous jheels filled with rotting vegetation, from which poisonous exhalations are emitted that are wafted towards the adjacent villages. The villages themselves in the numerous small putrid tanks and cess-pools, the lack of good drinking water and the almost entire absence of conservancy arrangements, generally contain every element necessary for an out-break of fever and its requires but the malaria from some adjacent swamp during a season of more than usually rank, vegetation and rapid decay to produce the most fatal consequences.”

মি.আইজ্যাকের সহকারি ইঞ্জিনিয়ার মি.লেনার্ড-ও এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। সার্বিক ভাবে জলমগ্ন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ইঞ্জিনিয়ারদ্বয় কিছু পরামর্শ দেন। তাঁরা বলেন যে রেল লাইন বা রাস্তায় ঘন ঘন কালভার্ট তৈরি করতে হবে। নিকটবর্তী কালভার্টে পৌছোনোর জন্য রাস্তা বা রেলপথের দুই ধারে খাল খনন করতে হবে। তবে লেনার্ড আবার প্রসারিত খাল খননের থেকে মাঝে মাঝে জল জমার জন্য গভীর জলাশয় খননের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রসারিত খাল, রেলপথ বা সড়কপথের ক্ষতি করতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন।[25]

রেল ডিপার্টমেন্টের তরফেও বিষয়টি পৃথকভাবে অনুসন্ধান করা হয়। রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টেও রেলপথের সঙ্গে মহামারীর সরাসরি সম্পর্কের কথা স্বীকৃত হয় না। এখানে বলা হয় হুগলি জেলায় রেল লাইনের দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী সর্বত্র জ্বর ছড়িয়ে পড়েছে। বরং সার্বিক

[25] Ibid, PROCEEEDINGS-18

ভাবে জমা জল এবং বন্যাকে এই জ্বরের জন্য দায়ী করা হয়। এক্ষেত্রে রেললাইনের ভূমিকা নেহাত-ই নগণ্য। [26]

রেললাইন এবং মহামারীর প্রাদুর্ভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে হুগলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ.ককরেল যে রিপোর্টটি তৈরি করেন, তা সরকারি আধিকারিক মহলে একটু ব্যতিক্রমী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই রিপোর্টটিই বর্ধমানের কমিশনার তার রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ককরেল, হুগলি জেলার বন্যা এবং জলমগ্ন অবস্থার সঙ্গে রেলপথের একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে দামোদর নদের জল চারটি শাখায় বিভক্ত হয়ে হুগলি জেলাতেই হুগলি নদীতে মিশেছে। কানা দামোদর এর মধ্যে প্রধান। এই চারটি শাখার মধ্যে দু'টি শাখা হুগলী স্টেশনের কাছে এবং দু'টি শাখা হাওড়া স্টেশনের দক্ষিণে হুগলী নদীতে মিশেছে। রেলপথের বিস্তৃতি দামোদরের শাখাগুলির জল প্রবাহ ব্যাহত করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিগত কয়েক বছরের অতিবৃষ্টি ও বন্যার সমস্যা। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে। ককরেল বিধান দেন যে সার্বিক ভাবে পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য পুরোনো মজে যাওয়া খালগুলি পুনরায় খনন করা এবং এছাড়াও কিছু নতুন খাল খনন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিলে সরকারি ভাবে কড়া আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হয়। নতুন খাল খনন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জমির মালিককেই ব্যয় বহন করার কথা ভাবা হয়।[27]

ককরেলের রিপোর্টতে অফিসিয়েটিং কমিশনার মি. হেরসেল মতামত দেন। জমা জল এবং বিশুদ্ধ জলের অভাব যে সার্বিক ভাবে জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছে সেই বিষয়ে হেরসেলও সহমত পোষণ করেন। বালিখালসহ দামোদরের শাখাগুলির সংস্কারও আশু প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া তিনি আরও বলেন যে এই জ্বর যখন যশোর, নদীয়া,

[26] Ibid, PROCEEEDINGS-19

[27] Ibid, PROCEEEDINGS-20

বারাসাত-এর মত অন্যান্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়ছে তখন নিশ্চয়ই এর পেছনে আরও গভীর কোনও কারণ আছে, যেগুলির অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

মি.আইস্যাক এবং মি. লেনার্ড এর অনুসন্ধান কমিটি, ককরেলের রিপোর্ট এবং মি.হেরসেল-এর মতামতে প্রায় একটি বিষয়ে মিল আছে। রেলপথের সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের যোগাযোগকে স্বীকার করা হোক বা না হোক, রেলপথের বিস্তার যে স্বাভাবিক জল নিকাশি ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে, এই বিষয়ে কোনও মতভেদ নেই তাদের রিপোর্টে। অন্য দিকে জমা জল যে বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে সেই নিয়ে ইউরোপ জুড়ে সচেতনতা গড়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শহরের দেহে বিশুদ্ধ ও দূষিত জল সঞ্চালনের উপযোগিতার কথা মাথায় রেখে ইংল্যান্ডে এই সংক্রান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং রেলপথ বিস্তারের কারণে জল নিকাশের পথ অবরুদ্ধ হচ্ছে অথচ এর সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের সরাসরি সম্পর্ক স্বীকার না করার ঔপনিবেশিক প্রবঞ্চনা বেশ স্পষ্ট। কিন্তু জল অবরুদ্ধ হওয়ার পরিস্থিতির উন্নতি সম্পর্কে সরকারি কর্তৃপক্ষও চিন্তাভাবনা শুরু করে।

মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে কীভাবে জমা জলের সমস্যা নিষ্পত্তি সম্ভব সেই নিয়ে কথাবার্তাও শুরু হয়। কলকাতা শহরে আমরা এই পরিকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া আলোচনা করেছি। এর পাশাপাশি কলকাতার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলিতে জ্বরের প্রাদুর্ভাব দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে ড্রেনের পরিকাঠামো স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্যম্ভাবী করে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জমা জলে বিপর্যস্ত এবং মহামারী কবলিত নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর শহরের ড্রেন পরিষেবা সম্পর্কে আলোচনা করব। নতুন পরিষেবার পরিকাঠামো ঔপনিবেশিক প্রয়াসের পথে, স্থানীয় নাগরিকের গ্রহণ-বর্জনের পথ পেরিয়ে ‘পৌর নাগরিক’ হয়ে ওঠাও আলোচিত হবে।

১৮৬০-এর দশকে মহামারীর প্রকোপ এমন ছড়িয়ে পড়েছিল কৃষ্ণনগর শহরে যে সরকারি কর্তৃপক্ষও তাতে নড়ে চড়ে বসে। ইতিমধ্যে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহামারীর প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে বিষয়টি নিয়ে সরকারি আধিকারিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। একটি এপিডেমিক কমিশন নিযুক্ত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি কীভাবে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে সেই বিষয়েও আলোচনা শুরু হয়।

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে দেখা যায় কৃষ্ণনগরের প্রচুর মানুষ জ্বরের কবলে পড়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। এই বিষয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট লর্ড উলিক ব্রাউন তদানীন্তন সরকারকে অবগত করতে থাকেন।

তিনি কৃষ্ণনগর শহরের অবস্থা পর্যালোচনা করে লেখেন, " that in the first year of the dreadful visitation of this disease, that is in 1864, it committed such depredations amongst your poor memorialists that the Bengal Government was moved to depute the Epidemic Commission to visit the affected parts of the southern portion of this town. With a view to ascertain the cause of their unhealthiness."[28]

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য সরকার এপিডেমিক কমিশন গঠন করার প্রস্তাব দেয়। এই কমিশন গঠিত হয়েছিল এই শহরের কিছু বিদগ্ধ মানুষকে নিয়ে। রাজা দিগম্বর মিত্র, কিছু অভিজ্ঞ সরকারি ডাক্তার, সরকারি ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ এর সদস্য ছিলেন। এপিডেমিক কমিশনার বিধান দেন যে এই রোগের উৎপত্তি মূলত নিকাশি ব্যবস্থার অভাবজনিত কারণে। মূলত কৃষ্ণনগর শহরের দক্ষিণে অবস্থিত "Marshy, dead, stagnant" অঞ্জনা নদী পরিস্থিতিকে আরও অস্বাস্থ্যকর করেছে। এদের সুপারিশে সরকার রিলিফ ফান্ড থেকে মৃতদের পরিবারকে

[28] Municipal, Branch-Sanitation, Coll-4, File-4, Proceedings-61, November-1881

দেড় হাজার টাকা রিলিফ দেন।[29] সুতরাং এই ধরনের মৃত্যুকে একেবারে 'স্বাভাবিক' বলে সরকার যে সম্পূর্ণ দায় অস্বীকার করে নিয়েছিল, এমনটাও নয়। বরং সিপাহি বিদ্রোহের পরে সরাসরি ইংল্যান্ডের সরকারি রানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মহামারীর মোকাবিলা করতে 'জনদরদী' হিসেবে দেশীয় জনতার আস্থা ফিরে পেতে এই জাতীয় প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। নতুন উদারনীতির মুখোশে এ এক নতুন রকমের আত্মপ্রকাশ।

শহরের অবস্থার উন্নতিকল্পে তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট Lord Willick Brown (লর্ড উইলিক ব্রাউন) -এর কথা মতো সরকারি তরফে কিছু প্রচেষ্টাও করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের পূর্বে এই জাতীয় কর্মকাণ্ড শহরের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে কিছুটা সক্ষমও হয়।

অঞ্জনা নদীর দ্বিতীয় অংশ কার্যত শুকিয়ে গেছিল। এই অংশের সংস্কারের খানিক প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনার বেশ অভাব ছিল। এই মজে যাওয়া খাতের অবিচ্ছিন্ন ধারায় আদ্যোপান্ত সংস্কার না করে এই খাতে কতকগুলি খাল এবং পুকুর খনন করা হয়। এই পুকুর-খালগুলির নাম এবং অবস্থান বেশ লক্ষ্য করার মতো। প্রথম পুকুরটির নাম গ্রে'স ট্যাঙ্ক। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোনও ইউরোপীয় সাহেবের নামে পুকুরটি। হয়ত তার বাসস্থানের কাছেই। দ্বিতীয় পুকুরটিকে চিহ্নিত করা হয় বাবু অঘোরনাথ মুখার্জীর বাড়ির কাছের পুকুর হিসেবে। তৃতীয় পুকুরটি চিহ্নিত করা হয় তারানারায়ণ ঘোষের পুকুর হিসেবে। পরে এটি নদীয়ার মহারাজার অধীনে আসে ও মহারাজার পুকুর হিসেবে চিহ্নিত হয়। চতুর্থ পুকুরটি চিহ্নিত হয়, ডাক্তারবাবু কালীচরণ লাহিড়ীর বাড়ির কাছের পুকুর হিসেবে। এছাড়া জলঙ্গি থেকে গ্রে'স ট্যাঙ্ক অবধি একটি খাল খনন করা হয়। বলা হয় এই পুকুরগুলিতে বর্ষার

[29] Ibid, Proceedings-62

অতিরিক্ত জল এসে জমা হবে এবং এই পুকুরগুলিতে স্নান করা যাবে এবং এখান থেকে খাওয়ার জলও সংগ্রহ করা যাবে।[30]

এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো। পুকুরগুলি সব কটিই উচ্চবর্ণীয় গণমান্য ব্যক্তিদের বাড়ির আশপাশে খনন করা হয়েছে। জলের উৎসে উচ্চবর্ণীয়ের অগ্রাধিকারের প্রচলিত সমাজনীতির কাঠামোকে টলাতে চাননি উদারনৈতিক ঔপনিবেশিকরাও। নিম্নবর্ণের মানুষজন কীভাবে এই জলের উৎসের মাধ্যমে নিজেদের নিত্য নৈমিত্তিক চাহিদা মেটাতেন সেই সম্পর্কে অবশ্য মহাফেজখানার নথি নীরব।

এখানে আর একটি বিষয়ও লক্ষ করার মতো। কলকাতা শহরে যখন ড্রেন ব্যবস্থা বিন্যাস করার কথা হচ্ছিল, তখন কীভাবে এগুলি পরিষ্কার করা হবে সেই নিয়েও চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছিল। পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ এবং এই পাইপের জলের মাধ্যমেই ড্রেন পরিষ্কার করার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু কৃষ্ণনগরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বেশ অন্যরকম। এখানকার পরিস্থিতি ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাসের দিকে এবং জমা জলের নিকাশি ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে বাধ্য করেছে। অথচ ড্রেনগুলি কীভাবে পরিষ্কার করা হবে সেই বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি জমা জল নিকাশের জন্য অঞ্জনার শুষ্ক খাতে যে পুকুরগুলি খনন করা হয়, সেখান থেকে পানীয় জল সংগ্রহের কথাও বলা হয়।[31] সুতরাং উপনিবেশে মিউনিসিপ্যালিটির কোনও প্রতিষ্ঠিত মডেল ছিল না, তা বেশ প্রমাণিত। খাতায় কলমে একরূপতা দেখানোর চেষ্টা হলেও বা কর আদায়ের জন্য এক রকম যুক্তি দেখানো হলেও মডেল গুলি এক ভাবে প্রযুক্ত হয়নি তা বেশ স্পষ্ট।

[30] Ibid, Proceedings-65

[31] Ibid,Proceedings-74

সুদূরপ্রয়াসী চিন্তা-ভাবনা না করার জন্য অচিরেই নানান ধরনের সমস্যা শুরু হয়। জলঙ্গি নদীর সঙ্গে খনন করা পুকুরগুলি সংযুক্ত ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই জলঙ্গির জল আর পুকুরগুলিতে এসে পড়ে না। ফলে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। আবার মহামারী দেখা দেয় এবং আগের থেকেও বেশি মানুষ এতে মারা যায়। তাই এই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে অঞ্জনা নদী সংস্কার করাও আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এপিডেমিক কমিশন আগেই বলেছিল, “Anjonah being the natural drainage of the town which inclines towards the south, the surface and subsoil drainage of the whole town as a matter of course find its way into this old dead channel, its existence as a southern boundary of the town can not but prove prejudicial to its health.”[32]

কয়েকজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে কিছু সমাধান সূত্র বাতলানোর চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন, জলঙ্গি নদীর ওপর দু’টি স্লুইস গেট নির্মাণ করলে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা খানিকটা সম্ভব হবে। এর জন্য প্রয়োজন প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। [33]

এরপরেই প্রশ্ন ওঠে এই বিপুল ব্যয় ভার কে বহন করবে। মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে জানানো হয়, এই ব্যয়ভার বহন করতে মিউনিসিপ্যালিটি অক্ষম, এমতাবস্থায় সরকার যদি সাহায্যের হাত বাড়ায় তাহলে প্রকল্পটির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হতে পারে। এই মর্মে বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর কাছ থেকে অনুদান চাওয়ার কথাও বলা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে এই বিষয়ে রেড ক্রস এবং মিউনিসিপ্যালিটির দফায় দফায় আলোচনা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে অঞ্জনা খালের উন্নতি এবং জলঙ্গিতে স্লুইস খাল খননের জন্য

---

[32] Ibid,Proceedings-75

[33] Ibid, Proceedings-76

বারবার সরকারকে বলা হতে থাকে। বলা হয় খালের উন্নয়ন এর দুই পাশের মহামারি কবলিত গ্রামকে রক্ষা করবে। এমনকি সরকার যাতে ব্যয় বহন করতে নিজস্ব লাভের স্বার্থ খুঁজে পান সেই জন্য বলা হয় সরকার এই খালে মৎস্যচাষ করতে পারে, চাইলে এখানে ফেরি চলাচলের ব্যবস্থা করতে পারে, সেচ ব্যবস্থারও উন্নতি করা যেতে পারে।

মিউনিসিপ্যালিটি নিজের মতো করে শহরের ভাল মন্দ ভাবছে, সরকারকে আর্থিক অনুদানের জন্য বারংবার বোঝানোর চেষ্টা করছে। এর থেকে পরিষেবা প্রদানের এক্তিয়ার নির্দিষ্ট করে এবং উন্নতি সাধন করে উন্নত নাগরিক জীবনযাপনের অধিকার সুনিশ্চিত করার দায়িত্বে যে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই বিষয়টিও প্রতিষ্ঠিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে উঠে আসে পৌর নাগরিকত্বের কণ্ঠস্বর।

কৃষ্ণনগর শহরে ড্রেনের বিন্যাস

এরপর শহরে কীভাবে ড্রেনের বিন্যাস করা হবে, সেই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। রিপোর্ট তৈরি হয় মোটামুটি ১৮৮০-র ডিসেম্বর মাসে। এই রিপোর্টটি একটি বিস্তারিত রিপোর্ট। শহরের ভূমির ঢাল কীরকম, কেন কৃষ্ণনগরের ড্রেন ব্যবস্থা এতটা খারাপ, কোথায় শহরের সমস্ত বর্জ্য পদার্থ ড্রেনের মাধ্যমে ফেলা যেতে পারে এবং সমস্ত শহরে কিভাবে ড্রেনগুলি বিন্যস্ত করা যায়, সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এই রিপোর্টে। রিপোর্টে বলা হয়েছিল:

১। এই শহর উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমে গয়রা বিল এবং জলঙ্গি নদী দ্বারা পরিবৃত। এর দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আছে খুলশিয়া/খালসিয়া বিল এবং অঞ্জনা নদী। গয়রা বিল এবং খালসিয়া বিলের মাঝখানে আছে একটি নিম্ন জলাভূমি। এই অঞ্চলে আমন ধান এবং ভাটজঙ্গলার চাষ হয়।

২। অন্যান্য নদী তীরবর্তী শহরগুলির মতোই এই শহরেরও জমির ঢাল নদী এবং বিল-জলাভূমির দিকেই।

৩। আগে এই সব বিল এবং জলাভূমির জল ধারণ ক্ষমতা খুবই ভাল ছিল ইনলেট এবং আউটলেটগুলি খুব ভাল ভাবে কাজ করত। কিন্তু বর্তমানে জলঙ্গি নদীখাতে প্রচুর পলি জমে যাওয়ার কারণে এর জল ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। এর ফলে শহরের অতিরিক্ত জল এই নদী আর ধারণ করতে পারছে না।

৪। অন্যদিকে অঞ্জনা নদীর অবস্থাও খুব খারাপ। আগে এই নদী ছিল শহরের দক্ষিণ দিকের ড্রেন ব্যবস্থার প্রধান শিরা। কিন্তু বর্তমানে এই নদীও শহরের জল নিষ্কাশনে অক্ষম। এই নদীর প্রথম দুই মাইল কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় ভাবে এই নদীটি বিজয়খালি খাল নামে পরিচিত । প্রথম মাইলে পলি পড়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। কোনও নদীর জলধারা বলে চিনতেই এটিকে অসুবিধা হয়। অন্যদিকে, দ্বিতীয় মাইলে মিউনিসিপ্যালিটি কিছু পুকুর এবং জলঙ্গি সংযোগকারী খাল খনন, এর অব্যাহত প্রবাহের ধারাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

রিপোর্টে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার লিখছেন "The next mile has been most injudiciously and selfishly partitioned and blocked up by the spoil banks of numerous tanks and dighees dug in the bed of it". (পুকুরগুলির নাম থেকেই আমরা এর আভাস পাই)

৫। এছাড়া এই নদীর ধারে রাস্তা খুব সংকীর্ণ এবং প্রচুর বড় বড় বাড়ি আছে তাই এখানে ড্রেন তৈরি করতে গেলে সব পাকা ড্রেন তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে খরচ খুব বেশি পড়বে।

৬। এছাড়া অঞ্জনার দ্বিতীয় অংশে যে সসব পুকুরগুলি খনন করা হয়েছে, সেগুলির অবস্থা অত্যন্ত ভাল। বিশেষ করে মহারাজার পুকুরটি। তাই ইঞ্জিনিয়াররা খুব কম সংখ্যক ড্রেনের আউটলেট এই চত্বরে রেখেছিলেন। তাই অঞ্জনা বা জলঙ্গি কোনওটিই ঠিক ড্রেনের বর্জ্য গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়।[34]

---

[34] Ibid,Proceedings- 83

সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে কৃষ্ণনগর শহরে ড্রেন পরিষেবার ক্ষেত্রে অনেকগুলি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যেগুলির নিষ্পত্তি করে সুষ্ঠু ড্রেন ব্যবস্থা স্থাপন করা বেশ দুরূহ। প্রথম সমস্যা, যেখানে শহরের নিষ্কাশিত জল পতিত হবে, সেই নদীটি-ই পলি জমে নাব্যতা হারিয়েছে। দ্বিতীয়ত, শহরের মধ্যে যে জলধারাটি প্রবাহিত হত সেটি নিয়েও বিস্তর গণ্ডগোল। অবিচ্ছিন্ন ধারায় এটি প্রবাহিত হয়নি। কিছু দূর প্রবাহিত হওয়ার পর সেটি অধিগৃহীত হতে থাকে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা। অধিগৃহীত অঞ্চলগুলি কার্যত পুকুরে পরিণত হয়। এই পুকুরগুলি যথেষ্ট ভাল ভাবে রক্ষিত। এখন সমস্যা হল এই অঞ্চলগুলিকে পুনরায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, তাহলে বাকি থাকে নতুন করে ড্রেন পথ বিন্যাস করা। এরপরের বিচার্য বিষয় হল, ঠিক কেমন করে ড্রেন পথের বিন্যাস করলে শহরের বর্জ্য পদার্থ সঠিক ভাবে নিষ্কাশিত হবে সেটি ঠিক করা। সুতরাং শুরুতেই একাধিক চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগর শহরের ড্রেন বিন্যাসের কার্যক্রমের যাত্রা শুরু। এমতাবস্থায় ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বেশ দুরূহ হয়ে ওঠে।

মোটামুটি ভাবে কৃষ্ণনগরে ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাস সম্পর্কে সরকারি তরফে খানিকটা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট রোড সেস কমিটি এবং নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের মেডিক্যাল এন্ড মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্টে একটি যৌথ রেজোলিউশনের রিপোর্ট পাঠান ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে। এই রেসোলিউশনে তাঁরা লেখেন খুব তাড়াতাড়ি কৃষ্ণনগর শহরে ড্রেন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং অঞ্জনা নদীর সংস্কার করা হবে।[35]

এক্ষেত্রেও কতগুলি সমস্যা দেখা দেয়। প্রকল্প রূপায়ণে যে অর্থের প্রয়োজন তা কীভাবে জোগাড় করা হবে, তা নিয়ে বেশ সংশয় তৈরি হয়। দেখা যায় অঞ্জনা নদী পরিষ্কার করতে প্রায় এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা খরচ হবে। পনেরো হাজার টাকা স্থানীয় পরিসর থেকে

[35] Municipal, Sanitation, Coll-3, File-6, Proceedings-24, July 1883

জোগাড় করার ব্যবস্থা করা হয়। বাকি এক লক্ষ টাকার মধ্যে বলা হয় সরকার মিউনিসিপ্যালিটিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে। বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা কীভাবে জোগাড় করা হবে, সেই নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমে বলা হয়, এই বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা সরকারি তরফে মিউনিসিপ্যালিটিকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। মিউনিসিপ্যালিটি বার্ষিক চার হাজার টাকার কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় মিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যয়ভার গ্রহণ করতে প্রায় অক্ষম। মিউনিসিপ্যালিটি এর জন্য আলাদা করে কর ধার্য করতে পারছে না বা গৃহ করের পরিমাণও বাড়াতে পারছে না, শহরের অধিবাসীবৃন্দের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে। সেই সঙ্গে হয়ত জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ও ছিল। এই অবস্থায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণের সুদ দেওয়ার অর্থ আরও দুই হাজার টাকা প্রায় অতিরিক্ত লোকসান করা।

এমতাবস্থায় এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে সরকারও অতিরিক্ত খরচ বহন করবে না, মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক অবস্থাও বেশ খারাপ। এদিকে, কৃষ্ণনগরের পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে পড়ে যে ড্রেন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন একান্ত আবশ্যক হয়ে ওঠে। সরকারি তরফে শহরের সম্পন্ন বাসিন্দাদের থেকে আর একটু বেশি পরিমাণে আর্থিক অনুদান সংগ্রহের পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া বলা হয় বর্ধমান বা ভাগলপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে যেমন ওপেন মার্কেট থেকে ঋণ জোগাড় করতে বলা হয়েছে, কৃষ্ণনগরও সেই একই পথ অনুসরণ করতে পারে।[36]

এছাড়া দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়, সুষ্ঠু ড্রেন ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের ড্রেন সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং এর পরে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সাউথ ওয়েস্টার্ন সার্কেলের নদীয়া ডিভিসনের ইঞ্জিনিয়ার J.C.

[36] Ibid, Proceedings-29

Varten(জে.সি. ভার্টেন)-এর পরিকল্পনাতে[37] অঞ্জনা নদীখাতকে চওড়া করা এবং একে জলঙ্গির সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়। কিন্ত ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থার যে সংস্কার করা হয়েছিল, তাতে অঞ্জনা নদীর ধারা যে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেই বিষয়ে কিছু করা হয়নি। অঞ্জনা নদীখাত যে মাঝে মাঝে অধিগৃহীত হয়ে প্রায় ব্যক্তিগত পুকুরে পরিণত হয়েছিল সেই বিষয়েও কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং সেই পুকুরগুলিকেই অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনার অভাবে এই ব্যবস্থা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অকার্যকরী হয়ে পড়ে। ১৮৮০-এর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অঞ্জনা নদীকে তার পুরোনো অবিচ্ছিন্ন ধারা ফিরিয়ে দিতে জমি অধিগ্রহণ আশু প্রয়োজন হয়ে ওঠে। জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করেও নানান ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়।

কৃষ্ণনগর শহরের ড্রেন ব্যবস্থা আজও একটি অমীমাংসিত বিষয়। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলি পরিষেবা, মিউনিসিপ্যালিটি, ব্যক্তিগত স্বার্থ, জনস্বাস্থ্য রক্ষার সরকারি ওজর এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে পৌর নাগরিকত্ব গঠনের জটিল-বহুমুখী প্রক্রিয়ার বিকাশকেও সংযুক্ত করে। ব্যক্তিগত অধিগ্রহণ থেকে অঞ্জনা নদীখাতের অংশ উদ্ধার করে অবিচ্ছিন্ন ধারা খনন করার প্রসঙ্গ, একটি বৃহত্তর সমস্যাকে চিহ্নিত করে। মিউনিসিপ্যালিটির প্রকল্পগুলি নাগরিক স্বার্থে নির্মিত। তাই ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে পৌর নাগরিক স্বার্থের সংঘাতের একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। এই সংঘাত হয়তো চিরকালীন, যার জারণ-বিজারণে বারবার পৌর নাগরিকত্ব তার অবিরত নির্মাণ প্রক্রিয়া জারি রেখেছে।

[37] Municipal, Branch Sanitation, Coll-3, File-6, Proceedings 30, September 1883

পঞ্চম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি শহর দার্জিলিং-এর জল সঞ্চালন: যেখানে জল প্রবল বেগে নিম্নমুখী

বসন্তের শুরুতে দার্জিলিং বেশ মোহময়। নীল আকাশ, পাইনের ঝরে পড়া পাতা, দূর পাহাড়ের নতুন সবুজের সমারোহ, তাতে রংবাহারি রডোডেনড্রন । পাহাড়ের রানি কাঞ্চনজঙ্ঘা তো তার রূপের ডালি নিয়ে বসেই আছে। তার ওপর ম্যাগনোলিয়া ফুলের বাহার-- সব মিলিয়ে প্রকৃতি তার রূপরাশির খুশির বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে সুগন্ধি বাতাসে। কিন্তু প্রকৃতির এই আনন্দের মাঝে লুকিয়ে আছে হাহাকার। সারা দার্জিলিং তখন প্রবল জল সংকটে। মিউনিসিপ্যালিটির জলের কলগুলির সামনে জেরিকেনের লম্বা লাইন। দুই-তিন দিন অন্তর শীর্ণ ধারায় জল আসছে। ঝর্ণাগুলিও বর্ষার জলের অভাবে শুকনো। ম্যাটাডোরে করে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে জল আসছে শহরে। শহরের বাসিন্দারা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন সেই জল। পরিমল ভট্টাচার্য উনিশশো নব্বই-এর দশকে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে চাকরিসূত্রে এসে একটি বই লেখেন *'No Path in Darjeeling is Straight Memories of a Hill station'.* স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে দার্জিলিং সম্পর্কে প্রথম এই চিত্রই ভেসে উঠেছে তাঁর মনে। তাই বইয়ের দ্বিতীয় পাতাতেই এই বিবরণ।[1]

এরপর উত্তপ্ত সমতটের বাষ্পরাজি কুণ্ডলী পাকিয়ে পাহাড়ে উঠলে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে পাহাড়ে। সিঞ্চল লেকের ঝর্ণাগুলো জলে ভরে ওঠে। প্রাণ ফিরে আসে দার্জিলিং শহরে। মিউনিসিপ্যালিটির জলের পাইপ লাইনে জলের কলকল শব্দ, শুকনো ঝর্ণায় জলের শব্দ,

[1] Parimal Bhattacharya, *No Path in Darjeeling is Straight Memories of a Hill Town*, Speaking Tiger Publishing PVT. LTD., Page-2, 2017, New Delhi

শূন্যপাত্রে জল ভরে ওঠার শব্দ বোধহয় দার্জিলিং–এর বাসিন্দাদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর সঙ্গীত।[2]

এখন প্রশ্ন হল এতগুলো দক্ষিণবঙ্গের জেলা নিয়ে আলোচনা করার পর কেন হঠাৎ দার্জিলিং? উত্তর অনেকগুলো। প্রথমে Fernand Braudel (ফার্নান্দ ব্রদেল)-এর কথাতেই বলি। ভূগোল তার নিঃশব্দ প্রভাব রেখে যায় ইতিহাসের ওপর। মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাসও তাই শহরের ভৌগোলিক অবস্থানের পার্থক্যে ভিন্নতর হয়ে ওঠে। এই ভিন্নতা পরিষেবার বিনিময়ে কর আদায়ের চিত্রটির সাম্রাজ্যবাদী রূপটিকে আরও প্রকট ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। আর দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের একটি শহরের মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে আলোচনা করলে ঔপনিবেশিক বাংলায় মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার (জল সরবরাহ ও ড্রেন ব্যবস্থা) একটি কোলাজ পাব আমরা। এই কোলাজ চিত্র অবশ্য সামগ্রিকতার একটি রূপ নয়। বরং বিভিন্নতার খণ্ডচিত্র।

বৈষম্যমূলক বিভিন্নতা

দার্জিলিং-এর মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন অনেকগুলো। দার্জিলিং-এ মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা এত গুরুত্ব পেল কীভাবে? পরিষেবাগুলি কতটা এখানকার দেশীয় অধিবাসীদের কথা ভেবে করা? আর কতটাই বা ঔপনিবেশিক স্বার্থ প্রণোদিত? বিশ শতকের শুরুতে যখন দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ দিন দিন সংকুচিত করা হচ্ছে তখন দার্জিলিং আগের ঋণ শোধ না করা সত্ত্বেও সরকারি ঋণ পেয়ে চলেছে। এমনকি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কোনও ক্ষেত্রে বর্ধিত ঋণের পরিমাণ দেখে ঋণ নিতে না চাইলেও তাকে একপ্রকার জোর করে আধুনিক পরিষেবা চালু করার জন্য ঋণ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে, এমন নজিরও আছে। উদারনৈতিক সমতার কথা বলে কেন এই

[2] Ibid, page-3

বৈষম্য? দার্জিলিং-এ কোন মহামারীর প্রকোপ পড়েনি সেই ভাবে, তাহলে এই তৎপরতার কারণই বা কী? আলোচনার শুরুতেই এই অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হওয়া বেশ জরুরি। সার্বিক ভাবে বৈষম্যের ধরন বুঝতে সুবিধা হবে খানিকটা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সদর শহরের মিউনিসিপ্যালিটির জল সঞ্চালন পরিষেবার সঙ্গে বৈষম্য ও বৈপরীত্যের চিত্র প্রতিষ্ঠা করে, দার্জিলিং শহরের মিউনিসিপ্যালিটির জল সঞ্চালন পরিষেবা সম্পর্কে আলোচনার চয়নকেও যৌক্তিক বৈধতা দেওয়া যাবে।

মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার ধরন বা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গের শহরগুলির থেকে একেবারে আলাদা দার্জিলিং। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে শহর। নগর বিন্যাস সমতলের শহরগুলির থেকে একেবারেই আলাদা। জলের সাম্যের নীতি যা মেনে সমতলের শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ করা হয়, তা দার্জিলিং-এ একেবারেই প্রযোজ্য নয়। সমতলের শহরগুলিতে মেন পাইপের জল ডিস্ট্রিবিউসন পাইপের মাধ্যমে সমভাবে পরিবাহিত হয়। জল সমান উচ্চতায় তার স্বাভাবিক নিয়মে সমান ভাবে বণ্টিত হয়। পাহাড়ি জায়গায় এই নিয়ম একেবারেই খাটে না। বন্ধুর, অসমতল ভূ-প্রকৃতি এই নিয়ম মেনে জল সরবরাহের অন্তরায়। বরং জল এখানে স্বাভাবিক গতিজাড্যের নিয়মে নীচের দিকে ধাবিত হয়। তাই পাহাড়ের প্রতি ঢালে সমান ভাবে জল সরবরাহ করতে মিউনিসিপ্যালিটিকে সমতলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় । জলের উৎসও আলাদা পাহাড়ি অঞ্চলে। সমতলের জল সরবরাহ প্রকল্প মূলত নদীর জলের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে পাহাড়ের জল সরবরাহ প্রকল্প ঝর্ণার জলের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। ঝর্ণার জল উঁচু পাহাড় থেকে নিচে আছড়ে পড়ে প্রবল গতিতে। এই গতিকে মোকাবিলা করে সব থেকে বেশি পরিমাণ জল ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে মিউনিসিপ্যালিটিকে বেশ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে সমতলের থেকে একেবারে আলাদা পন্থা অবলম্বন করতে হয়। আবার ড্রেন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কারোর বাড়ির বাথরুম বা অন্যান্য গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত জল যদি

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তার নীচের ঢালে অবস্থিত বাড়ি-ঘরে এসে পড়ে সে এক বিশ্রী ব্যাপার। সেই জন্য ড্রেন ব্যবস্থ্যার বিশেষ বিন্যাস করতে হয়েছে দার্জিলিং-এ। সমতলের সমান্তরাল ড্রেন ব্যবস্থার বদলে এখানে পাহাড়ের ঢালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ড্রেন ব্যবস্থা তৈরি করতে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক অতীতচারণ

এখন প্রশ্ন হল কেন পাহাড়ি একটা এলাকায় হঠাৎ মিউনিসিপ্যালিটি পরিষেবা দেওয়া নিয়ে এত তৎপরতা? দার্জিলিং শহরের অতীতের দিকে ফিরে তাকালে আমরা এই বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা পেতে পারি। দার্জিলিং ছিল সিকিমের রাজা বা চোগিয়ালদের সম্পত্তি। দার্জিলিং মানে স্থানীয় ভাষায় দেবতাদের আবাস। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ দার্জিলিংসহ সীমানাবর্তী কিছু অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সিকিম ও নেপালের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই বিরোধের নিষ্পত্তি করার জন্য গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর দুই অফিসারকে পাঠান। Captain George Alymer Lioyd এবং J.W.Grant। ক্যাপ্টেন লিয়ড এই সময় দার্জিলিং-এ ছয় দিন থাকেন এবং এখানে স্যানিটোরিয়াম তৈরি করার অপূর্ব সুযোগ দেখতে পান। বেন্টিঙ্কও ক্যাপ্টেন লিয়ড-এর কথায় সম্মত হন। বেন্টিঙ্ক এই জায়গাটির গুরুত্ব বুঝে এখানে একটি মিলিটারি ক্যাম্প তৈরির কথাও ভাবেন। সিকিমের চোগিয়ালকে এই স্থানে স্যানিটোরিয়াম তৈরি করার পরিকল্পনা জানান বেন্টিঙ্ক। চোগিয়াল ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এই অঞ্চল গভর্নর জেনারেলকে দিয়ে দেন। চোগিয়াল একটি ডিডের মাধ্যমে জানান, গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে বড় রঙ্গিত নদীর দক্ষিণে, বালাসোর- কাহাইল এবং ছোট রঙ্গিত নদীর পূর্বে এবং রংপো ও মহানদী নদীর পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তিনি হস্তান্তর করেছেন। এখানকার ঠান্ডা আবহাওয়া গভর্নমেন্টের চাকুরেদের সুস্বাস্থ্যের সহায়ক হবে বলে মনে করা হয়। এর বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে সিকিমের চোগিয়ালকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে এর পরিমাণ আরও ছয় হাজার টাকা বাড়ানো হয়।

১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের এক সদস্য Dr. Archibald Campbell(আর্চিবল্ড ক্যাম্পবেল) এবং Lieutenant Napier(লেফট্যানেন্ট নাপিয়ার) দার্জিলিং-এ হিল স্টেশন স্থাপন এবং এর উন্নতি বিধানের জন্য নিযুক্ত হন। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ডঃ ক্যাম্পবেল এই স্যানিটোরিয়ামের প্রথম সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে তৈরি হয় দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন। দার্জিলিংকে শহর হিসেবে গড়ে তোলার তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৮-৩৯ খ্রিষ্টাব্দে এই অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় এবং বিভিন্ন প্লটে বিভক্ত করা হয়। এই বছর-ই সমতলের সঙ্গে যুক্ত হয় দার্জিলিং। পাঙ্খাবাড়ি হয়ে পাকদণ্ডী রাস্তা চলে যায় দার্জিলিং-এ। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ডঃ ক্যাম্পবেল কুমায়ুন অঞ্চল থেকে আনা চিনা চা গাছ পরীক্ষামূলক ভাবে দার্জিলিং-এ লাগান। এই পরীক্ষা ভীষণ সফল হয়। বাণিজ্যিক ভাবে বিভিন্ন চা বাগান গড়ে উঠতে থাকে।

দার্জিলিং-এ কাজের সুযোগ দিন দিন বাড়তে থাকে। সিকিম এবং নেপাল থেকে বহু মানুষ কাজের আশায় চলে আসতে থাকে দার্জিলিং-এ। এই ব্যাপক অভিবাসন সিকিমের সামন্তপ্রভুদের চিন্তায় ফেলে দেয়। দার্জিলিং-এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সিকিমের চোগিয়ালকে ঈর্ষাণ্বিত করে তোলে। Dr. Campbell(ড: ক্যাম্পবেল) এবং Sir Charles Darwin(স্যার চার্লস ডারউইন)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ Sir Joseph Dalton Hooker(স্যার যোসেফ ডাল্টন হুকার) সিকিম পরিভ্রমণে যান ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। চোগিয়াল, ক্যাম্পবেল এবং হুকারকে বন্দি করেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কোম্পানি তাদের উদ্ধার করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠান। সেনাবাহিনী রঙ্গিত নদী অতিক্রম করলেই চোগিয়াল ত্রস্ত হয়ে বন্দী অফিসারদের মুক্তি দিয়ে দেন। দার্জিলিং-এর ওপর ব্রিটিশদের অধিকার আরও সুদৃঢ় হয়।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে চালু হয়। সমতলের সঙ্গে পাহাড়ের যোগাযোগ আরও মসৃণ হয়। ১৮৯১ সালে তৈরি হয় দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন। এই দার্জিলিং হিমালয়ান

রেলওয়ের জন্য বরাদ্দ হয় একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউন্ড। ব্রিটিশ রাজের তরফ থেকে এই সময় অবধি এত বড় অঙ্কের বিনিয়োগ আর হয়নি। এর থেকেই দার্জিলিং শহরকে গড়ে তোলার পেছনে ব্রিটিশদের উৎসাহের বহর খুব সহজেই টের পাওয়া যাচ্ছে।

স্কটিশ মিশনারিরা ইতিমধ্যে তাদের ইভানজেলিক্যাল উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছেন নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি হয়েছে সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চ। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লরেটো কনভেন্ট, ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট পলস স্কুল, ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট জোসেফ স্কুল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকারও শহরটিকে নিজেদের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি হয়েছে দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি। এরপর একে একে গড়ে ওঠে প্ল্যান্টার্স ক্লাব, বোটানিক্যাল গার্ডেন, টাউন হল ইত্যাদি। দার্জিলিং শহরটা ব্রিটিশদের বেশ মনে ধরে। সমতলের তীব্র গরমের অস্বস্তি থেকে মুক্তি তো মিলতই সেই সঙ্গে ছিল ফেলে আসা ব্রিটেনের সঙ্গে আবহাওয়ার অদ্ভুত সাদৃশ্য।

ভাইসরয় লর্ড লিটন একদা এক বর্ষায় দার্জিলিং থেকে তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লেখেনঃ '...the afternoon was rainy and the road muddy, but such beautiful English rain, such delicious English mud!'[3]

স্বস্তি তো বটেই সেই সঙ্গে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পরে এর সঙ্গে জড়িয়ে যায় নিরাপত্তার প্রশ্ন। সমতল থেকে বেশ কয়েক হাজার ফুট ওপরে হিল স্টেশনগুলিতে বেশ নিরাপদ মনে করেন ঔপনিবেশিকরা। সেই সঙ্গে পাহাড়ের মানুষজনের আনুগত্য এবং সারল্যের সংমিশ্রণে এক ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যায়নও করে ফেলেন ব্রিটিশরা। দার্জিলিং-এর

[3] Lady Betty Balfour, *The History of Lord Lytton's Indian Administration* London: Longmans, 1899,p.220

লেপচা, সিমলার পাহাড়ি এবং উটাকামণ্ডের টোডা জনজাতিকে অনেকটা আস্থাভাজন বলে মনে করেন তারা। [4]

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সুয়েজ খালের মাধ্যমে ভারতে আসার রাস্তা চালু হয়ে যাওয়ার পরে ভারতে মেম সাহেবদের আসাও ক্রমশ বেড়ে যায়। দক্ষিণবঙ্গের মফস্বলে কর্মরত অফিসারদের স্ত্রী- রা মূলত দার্জিলিং-এই বসবাস করতে শুরু করে। ১৮৮০-এর দশকে বাঙালি বাবুদেরও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দার্জিলিং আসা ক্রমশ বেড়ে যায়। আমরা সেই বিখ্যাত ভাওয়াল রাজার অন্তর্ধানের ঘটনাও মনে করতে পারি যেটি হয়েছিল দার্জিলিং-এই। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিং-এ এসে এখান থেকেই অন্তর্হিত হন ভাওয়ালের মেজকুমার। [5]

সাহেব-মেমসাহেবদের বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার জন্য, নতুন তৈরি হওয়া হোটেলে চাকরি করতে, চা বাগানে কুলির কাজ করতে বা আরও নতুন তৈরি হওয়া কাজের সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বহু মানুষ আসেন দার্জিলিং-এ। মূলত শ্রমিক শ্রেণির এই জনতার দল ঘাঁটি গাড়েন শহরের একেবারে নিচু প্রান্তে। তৈরি হয় ভুটিয়া বস্তি।

ঔপনিবেশিকদের স্বাস্থ্য এবং স্বস্তিস্বরূপ দার্জিলিং

ভারতের অপরিচিত ভূমিতে ব্রিটিশ সভ্যতার আস্বাদ পেতে হিল স্টেশনগুলি ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। ম্যাল, হাঁটার জায়গা, ক্লাব, লাইব্রেরি, বাংলো অন্যান্য ইউরোপীয় আদলে বানানো স্থাপত্য-- সব মিলে সাহেবি কেতায় জীবনযাপনের উপাচারের সমাহার। তার সঙ্গে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হত দার্জিলিং বা সিমলার মতো হিল স্টেশনগুলি। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক চাহিদা অনুযায়ীও হিল স্টেশনগুলির 'স্পেস'-কে নির্মাণ করতে হয়েছে।

[4] H.V. BAYLEY, DORJE-LING (CALCUTTA, 1838), P.50

[5] Partha Chatterjee, A Princely Imposter:The Strange and Universal History of the Kumar of Bawal, Princeton University Press,2002, p-70

Queeny Pradhan (কুইনি প্রধান) তাঁর *'Empire in the Hills: Simla, Darjeeling, Ootcamund and Mount Abu, 1820-1920* বইতে বলেছেন, "The construction of physical structures befitting the 'state grandee' on his march to the hills implied a large scale modification of the environment and the geography of the hillsides.... the spatial patterns of urban growth in the hill stations were the result of a combination of cultural, technological, and power relationships of colonialism."[6]

দার্জিলিং শহরের নির্মাণে নগরায়ণের প্রক্রিয়ায় তাই 'colonial implant'-এর ছাপ অতি সুস্পষ্ট। দার্জিলিং শহরের প্রায় সর্বোচ্চ অঞ্চলে observatory Hill-এর ঠিক পেছনে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নিবাস স্থল 'The Shrubbery' । শহরের আর এক প্রান্তে জলাপাহাড়ের ওপরে প্রায় ৮০০০ ফিট উচ্চতায় মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। এই ভাবে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর দুই স্তম্ভ—আমলাতন্ত্র এবং সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ অবস্থানে বিন্যস্ত করে শাসনতন্ত্রের উদ্ধত মূর্ত রূপ যেন দার্জিলিং শহরের নগরায়ণের বিন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

শহরের উত্তরদিকের সম্পন্ন ব্রিটিশ সাহেবদের এস্টেট। Observatory Hill-এর খানিকটা নীচে চৌরাস্তা। এই চৌরাস্তা ম্যালের সঙ্গে শহরের দোকান বাজারকে যুক্ত করেছে। চৌরাস্তার কাছাকাছি ওপরের দিকের দোকানগুলো ইউরোপিয়ানদের। এই অঞ্চলেই Planters Club-টিও অবস্থিত। Observatory Hill-এর পশ্চিমে চার্চ এবং এই পাহাড়েরই একদম ওপরে ঔপনিবেশিকদের অবসর বিনোদনের জন্য জিমখানা ক্লাব। এই ক্লাবে আবার সরকারি সিভিল

[6] Queeny Pradhan, *Empire in the Hills: Simla, Darjeeling, Ootcamund and Mount Abu, 1820-1920*,OUP, NEW DELHI, 2017, p-134

সার্ভেন্ট না হলে প্রবেশ অধিকার নেই। এভাবে একেবারে নেটিভদের ছোঁয়াচ এড়িয়ে ঔপনিবেশিক শহরের বিন্যাস।

শহরের মধ্যভাগে নেটিভদের বাড়ি, দোকান-বাজার। তারও নীচের দিকে কাছারি, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস। শহরের একেবারে নিচু অঞ্চলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘিঞ্জি বাজার, ছোট ছোট বাড়ি ঘর।[7]

ঔপনিবেশিক প্রভুদের অচিরেই টেলর, খাবার-দাবারের দোকান, ফটোগ্রাফার ইত্যাদির প্রয়োজন হল। অচিরেই দেখা গেল সমতলের বিভিন্ন দোকান দার্জিলিং-এ তাদের শাখা বিস্তার করেছে। Smith and Stanistreet (chemist), Frank Ross (chemist), Boseck (jewellery), Whiteway, Laidlow & Co. (Draper), Hall and Anderson (Draper), Vodo's shop (Confectionery), Keventers (Confectionery), J.Othewille (nmilliner), Mitchell & Co. (tailor), Burlington Smith (photographer) ইত্যাদি বিভিন্ন দোকান তৈরি হয়।[8]

শহরের মধ্যে ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সচেতনতা ও মূল্যবোধ প্রতিফলনের সচেতন প্রচেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছিল। জিমখানা ক্লাবের সদস্যপদ শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সরকারি চাকুরেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। অবসর বিনোদনের মাধ্যমে উন্নাসিক আভিজাত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসেবে তারা এই ক্লাবটিকে ব্যবহার করতেন। দার্জিলিং শহরের ঔপনিবেশিকদের জন্য নির্মিত অংশ তার ম্যাল, ব্যান্ডস্ট্যান্ড ক্যাফে, বিলিয়র্ড টেবিলের মতো চকচকে রাস্তা ক্রমশ আধুনিকতা এবং শাসক হিসেবে যোগ্যতার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে।[9]

---

[7] Ibid, page-161

[8] Ibid, page-155

[9] Ibid, page-165

পাহাড়ি শহরগুলো ঔপনিবেশিকদের কাছে স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং প্রায় ব্রিটেনের আবহাওয়ায় বসবাস করার অঞ্চল হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। সমতলের অস্বাস্থ্যকর, ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে সব রোগের প্রকোপমুক্ত, হিল স্টেশন দার্জিলিং যেন কল্পনার 'সেই সব পেয়েছির দেশ', যা সমস্ত কলুষতা ও সমস্যামুক্ত। হিল স্টেশনকে সার্বিক ভাবে স্বাস্থ্যকর হিসেবে দেখাতে গিয়ে একে গ্রীক দেবী হাইজিয়ার নিবাস হিসেবেও দেখানো হয়েছে অনেক সময়।[10]

উনিশ শতকে বিভিন্ন লেখকদের লেখাতেও ধুলোবালি-ঘামমুক্ত দার্জিলিং শহর ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রসঙ্গটি পাওয়া যায়।

Newman তাঁর *Newman's Guide* লেখেন, "The mountain breezes are life-giving and charged with ozone, and at almost every inspiration those whose health may have suffered from a long residence in the plains of Bengal, feel as if they are adding days to their life."[11] *Newman* তার বইতে দার্জিলিং-এর বর্ষাকালের প্রসঙ্গে লেখেন "The water runs away down the hillside as rapidly as it falls, and roads are never muddy."[12]

ব্রিটিশরা যখন সমতলের বিভিন্ন ক্রান্তীয় রোগ বিশেষ করে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পর্যুদস্ত তখন দার্জিলিং অবশ্যই তাদের কাছে স্বস্তিস্বরূপ।

Newman তার বইতে লিখেছেন "On account of its elevation Darjeeling is above the reach of malaria...mosquotes are unknown in Darjeeling."[13] শুধু

---

[10] Ibid, page- 216

[11] Newman's Guide to Darjeeling and Neighbourhood: A Historical and Descriptive Handbook with an Account of Manners and Customs of Local People, 1919, Calcutta, Newman and co.page-54

[12] Ibid, page- 53

[13] Ibid, page-54

Newman নন, *O'Malley* -ও তার *Bengal District Gazetteer* -এ বলেছেন, " [A] thin, pallid and peevish child suffering from bowel complaint or intermittent fever in plains, acquired a rosy hue and regained strength, health and restless energy of an English child in hills." [14]

এছাড়া দেখা যায় এখানে শিশু মৃত্যুর হারও বেশ কম। প্রায় নেই বললেই চলে। তাই আগামী প্রজন্মকে সুস্থ সবল করে গড়ে তোলার জন্য শিশুদের এখানে রাখার প্রবণতা দেখা যায়। আর সেখান থেকেই এই শিশুদের সার্বিক শিক্ষার স্বার্থে এখানে গড়ে ওঠে একাধিক বোর্ডিং স্কুল। উনিশ শতক জুড়ে ইউরোপ জুড়ে মানবদেহ শীতপ্রধান আবহাওয়ারই বেশি উপযোগী এই ধারণা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।[15] তাই সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি সেনা ক্যান্টনমেন্টও হিল স্টেশনে স্থাপন করার প্রয়াস দেখা গেছিল। সমস্ত উনিশ শতক জুড়েই লেখক এবং পর্যটকেরা হিল স্টেশনে থাকার শারীরবৃত্তীয় উপকারগুলি যে পাহাড়ের 'বাতাস' এবং 'জল'-এর সুষ্ঠু প্রবাহের ফলস্বরূপ এই বিষয়ে বার বার জোর দেন।[16] সুতরাং সামাজিক চিকিৎসার স্বাস্থ্যবিধানের শর্তগুলিও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়।

শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র, সেনা ক্যান্টনমেন্ট, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রের পাশাপাশি বিশ শতকের শুরুর দিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দার্জিলিং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এর বিজ্ঞাপনের জন্য লিখিত একটি ম্যানুয়েল দার্জিলিং-এর আকর্ষণ তিনটি 'T'-মাধ্যমে ব্যক্ত করে... 'Tea', 'Teaching' এবং 'Tourism'. ইতিমধ্যে রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে বেশ। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ গঙ্গা থেকে শিলিগুড়ি অবধি প্রায় ১০৮ মাইল রাস্তা নির্মিত হয়। মূলত সৈন্য চলাচল এবং পর্যটকদের আসা- যাওয়ার জন্যই এই রাস্তা নির্মিত হয়।[17]

---

[14] O'Malley, *L.S.S. Bengal District Gazetteer*, Calcutta, page-57, 1907,

[15] Queeny Pradhan, Empire in the Hills: Simla, Darjeeling, Ootcamund and Mount Abu, 1820-1920,OUP, NEW DELHI, 2017, p- 221

[16] Ibid, page-219

[17] Ibid, page-139

রেলপথ নির্মাণের পর এই যাতায়াত আরও সহজ হয়। ১৮৮০-এর দশক থেকে শুরু হয়ে মোটামুটি বিশ শতকের শুরুর দিকে বিভিন্ন পর্যায়ে এই রেলপথ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি অবধি রেলপথ বিস্তৃত হয়। এরপর ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ দার্জিলিং অবধি রেলপথ বিস্তারের কাজ শুরু হয়। প্রথমে তিনধরিয়া অবধি রেলপথ নির্মিত হয়। তারপর কার্সেয়ং। এরপর এই রেলপথের সর্বোচ্চ স্টেশন ঘুম অবধি বিস্তৃত হয় রেলপথ। এরপর বাতাসিয়া লুপের বিখ্যাত U টার্ন ঘুরে রেলপথ বিশ শতকের প্রথম দিকেই ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পৌঁছোয় দার্জিলিং-এ। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে একজন ব্যক্তির কলকাতা থেকে দার্জিলিং পৌঁছতে খরচ হত ১৭৬ টাকা। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তা কমে হয় ১২৩ টাকা। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ফার্স্ট ক্লাসে দার্জিলিং আসতে খরচ কমে দাঁড়ায় ৪৯ টাকা।[18]

দার্জিলিং-এ আসার ব্যয় এবং পথকষ্ট লাঘব হওয়াতে দিন দিন পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তৈরি হতে থাকে একের পর এক হোটেল। The Darjeeling Family Hotel (দ্য দার্জিলিং ফ্যামিলি হোটেল), Wilson Hotel (উইলসন হোটেল), Woodlands Hotel (উডল্যান্ডস হোটেল), Rockville Hotel (রকভিলে হোটেল), Bellevue Hotel (বেলভিউ হোটেল), ইত্যাদি হোটেল তৈরি হয়। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে একশ কুড়ি রুমের আধুনিক বিভিন্ন সুবিধা সম্পন্ন Billiards table, Dance Hall, Tennis courts যুক্ত Hotel Mount Everest নির্মিত হয়। [19] পর্যটকদের ভিড়, সেই সঙ্গে নেপাল-ভুটান-সিকিম থেকে আসা শ্রমিকদের সংখ্যাও বাড়ে পাল্লা দিয়ে।

বর্ধিত বহিরাগত জনসংখ্যা ঔপনিবেশিকদের মধ্যে কিন্তু শঙ্কার জন্ম দেয়। সার্বিক ভাবে শহরের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে দেখা দেয়। শহর পরিচালনার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি তৈরি হয়েছিল আগেই। ক্রমশ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও নাগরিক জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে মিউনিসিপ্যালিটি।

---

[18] W.J.Buchanan , 'Notes on Old Darjeeling, Bengal Past And Present: Journal of the Calcutta Historical Society, Vol.II, October, No-6, 1907, page-457

[19] E.C. Dozey, A Concise History of Darjeeling since 1835 with a complete Itinerary of Tours in Sikkim and the District. Calcutta and Darjeeling 1989, page-27-29

শহর পরিচালনায় মিউনিসিপ্যালিটি

নতুন তৈরি হওয়া শহরে নাগরিক পরিষেবা এবং তাকে পরিচালনার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে শহর পরিচালনার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি তৈরি হওয়ার বিষয়টি আগেই উল্লেখ করেছি। শহরটি তৈরির উদ্দেশ্য এবং ভৌগোলিক বিভিন্নতা পরিষেবাগুলির পরিচালন পদ্ধতিকে অন্যান্য শহরের থেকে ভীষণ ভাবে আলাদা করে দিয়েছে। জল সরবরাহ প্রক্রিয়ার বা ড্রেন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ আলাদা রূপ দেখতে পাব আমরা। এর পাশাপাশি আলোচনা সাপেক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডের এমন কিছু বিষয় আমাদের সামনে উঠে আসবে যেগুলির পরিচয় আমরা অন্য কোনও মিউনিসিপ্যালিটিতে পাইনি। শহরের ঔপনিবেশিক গুরুত্বের সাপেক্ষে উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ, মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনায় ঔপনিবেশিক স্বার্থ অনুযায়ী বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন (যদিও ওপরে নিয়ম-নিষ্ঠায় সমতা দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা) এবং আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও চাহিদার ভিত্তিতে নির্মিত-পরিচালিত প্রকল্পগুলি ঔপনিবেশিক নাগরিকতাকে একটু অন্য নিরিখে বুঝতে সাহায্য করবে।

দার্জিলিং-এ মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হয় ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। মানে মিউনিসিপ্যালিটি তৈরি হওয়ার প্রায় আঠাশ বছর পরে। শুরুর দিকে মিউনিসিপ্যালিটির নজর ছিল বরং একটু অন্যদিকে। শহরটিকে হিল স্টেশন হিসেবে তৈরি করা এবং ব্রিটিশদের বাসযোগ্য করে তোলা।

হোটেল ও বাংলো নির্মাণের প্রাথমিক গুরুত্ব

১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দার্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার এবং দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান B.W.D.Morton (বি .ডাব্লু. ডি. মর্টন) সাহেব কোচবিহারের কমিশনারকে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি লেখেন Mr. Smith (মি. স্মিথ) নামে জনৈক ব্যক্তি একটি বেকারি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পত্তি বন্ধক রেখে মিউনিসিপ্যালিটির থেকে লোন নেন। সেই লোন

এখনও তিনি মেটাতে পারেননি। এখন আবার তিনি নতুন করে হোটেল ব্যবসা শুরু করতে চান। তাই মিউনিসিপ্যালিটির থেকে তিনি আবার ছয় হাজার টাকা লোন নিতে চান। জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে মর্টন সাহেব এই লোন দেওয়ার সপক্ষেই মত দেন।[20]

দার্জিলিং-এর উন্নয়নের জন্য তৈরি হয় দার্জিলিং উন্নয়ন ফান্ড। মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে এর অর্থ কীভাবে খরচ করা হবে, সেই প্রসঙ্গে দার্জিলিং-এ ক্রমবর্ধমান পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে প্রথমেই গুরুত্ব পায় হোটেল এবং বাংলো তৈরির বিষয়টি, তারপর গুরুত্ব পায় জল সরবরাহ ব্যবস্থাটি আরেকটু উন্নত করার দাবি।[21] আমরা এখনও অবধি যে সব মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি তাতে কোথাও মিউনিসিপ্যালিটির তহবিল থেকে হোটেল নির্মাণের জন্য টাকা ধার দেওয়া বা উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ টাকা হোটেল-বাংলো নির্মাণের সাবুদ পাইনি। এই হোটেল গুলিতে নব নির্মিত হিল স্টেশনে সাহেবরা তো আরাম করে থাকতে পারবেই, সেই সঙ্গে বাঙালি বাবুর দলও সাহেবদের অনুকরণে অবসর কাটাতে বা স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এসে সাহেবিকেতার থাকার জায়গা পাবে। হোটেলগুলির শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ট্যাক্স-এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিকদের সরকারি তহবিলের আয়ও মন্দ হবে না। তাই মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডকে প্রথমে হোটেল নির্মাণের দিকে ব্যাপৃত রাখার ইতিবৃত্ত দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটিকে অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির থেকে আলাদা করেছে বৈকি। সেই সঙ্গে আর একটা বিষয়ও খুব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটি যতই মুখে নাগরিক পরিষেবার দিকটি প্রাধান্য দিক না কেন, উপনিবেশের ক্ষেত্রে সেটা সবটাই ঔপনিবেশিক স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে।

১৮৩০ – এর দশক থেকে ইংল্যান্ডে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কর্মকাণ্ড নতুন ভাবে নির্ধারিত হতে থাকে। প্রথম দিকের মিউনিসিপ্যালিটি গুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল শহরে পুলিশি নিরাপত্তা

[20] JUDICIAL PROCEEDINGS, PROCEEDINGS-145-146, JULY-1868

[21] FINANCIAL PROCEEDINGS, BRANCH- MUNICIPAL, PROCEEDING-9, JULY-1879

দেওয়া। কিন্তু পরবর্তীকালে এর উদ্দেশ্য ক্রমশ বদলে যায়। মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে শহরের সার্বিক স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সম্পন্ন মানুষদের সামনে থেকে শহরের দারিদ্র্যজনিত কদর্য্য রূপকে একটু আড়াল করে বেশ একটা সুখী বাতাবরণ তৈরি করা। Benjamin Ward Richardson (বেঞ্জামিন ওয়ার্ড রিচার্ডসন) নামক এক ব্রিটিশ ডাক্তারের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে লেখা উনিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর লেখায় আদর্শ শহরের স্বাস্থ্যসম্মত রূপ কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে বেশ খানিক আলোচনা আছে। তিনি বলেন, চওড়া রাস্তার ধারে সাদা বা ছাই রঙের পাথরে তৈরি নিচু বাড়ি, বাড়িগুলোতে বড় বড় জানলা-- এই হল আদর্শ শহরের রূপ। চওড়া রাস্তা, তার পাশে হাল্কা রঙের ছোট ছোট বাড়ি শহরে সূর্যালোক প্রবেশের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। এরপরে শহরের সার্বিক স্বাস্থ্যরক্ষার পর্যায় বাড়িগুলিতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা। আসলে স্বাস্থ্য বিষয়টা ঠিক চোখে দেখা যায় না বা নির্মাণও করা যায় না। পরিষ্কার রাস্তাঘাট, নগর পরিকল্পনা এবং পরিচালনার মধ্য দিয়ে একে উপলব্ধি করতে হয়।এর মাধ্যমে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, রুচিবোধ, সুস্থতা এবং উৎপাদনশীলতাকে বাড়নো যায়।[22]

স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান মেনেই ব্রিটিশরা তাদের নবনির্মিত শহরে প্রথমেই নজর দেন রাস্তার ধারে উপযুক্ত জায়গা ছেড়ে নিচু সাদা বা ছাই রঙা পাথরে বাংলো বানানোর দিকে। তাই অন্যান্য শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটির ফান্ড বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা না হলেও, দার্জিলিং যেহেতু মূলত নিজেদের বসবাসের জন্য ব্রিটিশদের হাতে তৈরি হয়েছিল; তাই এখানে পরিকল্পিত ভাবে বাংলো নির্মাণের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ফান্ড থেকেও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে সাহেবদের গ্রীষ্মকালীন আবাস হিসেবে দার্জিলিং-এর গুরুত্ব নেহাত কম নয়। লেফটন্যান্ট

[22] BENJAMIN WARD RICHARDSON, HYGEIA: A CITY OF HEALTH, LONDON, MACMILLAN, 1876, PAGE- 20, 24, 30, 42

গভর্নরসহ প্রায় সমস্ত আধিকারিকরাই তাদের অফিস নিয়ে গ্রীষ্মকালে গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে চলে আসতেন দার্জিলিং-এ।

জলের জোগান

বাংলো নির্মাণের পরেই গুরুত্ব পায় পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের বিষয়টি। খোদ লেফটন্যান্ট গভর্নরের নির্দেশের গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের তরফ থেকে A. Mackenzie (এ. ম্যাকেঞ্জি) রাজশাহী ডিভিসনের কমিশনারের কাছে দার্জিলিং-এর জল সরবরাহ বিষয়ে একটি চিঠি লেখেন ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এতে তিনি লেখেন দার্জিলিং শহরে ইতিমধ্যে লোহার পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ শুরু হয়েছে ঠিক-ই কিন্তু জলের জোগান প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম।[23] ইতিমধ্যে দার্জিলিং সমতলের সঙ্গে রেলপথের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে, ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ দার্জিলিং-এ আসতে শুরু করেছে। শুরুর দিকে খুব অল্প সংখ্যক ঝর্ণার জলকে পাইপবন্দি করে সরবরাহ করা হত। ঝর্ণাগুলির উৎস মূলত দার্জিলিং থেকে আরও একটু উঁচুতে অবস্থিত সিঞ্চল লেকে। রকভিলের কাছে তৈরি করা হয় রিজার্ভার। চার ইঞ্চি চওড়া পাইপের মধ্যে আলুবাড়ি থেকে ক্যালক্যাটা রোড হয়ে জলাপাহাড় অবধি জল সরবরাহ করা হত।[24]

সিঞ্চল লেকেই জলের জোগান বাড়ানোর পরামর্শ দেন ম্যাকেঞ্জি সাহেব। প্রয়োজনে আরও বেশি সংখ্যক ঝোরার জল ট্যাপ বন্দি করার কথা বলেন। এরপর দার্জিলিং-এ গোটা শহরের আরও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাইপ লাইন বিস্তৃত করার জন্য P.W.D-র ইঞ্জিনিয়ার Mr.Tindal (মি. টিন্ডাল)-কেও নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা লোনও বরাদ্দ করা হয় এই প্রকল্পে। বলা হয় তিরিশ বছরের মেয়াদে এই লোন শোধ করতে হবে। এবার

[23] FIANCIAL DEPARTMENT,MUNICIPAL(MIS), COLL-8, PROCEEDINGS 34-36, AUGUST-1878

[24] MUNICIPAL, FILE-M3L-5,PROCEEDINGS 52-71,NOVEMBER-1892

আমরা একটু সমসাময়িক দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের হিসেবটা দেখে নিই। তাহলে এই বৃহদঙ্কের লোন মিউনিসিপ্যালিটি আদৌ মেটাতে পারবে কি না এই বিষয়টি আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

HOUSE TAX --- 5028

HORSE TAX --- 579

BAZAR RENT --- 11732

RENT OF LOCATIONS --- 4484

RENT OF NATIVE VILLAGE --- 1231

POND FINES --- 229

ALL OTHER SOURCES VIZ. HOSPITAL SUBSCRIPTION, --- 4583

SALE OF GARDEN PODUCE

27868[25]

এই হিসেবের নথি থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার খরচ মিটিয়ে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকার লোন মেটানো প্রায় অসম্ভব। গভর্নমেণ্ট অব ইন্ডিয়াও এই বিষয়টি অনুধাবন করেন। গভর্নমেণ্ট অব ইন্ডিয়ার তরফ থেকে বলা হয় যে সরকার এই মুহূর্তে লোন দিতে অপারগ । খোলা বাজার থেকে মিউনিসিপ্যালিটি লোন নিলে সরকারের কোনও অসুবিধা নেই।[26] এদিকে লেফট্যানেন্ট গভর্নর তাঁর গ্রীষ্মকালীন

[25] JUDICIAL, BRANCH-MUNICIPAL, PROCEEDINGS-47-56, AUGUST-1876

[26] FINANCIAL, BRANCH-MUNICIPAL, PROCEEDINGS-5, FILE-41, MARCH 1879

স্থিতির জন্য দার্জিলিং-এ জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে প্রায় বদ্ধ পরিকর। তাই তিনি বিধান দেন কোচবিহার এস্টেট থেকে লোন সংগ্রহ করতে। কোচবিহার এস্টেট মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি বন্ধক রেখে বার্ষিক ৬% হারে সুদের বিনিময়ে লোন দিতে রাজি হয়।[27]

এরপর দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ বিষয়ে আবার সরকারি আধিকারিক মহলে কথাবার্তা শুরু হয় **১৮৯১** খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ। মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে সরবরাহ করা জলের পরিমাণ বাড়ানো আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখন গৃহস্থালির দৈনন্দিন প্রয়োজনের পাশাপাশি আরেকটি নতুন বিষয়ের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির জল খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নতুন তৈরি হওয়া হিল স্টেশনটিতে দূষিত জল নিষ্কাশনের জন্য তৈরি হয়েছে ড্রেন ব্যবস্থা। এই ড্রেন গুলিকে নিয়মিত পরিষ্কার রাখার জন্য খুব জোরে ক্রমাগত কিছুক্ষণ পরিষ্কার জলপ্রবাহ করা খুব জরুরি হয়ে ওঠে। মিউনিসিপ্যালিটির সরবরাহ করা জলের পরিমাণ বাড়াতে তদানীন্তন ভাইস চেয়ারম্যান Mr.M.Power (মি. এম. পাওয়ার) জলের পরিমাণ বাড়ানোর কিছু সম্ভাব্য উপায় বাতলে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। তিনি সমগ্র জল সরবরাহ প্রকল্পটি পরিদর্শন করে বলেন বর্তমানে সিঞ্চল লেকের এক থেকে সতেরো নম্বর ঝর্ণার জল ব্যবহার করা হয় জল সরবরাহ প্রকল্পে। কিন্তু এই জল চার ইঞ্চি পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এই পাইপের বদলে ছয় ইঞ্চি পাইপ ব্যবহার করলে জল নষ্ট অনেক কম হবে। এছাড়া সিঞ্চল লেকের সাত হাজার ফিট ওপরের ঝর্ণাগুলিকেও ব্যবহার করলে জলের পরিমাণ বাড়বে। এরপর রিজার্ভারে জল জমা করার পালা। রিজার্ভারটি পাথরের তৈরি হওয়ায় এতে প্রচুর ফাটল আছে, ফলে বহু জল এখান থেকে বেরিয়ে যায়। পাওয়ার অবশ্য এর থেকেও বড় আর একটি রিজার্ভার তৈরির কথা বলেন। জল ফিল্টার করার জন্য একটি ফিল্টার ট্যাঙ্ক তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি রিপোর্টে লেখেন।[28]

---

[27] FINANCIAL, BRANCH-MUNICIPAL, PROCEEDINGS-9, JULY 1879

[28] MUNICIPAL,FILE-M3L-5,PROCEEDINGS-52,NOVEMBER-1892

পাওয়ারের রিপোর্টের ভিত্তিতে পি.ডাব্লু.ডি-এর তরফ থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার C.W. Odling (সি. ডাব্লু. ওডলিং) দার্জিলিং-এর জল সরবরাহের ক্রুটিগুলি সরোজমিনে খতিয়ে দেখতে দার্জিলিং-এ আসেন। তিনি দেখেন মূলত এই প্রকল্পে দু'টি ক্রুটির জন্য জল সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ১. উৎসেই জলের পরিমাণে ঘাটতি এবং ২. জল সরবরাহ ব্যবস্থার কিছু ক্রুটি।

প্রথম সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি দেখেন ঝর্ণার জল মাটিতে পতিত হওয়ার ফলে একটি ঋণাত্মক চাপের সৃষ্টি হয় এর জন্য অনেকটা পরিমাণ জল নষ্ট হয়। এই সমস্যাটির খানিকটা মোকাবিলা করার জন্য পি.ডাব্লু.ডি-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার J.C.Macaroni (জে.সি. ম্যাকারনি) অনেক অঙ্ক কষে একটি উপায় বার করেন। এতে তিনি দেখান ঝর্ণা উঁচু পাহাড় থেকে মাটিতে পতিত হওয়ার পর আরও দুই ফুট নীচে ঝর্ণার জলের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের পাইপ পেতে জল সংগ্রহ করলে জলের অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখান ১ নং ঝর্ণার জল সংগ্রহের জন্য ২.৫ ইঞ্চি পাইপ বা ৬ নং ঝর্ণার জলের ক্ষেত্রে ৩ ইঞ্চি পাইপ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পি.ডাব্লিউ.ডি জল সরবরাহ ব্যবস্থার কিছু ক্রুটি কাটিয়ে ওঠার বিধান দেয়। দার্জিলিং-এ জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সাত হাজার ফুট পাইপ ছিল ছয় ইঞ্চি মাপের ব্যাসার্ধের আর তেরো হাজার ফুট পাইপ ছিল চার ইঞ্চি মাপের ব্যাসার্ধের। ছয় ইঞ্চি মাপের ব্যাসার্ধের পাইপে মিনিটে জল আসে একশো চৌত্রিশ গ্যালন আর চার ইঞ্চি ব্যাসার্ধের মাপের পাইপে জল আসে মিনিটে একশো চার গ্যালন। সমগ্র জল সরবরাহ ব্যবস্থাতেই ছয় ইঞ্চি মাপের ব্যাসার্ধের পাইপ ব্যবহার করলে আরও বেশি পরিমাণ জল পাওয়া যাবে। এছাড়া ভূমির নিজস্ব ঢালের সাপেক্ষে জলের পাইপগুলি বিন্যস্ত করলে জলের অপচয় বন্ধ করা যাবে,

জল বণ্টনের ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে। এছাড়া আরও একটি নতুন রিজার্ভার তৈরির প্রয়োজনীয়তাও পি.ডাব্লু.ডি স্বীকার করে। [29]

হিল ডাইরিয়া ও জলের স্বাস্থ্য

দার্জিলিং-এ জলের অপ্রতুল জোগান তো ছিলই, সঙ্গে যুক্ত হয় আর একটা নতুন সমস্যা। হিল ডাইরিয়া। ইতিমধ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকেই ব্যাক্টেরিয়া সংক্রান্ত নানারকম গবেষণা হতে থাকে ইউরোপে। তাই হিল ডাইরিয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জলের প্রতি নজর পড়ে। লেফট্যানান্ট গভর্নরের পরামর্শে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটিও তৈরি হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন রাজশাহী ও কোচবিহার ডিভিসনের কমিশনার, এই ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডন্ট ইঞ্জিনিয়ার, স্যানিটারি কমিশনার, দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির সিভিল সার্জেন,এছাড়া চেয়ারম্যান মনোনীত দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার এবং একজন সরকার মনোনীত প্রতিনিধি। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই কমিটির সরকার মনোনীত প্রতিনিধি একজন বাঙালি বাবু মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। এই প্রথম দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির কোনো কমিটিতে দেশীয় প্রতিনিধির অনুপ্রবেশ ঘটল (তাও সরাসরি মিউনিসিপ্যালিটির কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক পদে নয়)। [30]

লেফটন্যান্ট গভর্নরের পক্ষ থেকে এই কমিটির কার্যকলাপ শুরু করার আগে দার্জিলিং-এর জল সরবরাহ প্রকল্প এবং সরকারি চাহিদা সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়। লেফটন্যান্ট গভর্নর বলেন, দার্জিলিং-এর জল সরবরাহ মূলত বৃষ্টির জল, আগে থেকে রিসার্ভারে সঞ্চয় করে রাখা জল এবং কিছু পাহাড়ি ঝোরার ওপর নির্ভরশীল। শুকনো মরশুমে জলের জোগান এবং জল

[29] MUNICIPAL,FILE-M3L-5/11,PROCEEDINGS-61,JULY-1892

[30] MUNICIPAL,FILE-M-1W-11,PROCEEDINGS-1-2,AUGUST-1893

দূষণ প্রকট আকার ধারণ করেছে। জলের জোগান বাড়ানোর জন্য যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার খোল নোলচে বদলে ফেলতে হবে। অন্য দিকে হিল স্টেশন হিসেবে দার্জিলিং-এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বছরের বেশ কিছু সময় এখানে বহু পর্যটকের সমাগম হয়। বেশ কিছু অসুস্থ এবং রুগ্ন মানুষ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আসেন। এই সব বিষয় বিবেচনা করে আপাতত জল সরবরাহ বাড়ানোর থেকেও স্বাস্থ্যসম্মত জল সরবরাহ ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। এরপর বেশ কিছুকাল জলের জোগান বাড়ানোর প্রচেষ্টা বন্ধ থাকে। সমস্ত গুরুত্ব আকর্ষণ করে জলের গুণগত মান উন্নয়নের দিকটি।

ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে সরবরাহ করা জল পরীক্ষা করা হয়েছে।[31] এতে দেখা গেছে স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুণ বেশি অ্যালবুমিনিয়ড অ্যামোনিয়া আছে। এছাড়াও এই জলে বেশ কিছু পরিমাণে উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীজ বর্জ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রাণীজ বর্জ্য থেকে উৎপন্ন হয় নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব, যা দ্রবীভূত হয়ে অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি করে। জলে এই অ্যালবুমিনিয়ড অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি বেশ বিপজ্জনক। এছাড়া জলে উদ্ভিজ্জ বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে জল যথাযথ পরিশোধন করা প্রয়োজন।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর জলের মানোন্নয়নের জন্য সার্বিক পরিস্থিতির তত্ত্বাবধান করতে বলেন। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে জল সংগ্রহ করে আবার পরীক্ষা করতে বলেন। এছাড়া ঝর্ণাগুলির অবস্থা, জল মজুত রাখার ট্যাঙ্কের অবস্থা, এখানে যাতে জলের সঙ্গে অন্য কোনও দূষিত দ্রব্যের সংযোগ না ঘটে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং জলের যথাযথ পরিশোধনের দায়িত্ব দেন নবগঠিত কমিটিকে।

আমরা বেঞ্জামিন ওয়ার্ড রিচার্ডসনের লেখায় দেখলাম স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে শহর গড়ে তোলার প্রয়াস কীভাবে জারি ছিল ইংল্যান্ডে। তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই দার্জিলিংকে স্যানেটোরিয়াম

[31] MUNICIPAL,FILE-M3L/5-13,PROCEEDINGS-61,JULY-1892

হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। কিন্তু শুধু স্বাস্থ্য নয়; ইংল্যান্ডের শহর পরিচালনার ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় ভীষণ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। তা হল, সম্পন্ন এবং তথাকথিত সুখী শ্রেণির মানুষের (এঙ্গেলস যাকে বলেছেন 'Happier class') কাছ থেকে শ্রমিক শ্রেণির জীবনের কদর্য দিকগুলো লুকিয়ে রাখা। আর তাই শহরে বস্তি এবং সম্পন্নদের থাকার জায়গা একেবারেই আলাদা। এদের সুস্পষ্ট ভৌগোলিক বিভাজনই শহরের রূপরেখা তৈরি করেছে।[32]

উনিশ শতকের শুরুর দিকে ইংল্যান্ডের শহরগুলি পরিচালনা করত মেট্রোপিলিটন বোর্ড অফ ওয়ার্কস। কিন্তু ১৮৩০-এর দশক থেকে ১৮৫০-এর দশকে স্বাধিকার, স্ব-নিয়ন্ত্রণ এবং সকলের প্রতি নিজেরাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উদারনৈতিক দাবি নিয়ে এল মিউনিসিপ্যালিটি নামক নগর পরিচালনার প্রতিষ্ঠান। এই স্বাধিকার ঠিক সমানাধিকার নয়। সম্পন্নদের স্বার্থেই মিউনিসিপ্যালিটি চালিত হচ্ছিল। এখানে দরিদ্র্যদের বক্তব্য খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। এটা অবশ্য উদারনীতিকদের খানিকটা স্বস্তি-ই দিয়েছিল।

তাই ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে William Farr(উইলিয়াম ফার) -এর মতো উদারনীতিক লেখেন, "over the supply of water - the sewerage – the burial places – the width of street – the removal of public nuisances – the poor have no command... and it is precisely upon these points that the Government can interfere with most advantage."[33]

দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তাই সকল বাসিন্দাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ করার চেয়ে নিজেদের ব্যবহার্য জলে যাতে কোনও রকম দূষিত পদার্থ না থাকে সেই দিকেই প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেছেন ব্রিটিশরা।

---

[32] P-64

[33] Christ otter page -68

দার্জিলিং-এ ব্রিটিশদের অস্থির করে তুলছিল হিল ডাইরিয়া। এই হিল ডাইরিয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্যানিটারি কমিশনার H. J. Dyson(এইচ. জে. ডাইসন) এক বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালান। লেফট্যানেন্ট গভর্নর নিযুক্ত কমিটি দার্জিলিং-এর জলের রাসায়নিক ও জৈবিক বিশ্লেষণ করে দেখেন, জলের Louis Perk (লুই পার্ক)–এর করা মান্য শ্রেণি বিভাজনে (১. বিশুদ্ধ ২. ভাল এবং ৩. ব্যবহারযোগ্য) দার্জিলিং-এর জল তিন নম্বর অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য স্তরে পড়ে। এই জল ভাল করে পরিশোধন করলে অবশ্যই ব্যবহারযোগ্য। এরপরে ঝর্ণার জল এবং বিভিন্ন কল থেকে প্রাপ্ত জল পরীক্ষা করে দেখা যায়, ঝর্ণার জলের থেকে কলের জলের গুণগতমান বেশি খারাপ। এই বিষয়টি ডাইসনকে ভাবিয়ে তোলে। জলের জৈবিক এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত জৈব বর্জ্যের উপস্থিতি ডাইরিয়ার প্রধানতম কারণ এই ব্যাপারটি মেনে নিতে ডাইসনের খানিক অসুবিধা ছিল। এই জন্য তিনি দার্জিলিং-এর হিল ডাইরিয়া এবং তার সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি সরবরাহিত জলের সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে অন্যান্য হিল স্টেশনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তিনি দেখেন অন্যান্য হিল স্টেশনে মাঝে মাঝে শরীরে অস্বাভাবিক কাঁপুনি দেখা দিলেও হিল ডাইরিয়া বড় একটা দেখা যায় না। ডাইসন অনুমান করেন দার্জিলিং-এর জলে মাইকার উপস্থিতি হিল ডাইরিয়ার প্রধানতম কারণ। দার্জিলিং- এর মাটিতে প্রচুর পরিমাণে মাইকা ঘটিত যৌগ আছে। আলো ও হাওয়ার সংস্পর্শে এসে যেগুলি ভেঙে মাইকাতে পরিণত হয়। ডাইসন দার্জিলিং-এর বিভিন্ন জায়গার কলের জল পরীক্ষা করে দেখেন, হরিদাসী বস্তি এবং চৌরাস্তা অঞ্চলের কলের জলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মাইকা পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলগুলি শহরের সবচেয়ে নীচু অঞ্চল। তাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পাহাড়ের ঢাল ধরে মাইকা নীচু অঞ্চলে সঞ্চিত হয়েছে বেশি পরিমাণে।

মাইকা এবং ডাইরিয়ার সম্পর্ক খুঁজতে অন্যান্য হিল স্টেশনের সিভিল সার্জেনদের থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন ডাইসন।

দক্ষিণ ভারতের একটি হিল স্টেশন উটি বা উটকামুণ্ড। এখানকার সিভিল সার্জেন জানান, এই অঞ্চলে হিল ডাইরিয়ার তেমন প্রাদুর্ভাব প্রায় নেই। মাটিতেও মাইকার উপস্থিতি প্রায় নেই।

বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত পির পঞ্জাল রেঞ্জের মুড়ি একটি সুন্দর হিল স্টেশন। এখানকার তদানীন্তন সিভিল সার্জন জানান, এই অঞ্চলে ডাইরিয়ার প্রকোপ বেশ কম। মূলত ইউরোপিয়ানরাই মাঝে মধ্যে এর কবলে পড়ে। মুড়ি চুনাপাথরের পাহাড়ে অবস্থিত। এর উচ্চতা ২২৯১ মিটার। অন্যদিকে দার্জিলিং-এর উচ্চতা ২০৪২ মিটার। তাই উচ্চতাই যদি হিল ডাইরিয়ার একমাত্র কারণ হয় তাহলে মুড়িতে হিল ডাইরিয়ার প্রকোপ দার্জিলিং-এর থেকে বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যত বাস্তব পরিস্থিতি তা নয়।

পরের অনুসন্ধান চালান মহারাষ্ট্রে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত মহাবালেশ্বর শহরে। অঞ্চলটি ল্যাটেরাইট মাটিতে তৈরি। মাইকার উপস্থিতি নেই মাটিতে। এখানকার সিভিল সার্জন জানান এই অঞ্চলে ডাইরিয়া একেবারেই হয় না।

অনেকগুলি হিল স্টেশনের পরিস্থিতি অনুসন্ধান করার পরে ডাইসন মাইকার সঙ্গে ডাইরিয়ার সম্পর্ক প্রসঙ্গে আরও নিশ্চিত হয়ে যান। এর পর মাইকা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন আন্ত্রিক রসের কোনও উৎসেচকে মাইকা দ্রবীভূত হয় না, অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায়। এর থেকেই পাচনতন্ত্রে একরকম অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। পরে তাই আকার নেয় ডাইরিয়ার। এই অনুসন্ধান থেকে ডাইসন কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসেন:

১. দার্জিলিং-এর হিল ডাইরিয়ার প্রকৃতি সাধারণ ডাইরিয়ার থেকে বেশ আলাদা। সমতলে ফিরে গেলেই এই ডাইরিয়া ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং এই ডাইরিয়া এমন কিছু থেকে সৃষ্ট যার উৎস কেবলমাত্র দার্জিলিং।

২. এবার আসা যাক দ্বিতীয় কারণে। দার্জিলিং-এর জলে যে উদ্ভিজ্জ বর্জ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, শুধুমাত্র তার ফলে ডাইরিয়া হওয়া কার্যত অসম্ভব। কারণ সমতলের পুকুরের জলেও

এই পরিমাণ বর্জ্যের উপস্থিতি প্রায়শই লক্ষ করা যায়। কিন্তু তার থেকে এই রকম ডাইরিয়া হতে দেখা যায় না।

৩. অন্যান্য হিল স্টেশনে মাইকা সেই রকম বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায় না। ডাইরিয়ার প্রকোপও অন্যান্য হিল স্টেশনে প্রায় নেই।

৪.অন্যদিকে, মাইকা যে পরিপাকতন্ত্রে গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে এই কথা বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বীকৃত।

স্যানিটারি কমিশনার ডাইসন দার্জিলিং-এর জলে মাইকার উপস্থিতি ও তার সঙ্গে ডাইরিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে তার মতামত জানান। তিনি বলেন, জল থিতনোর ট্যাঙ্ক এবং বালি ফিল্টার দিয়ে সমস্যাটির মোকাবিলা করা যাচ্ছে কি না দেখতে, প্রয়োজনে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে তিনি এও জানান যে অন্যত্র কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি দার্জিলিং-এ আর সময় ব্যয় করতে পারবেন না।[34]

ডাইসনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দার্জিলিং ওয়াটার সাপ্লাই কমিটির মধ্যে রিপোর্টটির মান্যতা নিয়ে মতবিভেদ দেখা যায়। ওয়াটার সাপ্লাই কমিটির প্রসিডেন্ট রাজশাহী ডিভিসনের তদানীন্তন কমিশনার ডাইসনের বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। P.Nolan (পি.নোলান) নামক এক সদস্য ডাইসনের বক্তব্য মানতে পারেন না। তিনি বলেন জলের কেমিক্যাল টেস্ট কোন্ ল্যাবরেটারিতে করা হল সেই বিষয়ে কোনও সদর্থক ইঙ্গিত নেই। জলে ঠিক কত পরিমাণে মাইকা পাওয়া যাচ্ছে তারও উল্লেখ নেই। পি.নোলান ক্রমশ ব্রিটিশ আধিকারিক মহলে বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তিনি রাজশাহী ডিভিসনের পরবর্তী কমিশনারও নিযুক্ত হন। পি.নোলানের প্রভাবে ওয়াটার কমিটির কাজের প্রবাহ একটু অন্যদিকে ঘুরে যায়। জলের পরিমাণের থেকেও জলের গুণগত মান রক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

---

[34] MUNICIPAL,BRANCH-MUNICIPAL M-W-11/3,December- 1893

শহরের বিভিন্ন কলের জলের পৃথক ভাবে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্টে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় জলে অ্যালবুমিনিয়ড অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রেটস-এর পরিমাণ খুব বেশি। জলে অ্যালবুমিনিয়ড অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন কমিটির সদস্যরা।

ঝর্ণার জলে কীভাবে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ দূষিত পদার্থ মিশছে, সেই নিয়ে নানা অনুসন্ধান চলতে থাকে। দেখা যাচ্ছে ঝর্ণা হিসাবে পতিত হওয়ার আগে জলধারা একটি বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল পেরিয়ে আসে। এখানেই নানা ধরনের গাছের পাতা ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ জলে মিশছে; যা রূপান্তরিত হচ্ছে উদ্ভিজ্জ বর্জ্যে। এছাড়া এই বনাঞ্চল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অনুমতি সাপেক্ষে এখানে পশুচারণ করা হয়ে থাকে। এর থেকে বিভিন্ন প্রাণীজ বর্জ্য জলে মিশছে। এছাড়া জল সঞ্চয় করে রাখার রিজার্ভার গুলিতেও বিভিন্ন ছিদ্র থাকার কারণে জলে দূষিত পদার্থ মিশতে পারছে খুব সহজে।

কমিটি ঝর্ণার জলের দূষণ রুখতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে বনাঞ্চলে পশুচারণ বন্ধ করার আর্জি জানায়। সেই সঙ্গে এই বনাঞ্চলে অবস্থিত ফরেস্ট বাংলোটিও অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে। অন্যদিকে, রকভিলের রিসার্ভারে আলো-হাওয়া ঢোকার জন্য যে জানলাগুলি করা হয়েছিল সেগুলিও বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ এই ছিদ্রপথে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বর্জ্য প্রবেশ করে জল দূষিত করে দিচ্ছিল। এছাড়া শহরের জল সরবরাহের প্রধান রিজার্ভার অর্থাৎ রকভিল রিসার্ভারের করোগেট টিনের কাঠামোটিও মেরামত করে সিমেন্ট-এর স্থায়ী কাঠামো নির্মাণের কথা বলা হয়। অন্যদিকে, জলের একদম কাছকাছি জায়গা থেকে জল পাইপবদ্ধ করার কথাও বলা হয়। যদিও এক্ষেত্রে খরা এবং বর্ষার মরশুমে জলতলের বিভিন্নতা অনুযায়ী দুইরকম পাইপের প্রয়োজন। ওয়াটার কমিটির কাজের এক্তিয়ার থেকে মাইকার উপস্থিতিতে জল দূষণের প্রসঙ্গটি ক্রমশ গুরুত্ব হারাতে থাকে।

ডাইসন সাহেব ওয়াটার কমিটির কর্মকাণ্ডের সাপেক্ষে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটি নোট দেন। তিনি বলেন জলে অ্যালবুমিনিয়ড অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রাণীজ বর্জ্যের সংমিশ্রণকে ইঙ্গিত করে। বিশেষত ক্লোরিনের এবং নাইট্রেট-এর উপস্থিতি এই তত্ত্বকে আরও দৃঢ় করে। এবারে তিনি জলে এইসব পদার্থের উপস্থিতি বিষয়ে Louis and Perks(লুই এন্ড পার্কস)-এর জলের জৈব-রাসায়নিক বিচারের মাধ্যমে গুণগত মানের একটি মাপকাঠি তুলে ধরেন। লুই এন্ড পার্কস নির্ধারিত জলে গুণগত মানের মাপকাঠি অনুযায়ী দার্জিলিং-এর জলে অ্যালবুমিনিয়ড অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, নাইট্রোজেন বা নাইট্রেটস-এর পরিমাণ খুব-ই কম। আর জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণের রিপোর্ট থেকে দার্জিলিং-এর জলের অ্যামোনিয়ার উৎস যে উদ্ভিজ্জ বর্জ্য সেই বিষয়েও বিশ্লেষকরা ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। ডাইসন আবারও তাঁর নোটে বলেন উদ্ভিজ্জ বর্জ্য পদার্থ থেকে ডাইরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। তাছাড়া দার্জিলিং-এর জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে কলের জলের থেকে ঝর্ণার জলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশি। ডাইসন তার নোটে লিখেছেন, লোহার পাইপের অক্সিডাইজেশনের ফলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কমে গেছে। শেষ পর্যন্ত ডাইসন বলেন দার্জিলিং-এর জলের সমস্যার উৎস মাইকা। যথাযথ পরিশোধনের দ্বারা এই বিপজ্জনক মাইকার হার কমানো সম্ভব। গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে J.A. Berdolen (জে. এ. বার্দোলেন), ডাইসনের রিপোর্টের ওপর গুরুত্ব দেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার Captain Ivan (ক্যাপ্টেন. ইভান)-কে আবার জলের বিশ্লেষণ করতে নির্দেশ দেন। এছাড়া অবশ্য তিনি ওয়াটার কমিটির দেওয়া অন্যান্য বিধানগুলির (যেমনঃ-রিসার্ভারের উন্নতি সাধন করা, ঝর্ণার জল পতিত হওয়ার যতটা সম্ভব কাছ থেকে জল পাইপবদ্ধ করা), দিকেও নজর দিতে বলেন।

দার্জিলিং-এর মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে মূলত দু'টি সমস্যাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। জলের পরিশোধন এবং জলের ঘাটতি। জলের

পরিশোধনের বিষয়টিই সর্বাগ্রে গুরুত্ব পেয়েছে। এরপরে যখন সত্যিই ঝর্ণার জলের জোগান বর্ধিত জনসংখ্যার সাপেক্ষে অপ্রতুল হয়ে পড়েছে, তখন জলের জোগান বাড়ানোর দিকে নজর দিতে খানিক বাধ্য হয়েছে মিউনিসিপ্যালটি। এই প্রসঙ্গে জলের উৎসের মালিকানা নিয়ে কখনও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সংঘাত হয়েছে। কখনও বা ঝর্ণার জল ব্যবহারের অগ্রাধিকার নিয়ে সেনা ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া বেধেছে মিউনিসিপ্যালিটির। এই জাতীয় সমস্যাগুলি দক্ষিণবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটির সমস্যাগুলির থেকে একেবারে আলাদা।

আমরা প্রথমে দার্জিলিং-এর জলের পরিশোধনের বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করব। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ফ্রান্সে Louis Pasteur(লুই পাস্তুর)-এর সহকারী Charles Chamberland(চার্লস চেম্বারল্যান্ড) জল পরিশোধনের জন্য একটি ফিল্টার আবিষ্কার করেন। এটি একটি ত্রিস্তরীয় পোর্সিলিন ফিল্টার। কাস্ট আয়রনের পাইপের মাধ্যমে পোর্সিলিনের ফিল্টারে জল প্রবেশ করে ও পরিশোধিত হয়। যে সব জায়গায় জলের প্রেসার খুব বেশি থাকে সেই সব অঞ্চলের জন্য এই ফিল্টার খুব কার্যকরী। তাই পার্বত্য অঞ্চলের জন্য এই ফিল্টার আদর্শ বলে নির্মাতাদের দাবি।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি চুক্তির মাধ্যমে দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি Messrs. Heatly & Gresham Ltd.(মেসার্স হিটলি এন্ড গ্রেসাম লিমিটেড)- এর কাছ থেকে একটি পাস্তুর চেম্বারলিঙও ফিল্টার কেনে।[35] এই চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয় যে একত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি এই ফিল্টারটি কিনবে। কেনার তিন বছর অবধি কোম্পানি ফিল্টারটির জন্য প্রয়োজনীয় কিন্ডল, পাইপ বসাবে। ফিল্টারটির মাধ্যমে জলের সমস্ত ক্ষতিকারক পদার্থগুলি দূরীভূত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়েও তদারকি করবে। তিন বছর পরে ফিল্টারটি রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায় মিউনিসিপ্যালিটিকে নিতে হবে।

---

[35] MUNICIPAL,FILE M1-W/4, PROCEEDING-64, JANUARY 1896

মেসার্স হিটলি গ্রেসাম লিমিটেড দাবি করে এই ফিল্টারটিতে জল পরিশোধনের জন্য যে কোষগুলি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব। কোষগুলি উষ্ণ জলীয় বাষ্পের দ্বারা পরিষ্কার করার জন্য এই ফিল্টারটিতে যথাযথ ব্যবস্থা করা আছে। দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতে জল পরিশোধনের জন্য এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।

স্যানিটারি কমিশন শুরু থেকেই এই ফিল্টারটি বসানোর বিপক্ষে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারি জোরাজুরিতে এই ফিল্টারটি বসাতে বাধ্য হয় দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি। এই ধরনের সরকারি অতি তৎপরতা শহরটিকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিকদের স্বার্থ তুলে ধরে। মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীন কর্মকাণ্ড চালানোর পক্ষে এটা একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন তো বটেই।

দার্জিলিং শহরের মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনায় এমনিতেই স্থানীয় মানুষজনের উপস্থিতি খুবই কম। দেশীয় জনতা বলতে কিছু বাঙালিবাবু। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রাপ্ত সরকারি লোনের অর্থ মিউনিসিপ্যালিটিকে বর্ধিত করের মাধ্যমে শোধ করতে হত। মিউনিসিপ্যালিটি এই বর্ধিত করের ভার বইতে সক্ষম কি না সে বিষয়ে কোনও মতামতকে আমল দেওয়া হয় না। সরকারি জোরাজুরিতে মিউনিসিপ্যালিটির ওজর আপত্তি ধোপে টেকে না। এই ধরনের কর্মকাণ্ড ঔপনিবেশিকদের স্বার্থে তৈরি দার্জিলিং-এর মতো শহরেও মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীনতার এক্তিয়ার আদপে কতখানি তা আমাদের সামনে তুলে ধরে। পৌর নাগরিকতা গঠনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্নতা থাকলেও ঔপনিবেশিক স্বার্থের স্বরূপ একে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে।

আবার ফিরে আসি আমরা পাস্তুর-চেম্বারল্যাণ্ড ফিল্টারে। দেখা যাক এই ফিল্টারটি দার্জিলিং শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থায় কী ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস নাগাদ পি.ডাব্লিউ.ডি দার্জিলিং-এর জল সরবরাহ বাড়ানোর জন্য অনুসন্ধান শুরু করে। দার্জিলিং-এ দিনে ১৪৪,০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান দাবি জানিয়েছেন এই জল সরবরাহ অচিরেই ২৫০,০০০ গ্যালন করা দরকার। পি.ডাব্লিউ.ডি-

এর পক্ষে এ.ই.সিল্ক দেখান পাস্তুর ফিল্টারটি বর্তমানে ১৪৪,০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করে; কিন্তু এর মাধ্যমে এর থেকে বেশি জল সরবরাহ করা সম্ভব নয়।[36] এই বছর-ই মে মাস নাগাদ দার্জিলিং-এ খুব টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। জল বিষয়ে অনুসন্ধান করা হলে পাস্তুর ফিল্টারের সরবরাহক মেসার্স হিটলি এন্ড গ্রেসাম কোম্পানি জানায় যে অচিরেই দার্জিলিং-এ সরবরাহিত জলের মান আরও উন্নত হবে। অতিরিক্ত বর্ষার কারণে পাস্তুর-চেম্বারল্যান্ড ফিল্টারের তৃতীয় সিলিন্ডারটি লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। বর্ষা অতিক্রান্ত হলেই এই সিলিন্ডারটি লাগানো হবে; ফলে অবস্থার উন্নতি হবে। মেসার্স হিটলি এন্ড গ্রেসাম কোম্পানি দার্জিলিং-এর সরবরাহিত জলের ব্যাকটেরিওলজিক্যাল টেস্ট করান। রিপোর্টে বলা হয় জলে যে সমস্ত জীবাণুর উপস্থিতি দেখা গেছে তা খুব একটা ক্ষতিকারক নয়। আর পাইপে সরবরাহ হওয়ার পরে জলে জীবাণুর পরিমাণ বেশি দেখা গেছে। পাইপে সরবরাহ হওয়ার আগে জলে জীবাণুর উপস্থিতি তুলনামূলক কম। এই পর্যবেক্ষণ থেকে দু'টি বিষয় অনুমান করা যায়। পাইপের ভেতরের পরিবেশে জীবাণুর বংশ বৃদ্ধির পক্ষে খুবই অনুকূল। এছাড়া কোনও রিসার্ভারে হয়ত পরিশোধিত জলের সংগে অপরিশোধিত জলের সংমিশ্রণ ঘটছে। অনুসন্ধান করে দেখা যায় সেন্ট পলস স্কুল সংলগ্ন এলাকাটি শহরের খুব উঁচু অঞ্চলে অবস্থিত। তাই এখানে পাইপের মাধ্যমে জল পাঠানো খুব সমস্যাজনক। জলের প্রেসার খুব বেশি দরকার হয় পাইপে। তাই ফিল্টার বন্ধ রেখে সরসরি ঝর্ণার জল এখানে পাইপের মাধ্যমে পাঠানো হয়। এরপর যখন আবার পরিশোধিত জল সরবরাহ করা হয়, তখন এই সংমিশ্রণ ঘটে। তবে জলের ব্যাকটেরিওলজিক্যাল টেস্টর রিপোর্ট দেখে মেসার্স হিটলি এন্ড গ্রেসাম কোম্পানির বক্তব্য, জলে যে সমস্ত জীবাণু পাওয়া গেছে সেগুলি খুব একটা ক্ষতিকারক নয়। এই টাইফয়েড দুধ বা অন্য কোনও জিনিস থেকেও হতে পারে।[37]

---

[36] MUNICIPAL, FILE M1-W/8, PROCEEDING-10, JANUARY 1898

[37] MUNICIPAL, FILE- M 1-W/8, PROCEEDINGS -24, MAY 1898

তবে শেষ পর্যন্ত ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দেই পাস্তুর ফিল্টারের মাধ্যমে আর জল সরবরাহ করা হয় না। অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজার দিকে মনোনিবেশ করা হয়। স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়াররা পরামর্শ দেন যে, তিনটি বালির ফিল্টার বেড এবং নুড়ি-পাথরের মাধ্যমে জল পরিশোধন করলে পরিমাণ এবং গুণগত মান দুই দিক থেকেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। তবে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা এই প্রস্তাবে একটু আপত্তি জানান। তারা বলেন যে, বালিতে মাইকা থাকে, ফলে এই মাইকা জলে মিশে গেলে বিপত্তি আরও বাড়বে। তখন স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়াররা এর উত্তরে বলেন সমস্ত বালিতেই মাইকা আছে। এমনকি কলকাতায় জল পরিশোধনের জন্য যে বালি ব্যবহার করা হয় তাতেও মাইকা আছে। বালির ফিল্টার বেডের পরে জল নুড়ি-পাথরের ফিল্টার বেডের মধ্যে দিয়ে পরিশোধন করা হয়। এই দুই রকম ফিল্টারের ফলে জলের দূষিত পদার্থ অনেকটাই কমে যায়। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তেত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে বালির ফিল্টার বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে সেটলিং ট্যাঙ্কের সংখ্যাও বাড়ানো হয়।[38] এর পরের বছর সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ মিউনিসিপ্যালিটি তার রিপোর্টে দাবি করে, এই নতুন জল পরিশোধনের ব্যবস্থার ফলে শহরের ডাইরিয়ার প্রকোপ অনেক কমেছে। Father Narish(ফ্যাদার ন্যারিস) মিউনিসিপ্যালিটিকে জানিয়েছেন জলের উন্নতির জন্য সেন্ট জোশেফ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বেশ বেড়েছে।[39] এরপরে দার্জিলিং-এর জলের গুণগতমান উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষ কিছু শোনা যায় না। সমস্ত আলোচনাই আবর্তিত হয় দার্জিলিং-এর জলের অপ্রতুলতা প্রসঙ্গে।

জলের অপ্রতুলতা ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রয়াস

ঝর্ণার জলের ওপর পুরোপুরি ভাবে নির্ভরশীল দার্জিলিং-এর জল সরবরাহ প্রকল্প। ফলে শুকনো মরশুমে ঝর্ণার জল কমে আসলেই টান পড়ে শহরের জল সরবরাহের পরিমাণে।

[38] MUNICIPAL, FILE- M1W-1, PROCEEDINGS-42, MARCH,1903

[39] MUNICIPAL, FILE- M1W-1, PROCEEDINGS-43, MARCH,1903

এছাড়া সার্বিক ভাবেই ঝর্ণাগুলির জল প্রবাহ শুকিয়ে আসছিল। তাই সিঞ্চল লেকের যে ঝর্ণাগুলি থেকে দার্জিলিং-এ জল সরবরাহ করা হচ্ছিল, সেই সব ঝর্ণাগুলির গতিপ্রকৃতি লক্ষ করা এবং সেই সঙ্গে নতুন ঝর্ণা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই নতুন ঝর্ণা খুঁজতে গিয়েই আর এক বিপত্তি। ঝর্ণাগুলির মালিক কে? মিউনিসিপ্যালিটি না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট? সব ঝর্ণাগুলির দখলদারি মিউনিসিপ্যালিটি নিতে চাইলে সেনা ক্যান্টনমেন্ট থেকেও আপত্তি আসে। জল সংকটের মোকাবিলা করতে শহরের পাইপ লাইনের বিন্যাসের পুনর্গঠনের প্রশ্ন এবং জল সঞ্চয়ের জন্য রিজার্ভার স্থাপনের প্রসঙ্গও উঠে আসে। আমরা এখন মিউনিসিপ্যালিটি কীভাবে দার্জিলিং-এর জলের অপ্রতুলতার সমস্যাটি মোকাবিলা করল, সেটি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব। পাস্তুর ফিল্টার যথাযথ ভাবে দার্জিলিং-এর জলের সমস্যা মেটাতে পারছে না-- এই সমস্যা থেকেই দার্জিলিং শহরে জল সরবরাহ বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হয়।

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ দার্জিলিং শহরের জল সংকটের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য পি.ডাব্লিউ .ডি-র সেক্রেটারি E.D. Gardine(ই. ডি. গার্ডিনার) একটি নোট তৈরি করেন। এতে তিনি দার্জিলিং শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটি তুলে ধরেন। এতদিন অবধি সিঞ্চল পাহাড়ের পশ্চিম ঢালের ঝর্ণাগুলির জলকে পাইপবদ্ধ করে রকভিলের কাছে সেটলিং ট্যাঙ্কে পাঠানো হত। তিনি বলেন: ১। দার্জিলিং শহরে পাইপগুলি পূর্ব ঢাল বরাবর বিন্যস্ত হওয়ায় পশ্চিম ঢালে জল সরবরাহ করা যায় না। ২। সার্ভিস রিজার্ভারটির উচ্চতা খুব বেশি না হওয়ায় জল সরবরাহে বাধার সৃষ্টি হয়। ৩। ঘুমের কাছে মেন সাপ্লাই পাইপটি একটু বেশি উঁচুতে হওয়ায় এই অঞ্চলে জল সরবরাহ যথাযথ ভাবে করা যায় না। ৪। সেন্ট পলস স্কুল এবং এই অঞ্চলের কিছু বাড়ি একটু বেশি উচ্চতায় অবস্থিত বলে এখানে জল সরবরাহ করা একটু মুশকিল। এখানে জল পাঠাতে জলের প্রেসার একটু বেশি দরকার হয়। এখানে জল সরবরাহ করার সময় শহরের অন্যান্য জায়গার জল সরবরাহ ঘণ্টা তিনেক বন্ধ রাখতে হয়। তিনি বলেন দার্জিলিং-এ পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে জল সরবরাহ করার জন্য আর একটু বেশি

উচ্চতায় রিজার্ভার স্থাপন করা দরকার। সেন্ট পলস এর কাছে একটি রিজার্ভার তৈরি করলে অকল্যান্ড রোড বরাবর শহরের পশ্চিম ঢালে জল পাঠানোর ব্যবস্থা করা সহজ হবে।[40]

এছাড়া শহরে জল বণ্টন যথাযথ করার জন্য পাইপ বিন্যাসের ত্রুটিগুলি খুঁজে বার করে নতুন কিছু প্রস্তাব রাখেন স্যানিটারি কমিশনের পক্ষে এ.ই.সিল্ক। সিল্ক তার পর্যবেক্ষণে জানান, ঘুম এবং সেন্ট পলস সংলগ্ন অঞ্চল খুব উঁচুতে অবস্থিত হওয়ায় এখানে পাইপ থেকে সরাসরি জল পাঠানো হয়। এছাড়া বাকি শহরে রকভিল রিজার্ভার থেকে জল পাঠানো হয়। রিজার্ভার থেকে চারটি শাখা পাইপের মাধ্যমে জল বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহিত হয়।

প্রথম পাইপটি চার ইঞ্চি মাপের। মল ওয়েস্ট রোড থেকে বার্ক হিল রোড অবধি মেন পাইপটি বিস্তৃত। এই পাইপ থেকে ইডেন স্যানিটোরিয়াম, জেলখানা সংল্লগ্ন অঞ্চল জল পায়। এর থেকে দুই ইঞ্চি ও দেড় ইঞ্চি মাপের পাইপ দিয়ে জল শ্রাবেরি ও নর্থ পয়েন্ট সংলগ্ন অঞ্চলে সরবরাহিত হয়। এই লাইনটিকে নিয়ে বিশেষ সমস্যার কিছু নেই।

দ্বিতীয় পাইপটি আড়াই ইঞ্চি মাপের। মল ইস্ট রোড থেকে দার্জিলিং গার্লস স্কুল হয়ে এই পাইপ লাইন ভুটিয়া বস্তি অবধি বিস্তৃত। এই পাইপলাইন থেকে ভবিষ্যতে লেবং ক্যান্টনমেন্টে জল পাঠানোর পরিকল্পনা আছে। তাই এই শাখায় আরও বেশি জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয় শাখা পাইপটি চার ইঞ্চি মাপের। চৌরাস্তা থেকে গ্র্যান্ড হোটেলের নিচে কার্ট রোড হয়ে মেন বাজার ও স্লটার হাউস অবধি বিস্তৃত।

চতুর্থ শাখাটিও চার ইঞ্চি মাপের। অকল্যান্ড রোড থেকে আপার অকল্যান্ড রোড অবধি বিস্তৃত। ইউনিয়ন চ্যাপেল- এর কাছে থেকে আরেকটি চার ইঞ্চি মাপের শাখা পাইপ রেল স্টেশন

[40] MUNICIPAL, M-1-W/8-3, PROCEEDINGS-9, MAY, 1899

থেকে কার্ট রোডের বাজার অবধি গেছে। এই অঞ্চলে কিছু বাড়ি আছে যেগুলির অবস্থান বেশ উঁচুতে। পাইপের জলের স্বাভাবিক ফোর্সে এখানে জল পৌঁছোয় না। তাই পাইপের সঙ্গে ম্যাকিন্টস বা ম্যাসন ঝর্ণার জল সরাসরি যোগ করতে হয়েছে। এমনিতে এই ঝর্ণার জল সবচেয়ে বিশুদ্ধ বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই ঝর্ণার জলের কাছেই পশুচারণভূমি, তাই পশুজ বর্জ্য পদার্থ থেকে এই জলে দূষিত পদার্থ মিশে যেতেই পারে। অপরিশোধিত জল এই ভাবে সরাসরি মিশে না যাওয়াই কাঙ্ক্ষিত। তাই এই ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে।

সিল্ক সার্বিক ভাবে জলের পাইপ লাইনগুলি বিন্যাসের কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি বলেন দার্জিলিং-এর পাইপগুলি Hydraulics-এর নিয়ম মেনে হয়নি। রাস্তার স্লোপ অনুযায়ী এগুলি বিন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে পাইপগুলির দৈর্ঘ্য অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে বেন্ডের সংখ্যা। ফলে জলের প্রেসার কমে যাচ্ছে। দূরবর্তী বা উঁচু অঞ্চলে জল পাঠানো তাই খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে। এছাড়া রাস্তার স্লোপের সঙ্গে জলের কল স্থাপন করার ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। মেন পাইপগুলি চার ইঞ্চি মাপের হলে, সার্ভিস পাইপগুলির ব্যাস এর থেকে কম ব্যাসের হলে জলের প্রসারের কোনও সমস্যা থাকবে না। ভূমির ঢাল অনুযায়ী কোথাও তিন ইঞ্চি, কোথাও দেড় ইঞ্চি কোথাও আবার দুই ইঞ্চি মাপের সার্ভিস পাইপ বসাতে হবে। দার্জিলিং শহরের পাইপ লাইন নতুন করে বিন্যস্ত করতে প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হবে বলে সিল্ক অনুমান করেন। সার্বিক ভাবে সরবরাহিত জলের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সিল্ক ঝর্ণাগুলির গতিবিধি জলের বাড়া-কমার দিকেও নজর দেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের এবং ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের বিভিন্ন ঋতুতে ঝর্ণাগুলিতে জলের পরিমাণের একটি খতিয়ান তৈরি করেন।

ইতিমধ্যে দার্জিলিং-এর কমিশনাররা মিটিং করে এখানকার জল সরবরাহ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেন। তাঁরা বলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাই এই পাইপ লাইনের নতুন বিন্যাস মিউনিসিপ্যালিটির তহবিল থেকে করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার পুরোপুরি যদি এই ব্যয়ভার বহন করে, তা হলে মিউনিসিপ্যালিটির কোনও অসুবিধা নেই। সরকারি ঋণ শোধ করার মতো ক্ষমতাও মিউনিসিপ্যালিটির নেই। এর চেয়ে যদি জলের অপচয় কমানো যায়, তাহলে বর্তমান পরিকাঠামোতেই শহরের জল সংকুলান হয়ে যাবে। এবারে তাঁরা এক এক করে দার্জিলিং শহরে জল অপচয়ের চিত্রটি তুলে ধরেন।

তাঁরা বলেন, অন্যান্য হিল স্টেশনে ময়লা জামা-কাপড় ধোপারা গাধা বা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে শহরের বাইরে ঝর্ণার জলে ধুয়ে নিয়ে আসে। সেখানে দার্জিলিং-এ ইডেন স্যানিটোরিয়াম, জুবিলি স্যানিটোরিয়াম, উডল্যান্ড হোটেল, দার্জিলিং ক্লাব, ডায়াসেসন গার্লস স্কুল, ক্যালকাটা গার্লস স্কুলের কাপড়জামা ধোপারা শহরের পরিশোধিত কলের জলেই কাচে। শুধু ইউরোপিয়ানদেরই নয়, দেশীয় জনতার জামাকাপড়ও কলের পরিশোধিত জলে কাচা হয়। এই বক্তব্য থেকে ঔপনিবেশিকদের মনোবৃত্তি একদম নগ্নরূপে প্রকাশিত হয়। ইউরোপিয়ানদের জামা-কাপড় কাচার জন্য পরিশোধিত জল ব্যয় করাকে যদি বা বরদাস্ত করা যায়, দেশীয় জনতার কাপড় কাচার জন্য এই জলের অপচয় কোনও ভাবেই সহ্য করা যায় না।

বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং জেলের বাগানে পরিশোধিত জল দিয়ে গাছে জল দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত বলে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা দাবি করেন। কুলি দিয়ে জল আনানো যেতে পারে, বা কার্ট রোডের ওপর যে কাগঝোরাসহ বহু ঝর্ণার জল এসে পড়ছে। সেখান থেকেও বাগানে জল দেওয়ার জল সরবরাহ করা যায়। এই ঝর্ণাগুলির জল ল্যাট্রিন পরিষ্কার করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। কার্ট রোডের ঝর্ণার জল এই অঞ্চলে

যাঁদের বাড়ি তাঁরা সরাসরিই ব্যবহার করেন। কেনেডি সাহেব জানিয়েছেন তারা এই জল খেয়ে যথেষ্ট সুস্থ আছেন। কমিশনার প্রস্তাব দেন, এখানকার জল পাইপের মাধ্যমে বাজারে নিয়ে যাওয়াই যায়। কমিশনার কোনও ভাবেই মিউনিসিপ্যালিটির ঘাড়ে আরও ঋণের বোঝা চাপাতে নারাজ। তাঁর দাবি দার্জিলিং শহরে কলকাতার থেকেও বেশি সময় জুড়ে জল সরবরাহ করা হয়। কলকাতা শহরে সকাল ছ'টা থেকে বেলা এগারটা অবধি আর বিকেলে চারটে থেকে ছ'টা অবধি জল সরবরাহ করা হয়। অন্যদিকে, দার্জিলিং-এ সকালে ছ'টা থেকে এগারোটা অবধি জল সরবরাহ করা হলেও বিকেলে তিনটে থেকে আটটা পর্যন্ত জল সরবরাহ করা হয়। বিকেলে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জল সরবরাহ করা হয়। এরপর দার্জিলিং-এ জল সরবরাহ বাড়ানোর আদৌ প্রয়োজন আছে কি না ভেবে দেখতে বলেন কমিশনার। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রায় বিপরীত ঘটনা। অন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যখন জল সরবরাহ বাড়ানোর জন্য লোনের আবেদন করেও পাচ্ছে না, দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটিকে তখন লোন নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করা হচ্ছে। ঔপনিবেশিক হিতবাদ এবং সমতার বাণী কোথায় যেন দূরে সরে যাচ্ছে।

বাড়িতে মিউনিসিপ্যালিটির জল সংযোগ

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট-এর ২৯০ ধারা অনুযায়ী এখানকার কমিশনারদের বাড়িতে জল সংযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। বাড়িতে মিউনিসিপ্যালিটির জল সংযোগ, পাহাড়ি এলাকায় নিঃসন্দেহে একটি নতুন রকমের জল অভ্যেসের সূচনা করে। কারণ পাহাড়ের ঢালের কথা মাথায় রেখে সর্বত্র সমান ভাবে জল সরবরাহ করা বেশ মুশকিলের কাজ। পাহাড়ের ঢালের ওপর দিকের বাড়িগুলি যাতে সব জল নিঃশেষ করে না ফেলে, সেই জন্য বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা নিতে হয় মিউনিসিপ্যালিটিকে।

মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা বলেন, যাঁরা নিয়মিত বাড়ির ট্যাক্স দেন এবং যাঁদের বাড়ির ভ্যালুয়েশন ন'শো টাকার বেশি তাঁরা বাড়িতে জলের সংযোগের জন্য আবেদন করতে

পারবেন।[41] পরে অবশ্য এই নিয়মের কিঞ্চিৎ রদবদল ঘটান লেফট্যানেন্ট গভর্নর। তিনি বলেন এক্ষেত্রে বাড়ির ভ্যালুয়েশন গণ্য করা হবে না। যারা নিয়মিত মিউনিসিপ্যালিটিকে ট্যাক্স দেয়, তারাই বাড়িতে জলের সংযোগের জন্য আবেদন করতে পারবে।[42] মিউনিসিপ্যালিটি এক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়ম জারি করে। বলা হয় বাড়িতে জল সংযোগ নিতে গেলে নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত করতে হবে। মেন পাইপ থেক কমিউনিকেশন পাইপের মাধ্যমে জল বিভিন্ন বাড়িতে পাঠানো হবে। কমিউনিকেশন পাইপগুলি ৪০০ ফুট জলের প্রেসার বহন করার উপযুক্ত হতে হবে। কমিউনিকেশন পাইপগুলি মেন পাইপের সঙ্গে একটি ফেরুল এবং স্ক্রু-এর দ্বারা যুক্ত থাকবে। কোনও সার্ভিস পাইপ ড্রেনের ভিতর বসানো যাবে না। এতে ড্রেনের স্বাধীন চলাচল ব্যাহত হবে। বাড়িতে জলের সংযোগ নেওয়ার জন্য কিছু জিনিসের ব্যয় ভার বহন করতে হবে আবেদনকারীকে। যেমন: ১.মিউনিসিপ্যালিটির মেন পাইপ থেকে সংগযোগকারী পাইপের ফেরুল, ২. সংযোগকারী পাইপ, ৩. জলের কল , ৪. স্টপকক ও স্টপকক বক্স এবং ৫. জল পরিমাপ করার মিটার।

এবারে প্রশ্ন হল সার্ভিস পাইপের ব্যাসার্ধের মাপ কী হবে? আগেই বলেছি দার্জিলিং-এর পাহাড়ি চড়াই-উতরাই বিভিন্ন জায়গায় সমান পরিমাণ জল সরবরাহের ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য বলা হয় যে সর্বত্র যাতে জলের প্রেসার ৪০০ ফুটের কাছাকাছি হয় সেই জন্য এক এক জায়গায় এক এক রকম ব্যাসার্দ্ধের পাইপ লাগাতে হবে। ঠিক হয় পাইপগুলি মোটামুটি ১/২”, ৩/৪”, ১”, ১-১/৪”, ১-১/২” মাপের হলেই পরিস্থিতি সামলানো যাবে। এই সমতলের থেকে একেবারে আলাদা। বর্ধমান শহরে জল সরবরাহের ইতিবৃত্ত শুরু করেছিলাম একটি বাড়িতে জলের লাইন কেটে দেওয়ার ঘটনার কথা বলে—কেটে দেওয়ার কারণ, বাড়িটির সার্ভিস পাইপের ব্যাসার্ধ রাস্তার মেন পাইপের থেকে বেশি। এর জন্য বেশ বড়

[41] MUNICIPAL, FILE M-2R-17, NOVEMBER 1899

[42] MUNICIPAL, FILE M-2R-18, NOVEMBER 1899

অঙ্কের টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল। সুতরাং যে ব্যবস্থা দার্জিলিং-এর পরিস্থিতিতে বিধান হিসেবে গৃহীত, সেই ব্যবস্থা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলার পক্ষে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু প্রযুক্তিগত ব্যাপারগুলি তো স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বদলে যাওয়ারই কথা। তাত্ত্বিক ভাবে মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠান হিসেবে একক সত্ত্বা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হলেও কার্যক্ষেত্রে এর বহুমাত্রিকতাই প্রমাণিত হয়েছে বার বার।

এরপর দার্জিলিং-এ বাড়িতে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে স্টপককের একটা বড় ভূমিকা ছিল। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ওপর থেকে নীচে জল পাঠানোর সময় কোনও এলাকার বা বাড়ির জল সরবরাহ স্টপককের মাধ্যমে বন্ধ করে পরবর্তী ঢালে জল পাঠাতে হত। এক্ষেত্রে কোনও বাড়িতে বা এলাকায় জল পাঠানোর ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির কোনও বিশেষ চয়ন ছিল কি না, তা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট নথি আমাদের হাতে নেই। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই স্টপককের প্রয়োজন হয়নি।

মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে জল সংঘাত

বাড়ির জলের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পরে দার্জিলিং জল সরবরাহ প্রকল্পে আর েকটি অধ্যায় শুরু হয় একটি সংঘাতকে কেন্দ্র করে। দার্জিলিং-এর জল সরবরাহকে কেন্দ্র করে মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে অচিরেই সংঘাত বাধে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের। লেবং এবং জলাপাহাড়ের মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বলা হয় দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ করে না। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রায়শই না জানিয়ে জল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মিউনিসিপ্যালিটি ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে দাবি করে চলেছে তারা জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করবে। এই জন্য তারা করও বৃদ্ধি করেছে। এখন ১০০০ গ্যালন জলের জন্য প্রায় বার আনা জলকর দিতে হয়। [43]

---

[43] MUNICIPAL, FILE-M1W-5, PROCEEDINGS- 32, JULY 1904

মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট থেকে খুব জোরালো গলায় দাবি করা হয় যে মিউনিসিপ্যালিটি ১৮, ১৯ ও ২০ নম্বর ঝর্ণার জল ব্যবহার করে জল সরবরাহ বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি এই ঝর্ণাগুলিকে ব্যবহার করেনি। এমতাবস্থায় মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট দাবি জানায় যে তাদেরকে ওই ঝর্ণার জল আলাদা ভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হোক। মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের এই দাবিতে মিউনিসিপ্যালিটি বেশ নড়েচড়ে বসে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং কমিশনাররা ঝর্ণার জল যেভাবে কমে যাচ্ছে এবং বহু ঝর্ণা শুকিয়ে যাচ্ছে তাতে বেশ সন্ত্রস্ত। অচিরেই ১৮, ১৯ ও ২০ নম্বর ঝর্ণার জল ব্যবহার করতে হবে এটা তারা ভালই বুঝতে পারেন। [44]

মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট এক্ষেত্রে আরেকটু তৎপরতা দেখাতে সচেষ্ট হলে মিউনিসিপ্যালিটি ঝর্ণাগুলির ওপরে মালিকানা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়।[45] ঝর্ণাগুলি যেহেতু বনবিভাগের মধ্যে অবস্থিত তাই এই বিষয়ে বনবিভাগের কনসার্ভেটরের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ঝর্ণাগুলির ওপর মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনও নথি আছে কি না জানতে চাইলে কনসার্ভেটর বলেন, এই বিষয়ে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি চুক্তি হয়েছিল। দার্জিলিং কাছারিতে আগুন লেগে এই সমস্ত নথি নষ্ট হয়ে যায়। তবে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার 'FREEDOM OF RIGHT OF THE USERS' নীতি মেনে এই বিষয়ে গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ধার্য করা হয়।

লেফটন্যান্ট গভর্নর এই বিষয়ে মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের পক্ষেই কথা বলেন। ১৮-২০ নম্বর ঝর্ণায় মিলিটারি কর্তৃত্বের কথাই প্রারম্ভিক ভাবে মেনে নেওয়া হয়। লেফটন্যান্ট গভর্নর আরও বলেন মিউনিসিপ্যালিটি নিজ ব্যয়ে লেবং ক্যান্টনমেন্ট অবধি পাইপ লাইন পাতলেও, এই বাবদ কোনও ক্ষতিপূরণ পাবে না। [46] আরও একবার দেখতে পেলাম সরকারের সঙ্গে

[44] MUNICIPAL, FILE-M1W-5, PROCEEDINGS- 40, JULY 1904

[45] MUNICIPAL, FILE-M1W-5/10, PROCEEDINGS- 40, JULY 1904

মিউনিসিপ্যালিটির স্বার্থের সংঘাত বাধলে সরকারি স্বার্থই আগে গুরুত্ব পাবে। ঠিক এভাবেই বর্ধমানের জল সরবরাহ প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত পি.ডাব্লিউ.ডি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার হুইটফিল্ড সাহেব সরকারি অন্যখাতে বরাদ্দ টাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রকল্প নির্মাণে ব্যয় করলে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি শেষ অবধি দাবি জানায়, যে ১৮-২০ নম্বর ঝর্ণায় মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট ৩২০০ গ্যালন জল নেওয়ার পরে উদ্বৃত্ত জল মিউনিসিপ্যালিটিকে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হোক। এই অনুমতিও মিউনিসিপ্যালিটি পায় না। বলা হয় মিউনিসিপ্যালিটি এবং মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট একত্রে জল নিলে কন্টামিনেশনের সম্ভাবনা দেখা দেবে। ফলে এই ব্যবস্থা না করাই বাঞ্ছনীয়। সরকারি তরফে এমনটাই বলা হয়।[47]

ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি এবং মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে একটা সমঝোতা তৈরি হয়। ঠিক হয় মিউনিসিপ্যালিটিই মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে দৈনিক ৩৪০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করবে। এই পরিষেবার বিনিময়ে মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট বার্ষিক চার হাজার টাকা কর দিতে সম্মত হয়। জলাপাহাড় ও কাটাপাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে মিউনিসিপ্যালিটির মেন পাইপ থেকে ক্যান্টনমেন্টের সার্ভিস পাইপকে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়। সমস্যা তখনকার মতো মেটে।[48]

জল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি ও গুণগত মানোন্নয়নের চিরকালীন অমীমাংসিত দাবি

এছাড়াও দার্জিলিং-এ মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহকে কেন্দ্র করে নানা রকম সমস্যার কথা উঠে আসে। দার্জিলিং-এর ঘুম ওয়ার্ডে জল সরবরাহ করার কথা বলা হয়।[49] এর জন্য রকভিলে রিসার্ভারে জল সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। সেন্ট পলস স্কুলের কাছে, স্কুল

[47] MUNICIPAL, FILE NO.- M1W-1, PROCEEDING NO.-42, MAY-1905

[48] MUNICIPAL, FILE NO.- M1W-1, PROCEEDING NO.- 51, MAY-1905

[49] MUNICIPAL, FILE NO.- M3-L/3/7, PROCEEDING NO.-3, MAY-1900

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই জমি কিনে মিউনিসিপ্যালিটি আরেকটি রিজার্ভার স্থাপনের ব্যবস্থা করে।[50]

এরপরে আরও একটি দাবি ওঠে মিনিসিপ্যালিটি কর্তৃক সরবরাহিত জলের গুণগত মানোন্নয়নকে কেন্দ্র করে। ভাগলপুর ডিভিশনের কমিশনার বলেন মাইক্রো অর্গানিজম যুক্ত ফিল্মের মাধ্যমে জল পরিশোধন করলে দার্জিলিং-এর জল পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব হবে।[51] কিন্তু দার্জিলিং-এর কমিশনাররা বা স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার সিল্ক , কেউই এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানান না। কমিশনাররা বলেন, ঝর্ণার জল যেহেতু পতিত হবার পর কিছুটা পথ মাটি পেরিয়ে আসে তাই প্রাকৃতিক ভাবে জল পরিশোধিত হয়ে যায়।[52] সিল্ক বলেন, দার্জিলিং-এ জল পরিশোধন করতে তিনটি ফিল্টার ব্যবহৃত হয়। আর এখানে প্রচণ্ড গতিতে জল আছড়ে পড়ে এবং এখানে উষ্ণতা খুব কম। তাই সহজে লার্ভা জন্মাতে পারে না।[53]

সিল্ক এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন-- হিল স্টেশন হিসেবে দার্জিলিং-এর গুরুত্ব কমে যাওয়া। তিনি বলেন দার্জিলিং-এর জল সরবরাহ প্রকল্পে আরও বেশি খরচ করলে জল করের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এমনিতেই অন্যান্য হিল স্টেশনের তুলনায় দার্জিলিং-এ খরচ অনেক বেশি। তিনি মুসৌরি এবং সিমলা হিল স্টেশন ঘুরে এসে, সেখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং জলের ব্যবহার দেখে যথেষ্ট আপ্লুত। তিনি বলেন সিমলায় ৪০০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। জনসংখ্যা আনুমানিক ৩০০০০। সেখানে দার্জিলিং-এ ৩০৯৬০ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। সুতরাং কোনও মতেই একে কম বলা যায় না।[54]

---

[50] MUNICIPAL, FILE NO.- M1W-1/9, PROCEEDING NO.-42, MARCH-1903

[51] MUNICIPAL, FILE NO.-173/8, PROCEEDING NO.-71, JUNE-1907

[52] MUNICIPAL, FILE NO.- 173/8, PROCEEDING NO.73,   OCTOBER-1907

[53] MUNICIPAL, FILE NO.- 173/8, PROCEEDING NO.72,   OCTOBER-1907

[54] MUNICIPAL, FILE NO.- 1-W/1, PROCEEDING NO.10-11,   MAY-1901

সিল্ক, দার্জিলিং-এ বসবাসের খরচ বেড়ে গেলে হিল স্টেশন হিসেবে সে তার গুরুত্ব হারাবে, এই বিষয়ে সতর্ক বাণী দিচ্ছেন বিশ শতকের প্রথম দিকে। এই সময়টাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। রেলপথ বেশ প্রসারিত হয়েছে; সুতরাং যে কোনও হিল স্টেশনে সাহেবরা গ্রীষ্মকালে থাকতেই পারেন। এক্ষেত্রে সস্তার হিল স্টেশন খুব স্বাভাবিক ভাবেই বেশি মানুষকে আকর্ষণ করবে।

দার্জিলিং-এর জল সরবরাহ ব্যবস্থা এমনই একটি বিষয়, যার নিষ্পত্তি এখনও অবধি হয়নি। কিছু কিছু সমস্যা আছে যেগুলি একান্ত ভাবেই এখানকার নিজস্ব সমস্যা। যেমন: ঝর্ণার জল শুকিয়ে যাওয়া, পাহাড়ি চড়াই-উতরাই-এর কারণে জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা, ইত্যাদি। আর এখানেই দার্জিলিং-এর জল সরবরাহ প্রকল্প নিয়ে আলোচনার যৌক্তিকতা। দার্জিলিং একদিকে নতুন তৈরি শহর হিসেবে সম্ভাবনার জন্ম দিল, এবং অন্যদিকে, সামগ্রিক বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি পরিষেবার প্রচলিত ধারায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি করল। বৈচিত্র্যের কোলাজ আরও সুদৃঢ় হল।

ব্রিটিশদের গ্রীষ্মকালীন আবাস, পর্যটক আর চা বাগানের মালিকদের প্রয়োজনে মূলত তৈরি হওয়া দার্জিলিং শহরের নাগরিক জীবনও তাই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির থেকে আলাদা। স্থানীয় মানুষজনের কাছে দার্জিলিং শহর কাজের সুযোগের জায়গা ছাড়া বেশি কিছু নয়। পরিমল ভট্টাচার্য উনিশশো নয়ের দশকে দার্জিলিং শহরে শিক্ষকতা করতে গিয়ে এই একই বিষয় লক্ষ করেছেন। তাঁর স্মৃতিকথায় দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী গ্রামে থাকা এক ছাত্রের সঙ্গে বেশ নিবিড় ভাবে মেশার সুযোগ পান। তিনি ছাত্রটির বাড়িতে এক রাত্রি অতিথি হিসেবে কাটিয়েও আসেন। সন্ধ্যাকালীন ঘরোয়া মজলিশে আগুনের চারপাশে গান-বাজনা আর টুকটাক আড্ডায় বেশ ভালোই কাটান সন্ধেটা। সেখানে তিনি হাল্কা কথাবার্তায় বুঝতে পারেন বৃদ্ধরা গ্রামকে কেন্দ্র করে জীবন কাটালেও তরুণরা শহরমুখী। আবার আর একটি দরিদ্র পরিবারের কথাও

ব্যক্তিগত ভাবে জানেন, যারা গ্রামে বাড়িঘর বিক্রি করে দার্জিলিং শহরে এসে ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেছে। কারণ শহরে কাজের সুযোগ, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি।[55] তাও পরিমলবাবু যখন দার্জিলিং-এ গেছেন শিক্ষার প্রসারের ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অবস্থার খানিক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষের দিক, বিশ শতকের শুরুর দিক তখন দার্জিলিং-এর স্থানীয় বাসিন্দারা চা-বাগানের কুলি, হোটেলের ওয়েটার বা সাহেবসুবো- বড় লোক বাঙালিবাবুদের গৃহস্থালির কাজ করতেই অভ্যস্ত। যাঁদের মধ্যে কোনও কোনও পরিবারের পুরুষ সদস্য অবশ্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, এদের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে খানিকটা ভাল। সুতরাং এই শহরে পৌর নাগরিকতার ধরন দক্ষিণ বঙ্গের শহরগুলির থেকে আলাদা তো হবেই। ঔপনিবেশিক স্বার্থেই যে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত হয়েছে, দার্জিলিং-এ স্থানীয় বাসিন্দাদের নীরবতা সেই বিষয়টি আরও প্রকট ভাবে তুলে ধরেছে। সুতরাং সার্বিক ভাবে ঔপনিবেশিক বাংলার পৌর নাগরিকতার ধরন সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে, দার্জিলিং শহরের মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা আমাদের অনেকটা সাহায্য করে।

[55] Parimal Bhattacharya, *No Path in Darjeeling is Straight Memories of a Hill Town, p-28*

উপসংহার

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের ঠিক সপ্তাহ খানেকের মধ্যে একটা ছবি ফেসবুক-সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নির্বাচনী প্রচারের একটি পোস্টার। পাশের দোকানে লেখা ঠিকানা থেকে দেখা যাচ্ছে, এলাকাটির পিন কোড কলকাতা-২৩। অর্থাৎ খিদিরপুর সংলগ্ন অঞ্চলের কোনও একটি জায়গা। নির্বাচনী প্রচারের পোস্টারে দেখা যাচ্ছে ভোটপ্রার্থীর জোড়হস্ত ছবি। তার সঙ্গে লেখা আছে "৫০ বছরের সমস্যা এই অঞ্চলে বর্ষার জল জমা। সেই দুর্ভোগ থেকে এই বার মুক্তি ৪৩ কোটি টাকার ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় হল ভোটের ফল প্রকাশের পরে দেখা যাচ্ছে কয়েক দফা বৃষ্টির পরে এই পোস্টারটিই নদীর মতো জলমগ্ন রাস্তায় প্রায় ভাসমান অবস্থায় বিরাজমান। এরপর বাঙালি নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে এই ছবিটির এডিট কার্য শুরু করে। কখনও দেখা যায় 'টাইটানিক' সিনেমার সেই শেষ দৃশ্য। যেখানে জাহাজের ভগ্নাংশে নায়িকা, আটলান্টিক সমুদ্রর অতলান্ত জলে সেই ছিন্ন তরণী ধরে ভাসমান নায়ক। আবার কখনও দেখা যাচ্ছে বিরোধী দলের নেতারা সেই হাঁটু নিমজ্জিত জলে দাঁড়িয়ে আচমন-আহ্নিক ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করছেন।

এই ছবিটিতে বেশ কিছু বিষয় লক্ষ করার মতো। প্রথমত, বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে চাকরির প্রতিশ্রুতি, ডি.এ বৃদ্ধি, ইত্যাদি সর্বজনীন সর্ববঙ্গীয় সমস্যার বদলে জোর দেওয়া হচ্ছে নিতান্ত স্থানীয় কিছু সমস্যায়, যেগুলো হিসেব মতো কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল দায়িত্বাবলীর মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয়ত, খিদিরপুর অঞ্চলটিতে প্রায় ৫০ বছর ধরে বর্ষার জল জমে থাকে। এর অর্থ হয়তো, পঞ্চাশ বছর আগে অঞ্চলটিতে এই রকম জমা জলের সমস্যা ছিল না। তৃতীয়ত, ভোট প্রার্থী ঠিক এই অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থা সার্বিক ভাবে ঠিক করার কথা বলছেন না, বরং ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে এই জমা জল অপসারণের কথা বলছেন। চতুর্থ

বিষয়টিকে অবশ্য বেশি আমল না দেওয়াই ভালো। বাঙালি প্রায় যে কোনও বিষয় নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারে, তার নমুনা এটি। কিন্তু একে বাঙালির পৌর নাগরিকত্বের প্রতিফলন বললেও অবশ্য খুব ভুল ব্যাখ্যা হয় না।

কলকাতা শহরের জল জমার অমীমাংসিত অধ্যায় ও পৌর নাগরিকতার সমীকরণ

প্রথম সমস্যাটি নিয়েই বরং আলোচনা করা যাক, বিধানসভা নির্বাচনে একেবারে স্থানীয় একটি পৌর সমস্যাকে নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিকদের বৃহত্তর সর্ববঙ্গীয় ভোটদাতা না ভেবে বরং তাদের পৌর নাগরিকত্বের স্থানীয় আত্মপরিচয়ের বোধকে কাজে লাগান হচ্ছে। দ্বিতীয় সমস্যা হল এই অঞ্চলে জমা জলের সমস্যা ৫০ বছরের। তাহলে এর থেকে দু'টি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি-- হয় পঞ্চাশ বছর আগে এই অঞ্চলে কোনও বসতি ছিল না, তাই জমা জল কোনও রকম সমস্যার সৃষ্টি করত না; নতুবা পঞ্চাশ বছর আগে এই অঞ্চলে জল জমত না। আমরা যদি কলকাতার ইতিহাসের দিকে একটু তাকাই, তাহলেই দেখতে পাব, খিদিরপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপিত হয়েছে বহুদিন আগে। এখানে সিপাহি বিদ্রোহের পরে অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের নতুন আবাস গড়ে ওঠে--- এই ইতিহাস অল্প-বিস্তর আমাদের প্রত্যেকেরই জানা। তাহলে দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথাটিই ধরে নিতে হয়। এখানে পঞ্চাশ বছর আগে জল জমার সমস্যা বিশেষ একটা ছিল না। তার মানে তখন কোনও ভাবে জল নিষ্কাশিত হতে পারত। কলকাতা শহরের ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাস প্রসঙ্গে একটি বিষয় আলোচনা করেছিলাম। কলকাতা শহরের ভূমির স্বাভাবিক ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিন্যস্ত। গঙ্গা নদীর দিকে নয়, বরং তার উল্টো দিকে। তাই ড্রেনগুলিকেও সেই ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে শহরের নানা পরিবর্তন, (যেমন: পূর্ব দিকে শহরের থেকে বেশি উচ্চতায় ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস নির্মাণ বা পূর্ব দিকের নিচু অঞ্চলে যেখানে নিম্নভূমিতে শহরের জল গিয়ে জমা হোত সেখানে ফ্ল্যাট নির্মাণ)

জল নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করে। সুতরাং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের জমা জল নিষ্কাশনের সুরাহা করতে পাম্পের দ্বারা কৃত্রিম ড্রেনেজ সৃষ্টি করে, জমা জল অন্যত্র নিষ্কাশিত করা ছাড়া হয়ত আর বাস্তব সমাধান কিছু থাকছে না। এই নির্বাচনী পোস্টারটির সূত্র ধরে আমরা অনেকগুলি বাস্তব বিষয়, বিশেষত 'পৌর নাগরিকত্ব'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন করে অবগত হলাম। এই সমস্যাগুলির উৎস বা পৌর নাগরিকত্বের সূত্রপাতের অতীত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাটি দিশা দেখাতে পারে।

বর্তমান সমস্যার অতীত প্রেক্ষিত

গবেষণাটিতে দেখানোর চেষ্টা করেছি, জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণ এবং তার যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের গতিবিধি। ইউরোপে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিবর্তনের পথে একটা বিষয় ক্রমশ প্রমাণিত হয়ে গেছিল, রোগের চিকিৎসা বা সুস্বাস্থ্যের বিধান শুধুমাত্র দেহগত নয়। বরং এক্ষেত্রে প্রতিবেশের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এর সূত্র ধরে ইউরোপে প্রতিবেশের নতুন রূপদানের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। জল-আলো-বাতাসের সুষ্ঠু চলাচলের বিশদ ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়। এর কিছু পরে বিভিন্ন রোগের সূত্রপাত যে জলবাহিত জীবাণু দ্বারা সম্পন্ন হয়, বা জমা জল অনেক রোগ সৃষ্টি করে, এই বিষয়টি আবিষ্কৃত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে 'জল' বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং দূষিত জলের নিকাশ অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। Patrick Joyce(প্যাট্রিক জয়েস) যেমন দেখিয়েছেন, উদারনীতিবাদ প্রসূত ব্যক্তি-বস্তু-চিন্তাধারার স্বাধীন চলাচলের সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার্থে জলের চলাচলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতের মতো ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রোগে ক্রমশ পর্যুদস্ত ব্রিটিশরা আধিকারিকরা। কলেরা, ম্যালেরিয়া, অজানা জ্বরে অকাল মৃত্যুর শিকার হচ্ছিলেন তাঁরা। এই অবস্থায় ভারতের প্রতিবেশকেও পুনর্নির্মাণের প্রকল্প নেন তারা। 'জল' এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়। মহামারীর

আতঙ্কে বৎসরাধিককাল গৃহবন্দি থেকে রোগ মোকাবিলার বিভিন্ন পরিকাঠামোর গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা শুধু ওয়াকিবহাল বললে ভুল হবে, বরং পুরোদস্তুর সন্ত্রস্ত। মাস্ক, স্যানিটাইসারের নিত্য ব্যবহার, মানুষ যে এই রোগের বাহক তা জানার পর থেকে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা, কোনও স্থান বা দ্রব্যাদি পরিষ্কার রাখার বদলে 'স্যানিটাইজ' করার বিশেষ তাগিদ, আমাদের প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এত কিছু করেও ভাইরাসকে কব্জা করার মতো বিধান ঠিক এখনও আমাদের সামনে নেই। অন্ধকারে হাতড়ে চলেছি আমরা। সুতরাং এমতাবস্থায় প্রতিবেশকে পুনর্নির্মাণ করার গুরুত্ব এবং এই প্রকল্পের উৎস সন্ধান যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক; তা বোধ হয় সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

জল সরবরাহ প্রকল্প ও ড্রেন ব্যবস্থা বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে শহরগুলি চয়নের যৌক্তিকতা, তথ্য সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার সম্ভাবনা

এই রকম একটা সময়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণ এবং সেই কারণে তৈরি প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ড আলোচনার চেষ্টা করেছি গবেষণাটিতে। সঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করেছি এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে কেন্দ্র করে শহরবাসীর মধ্যে কী রকম ভাবে পৌর নাগরিক আত্মপরিচয় তৈরি হয়েছিল। মূলত বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশনের পরিষেবার মধ্যে দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে একাধিক শহর সম্বন্ধে আলোচনা করে বিষয়টির বৈচিত্র্যময় ব্যাপ্তি সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায়। শহরগুলি চয়নের ক্ষেত্রেও কিছু বিশেষ চিন্তা কাজ করেছে। যেমন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির জল সরবরাহের ক্ষেত্রে কলকাতা, বর্ধমান এবং বহরমপুর শহরকে নির্বাচন করার পিছনে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ ছিল। কলকাতা শহরে সর্বপ্রথম জল সরবরাহ প্রকল্প চালু হয়; তাই প্রারম্ভিক বাধা-বিপত্তি সম্পর্কে জানতে এবং সামগ্রিক ভাবে একটি নতুন কর্মকাণ্ড কীভাবে উপনিবেশে বাস্তবায়িত হল, সেটি এই

মহানগরকে কেন্দ্র করে অনেকটাই পরিস্ফুট হয়েছে। কলকাতা সম্পর্কে মূলত দ্বৈতীয়িক তথ্য সূত্রই ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর বর্ধমান শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প। ১৮৭০-এর দশক থেকে বর্ধমান জ্বরের প্রকোপ ব্রিটিশদের ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই বর্ধমান শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব পায়। বর্ধমান শহরের জল সরবরাহকে ঘিরে ঔপনিবেশিকদের তৎপরতা লক্ষ করার মতো। এরপর বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প। এই শহরটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায়, এখানের জল সরবরাহ প্রকল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে হিন্দুদের গঙ্গাজলের পবিত্রতার ধারণার সঙ্গে মেলবন্ধন করে জল সরবরাহ প্রকল্প স্থাপনের বিষয়টি আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আরও অন্যান্য জেলার জল সরবরাহ প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করা যেত। বিশেষ করে খরা অধ্যুষিত জেলাগুলি (যেমন: বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) সম্বন্ধে আলোচনা করলে জল সরবরাহ প্রকল্পের বৈচিত্র্যময় রূপটি আরও বেশি প্রকাশিত হত। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে নতুন করে গবেষণা করা যেতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গের জেলার সদর শহরগুলির ক্ষেত্রে নিকটবর্তী নদীর জল পরিশোধন করে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সারা বছর ধরে নদীগুলিতে জলের যথেষ্ট জোগান না থাকায় এবং নদীগুলিতে জল দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সার্বিক ভাবে প্রকল্পটি চাপের সম্মুখীন হয়। আমরা বর্ধমান শহর সম্পর্কে আলোচনা করার সময় দেখেছি বিশ শতকের গোড়ার দিকে বর্ধমান শহরের কমিশনাররা দামোদর নদীর জল কমে যাওয়ায় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে বেশ চাপের সম্মুখীন হন। অন্যদিকে বহরমপুর জল সরবরাহ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই লক্ষ করেছি, গঙ্গানদীর জল দূষণের কথা ভেবে শুরু থেকেই ঔপনিবেশিকরা মাটির নীচের জল সরবরাহ করার কথা চিন্তা করেছিলেন। যদিও স্থানীয় বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে শেষ পর্যন্ত গঙ্গানদীর জলই সরবরাহ করতে হয়। সুতরাং সার্বিক অবস্থা থেকে একটা বিষয় ক্রমশ বোঝা যাচ্ছিল যে, শহরে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে বিকল্প জলের উৎস সন্ধান আশু প্রয়োজন। কীভাবে এবং কোন্ সময় থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলার সদর

শহরগুলিতে, নদীর জলের বদলে ভূ-গর্ভস্থ জল সরবরাহ করা শুরু হল এই বিষয়টি নিয়েও অনুসন্ধান করা যেতে পারে পরবর্তী কোনও গবেষণায়। বর্ধমান বা বহরমপুর এই দু'টি শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প সম্পর্কে মূলত প্রাথমিক তথ্যের উপরেই নির্ভর করেছি। মূলত মিউনিসিপ্যাল, জুডিসিয়াল, পি.ডাব্লু.ডি-র ফাইলগুলি দেখেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা দু'টি শহরের জল সরবরাহ প্রকল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে বাধার সৃষ্টি করেছে। সূচিপত্রে এমন অনেক ফাইলের উল্লেখ আছে, যেগুলিতে জল সরবরাহ সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে অনেকগুলি ফাইল 'B' ফাইল। রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক স্বার্থে এগুলি ধ্বংস করা হয়েছে। সুতরাং আর্কাইভে প্রাপ্ত ছেঁড়া ছেঁড়া তথ্য জোড়া লাগানোর কাজটা এক্ষেত্রে বেশ কঠিন।

এবারে আসি দূষিত জল নিষ্কাশন প্রসঙ্গে। কলকাতা ও কৃষ্ণনগর সম্বন্ধে এক্ষেত্রে আলোচনা করেছি। কলকাতা শহরের ড্রেনগুলি কীভাবে বিন্যস্ত করা হবে, সেই বর্জ্য শেষ পর্যন্ত কোথায় নিষ্কাশিত করা হবে, বহু টালবাহানার পর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আজকেও যে কলকাতা শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থার চিরস্থায়ী সমাধান হয়নি সে কথা শুরুতেই আলোচনা করেছি। এরপর দক্ষিণবঙ্গের নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের ড্রেন ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, জলঙ্গি নদীর নাব্যতা এবং শহরের প্রচলিত জল নিষ্কাশনের খাল, মাঝে মাঝে ভরাট করে পুকুর হিসেবে অধিগ্রহণ এক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। এই বিষয়টি নিয়ে বিশদ গবেষণার সুযোগ আছে। জলঙ্গি নদীর নাব্যতা হ্রাস পরিবেশের ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে। কৃষ্ণনগর ছাড়াও অন্য আরও কয়েকটি শহরকে আলোচনার এক্তিয়ারে আনা যেত। সময়ের স্বল্পতা এবং সরকারি লকডাউন এক্ষেত্রে বাধ সেধেছে। তবে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে গবেষণা হতে পারে।

এরপর আলোচনা করেছি উত্তরবঙ্গের একেবারে পাহাড়ি শহর দার্জিলিং নিয়ে। মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার প্রকল্পগুলির বৈচিত্র্যময় বিভিন্নতা দেখাতে এই চয়ন। এখানকার

জল সরবরাহের উৎস, সরবরাহের পরিকাঠামোর বিন্যাস, চাহিদা সব কিছুই দক্ষিণবঙ্গের শহরগুলির থেকে আলাদা। ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাসেও একথা একই ভাবে প্রযোজ্য। দার্জিলিং-এর মতো একটি ব্যস্ত এবং জনপ্রিয় শৈলশহরে আজকেও 'জল' একটা বড় সমস্যা। এখনও হোটেলের জানলায় মধ্যরাত্রে দাঁড়ালে দেখা যায় একের পর এক পণ্যবাহী গাড়ি আসছে যাতে জ্যারিকেন, ছোট ছোট ট্যাঙ্ক ইত্যাদিতে শুধু ভর্তি জল। সেই গাড়িগুলি থেকে পাইপের মাধ্যমে জল ভরা হচ্ছে বিভিন্ন হোটেলের ছাদের ট্যাঙ্কে। দার্জিলিং শহরের জল সরবরাহ সংক্রান্ত পরিষেবা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যবহৃত ঝর্ণাগুলির জলের পরিমাণ কমে যাওয়া, নতুন ঝর্ণার সন্ধান, শীতকালে জলের জোগান একেবারে কমে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। জলের অপ্রতুলতা বিষয়টির বিভিন্ন প্রেক্ষিত নিয়ে, বিশেষত পরিবেশবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথক গবেষণাও হয়তে পারে।

প্রকল্পগুলি স্থাপনের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকরা কী ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল, বিভিন্ন জায়গার ভৌগোলিক অবস্থা, স্থানীয় চাহিদা, ঔপনিবেশিক শাসনগত গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে প্রকল্পগুলি সমরূপক হওয়ার বদলে কীভাবে এক বৈচিত্র্যের কোলাজ তৈরি করল, সেই বিষয়টি তুলে ধরার প্রচেষ্টা থেকেছে সমগ্র গবেষণায়। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয়ও এই গবেষণাটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তা হল শহরবাসীর মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এক বিশেষ ধরনের নাগরিক আত্মপরিচয়ের অস্তিত্ব, যাকে আমরা 'পৌর নাগরিকত্ব' বলে চিহ্নিত করেছি। মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার প্রকল্পের বৈচিত্র্যময় ব্যাপ্তির মতোই এর গড়ে ওঠাও জটিল এবং বহুমাত্রিক।

পৌর নাগরিকত্বের প্রকাশ

সুদীপ্ত কবিরাজ তাঁর 'Filth and the Public Sphere: Concepts and Practices about Space in Calcutta'- প্রবন্ধে বলেছেন সমাজে যখন সবাই বাস করে তখন সেখানে

সামাজিক নিয়ম, নিত্যদিনের জগৎ চালানোর জন্য যদি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন না থাকে, তাহলে ঠোকাঠুকি লাগতে বাধ্য। বক্তৃতা বা তাত্ত্বিক ভাবে নয়, বরং সমাজে বাস করার নিত্যদিনের অভ্যেসকে নিয়মের নিগড়ে বাঁধতে পারলে এই কাজ অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমে বুর্জোয়া সমাজ যেভাবে জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের চিত্র কল্পনা করেছিল, ঠিক সেই ভাবেই সমাজ পরিচালনার নিয়মগুলি তৈরি করেছিল। এক্ষেত্রে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। তাই দরিদ্রকে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বাধ্য রাখাই আধুনিক শহরের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।[1] এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে উপনিবেশের পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা তার 'সাবজেক্ট'-দের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল? বহুধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজ-ই বা কী রকম ভাবে একে গ্রহণ করেছিল, এটিও বেশ ভেবে দেখার মতো বিষয়।

ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ভারতে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে একটা বৈরিতামূলক বৈপরীত্য রচনা করেছিল, যেখানে শহরকে দেখানো হয়েছে অনেক বেশি যথাযথ নিয়মোচিত, স্বাস্থ্যকর, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ভাবে এগিয়ে থাকা এবং তাই 'সুসভ্য'। সেখানে গ্রামে নিয়মকানুনের বালাই নেই। আর এই কারণে, শহরকে যথাযথ ভাবে চালনা করতে কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মকানুনের দরকার ছিল। মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে ওঠে এই বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রয়োগ করার প্রতিষ্ঠান। নগরবাসীর জন্য কিছু অভ্যেস ঠিক করে দিয়ে, সেইগুলি নিয়ম মাফিক যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তার প্রতি নজরদারি চালানোই হয় ওঠে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ। প্রয়োজনে নতুন কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করে বা নিয়মকানুন তৈরি করে রাষ্ট্রও মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে তার ক্ষমতাশীল বিমূর্ত অস্তিত্বের কথা জানান দেয়।[2]

---

[1] Sudipta Kaviraj,'Filth and the Public Sphere: Concepts and Practices about Space in Calcutta', *Public Culture* 10(1), Duke University Press,1997, Page-83

[2]. Ibid,Page-85

মিউনিসিপ্যালিটি ক্রমশ রাষ্ট্রের ‘Disciplining’ প্রক্রিয়া জারি রাখার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে।

এখানে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডে তাত্ত্বিক দিক থেকে কয়েকটি বিষয় আমরা লক্ষ করতে পারছি। প্রথমত, শহর এবং গ্রামের মধ্যে একটা সচেতন পার্থক্যের রেখা রচনা করা। দ্বিতীয়ত শহরবাসীকে নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে রাখা। পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া সমাজ দরিদ্রদের নিজেদের ইচ্ছা খুব সুচারু ভাবে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতের প্রেক্ষাপটে কিন্তু ঠিক বুর্জোয়া বনাম দরিদ্র মডেল চলে না। সেখানে কী শুধু ‘প্রভু’ এবং ‘প্রজা’ এই (বি)সমীকরণই শেষ কথা ছিল? নাকি ‘প্রজা’-দের বহুস্তরকে এই মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ভাবে সম্বোধিত ও প্রভাবিত করেছিল? তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন, মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রের ‘Disciplining’ প্রক্রিয়া শহরবাসীকে কীভাবেই বা প্রভাবিত করেছিল?

আসলে সমগ্র গবেষণা জুড়ে এই প্রশ্নগুলিরই অবিরত উত্তর খোঁজার মাধ্যমে ‘পৌর নাগরিকতা’-র রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু একেবারে শেষ পর্বে এসে হয়তো এই প্রশ্নগুলির সরাসরি উত্তর দেওয়াটা খানিকটা জরুরি। তাহলে ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে শহরবাসী যেমন এক দিকে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে ভাবত, মতামত দিত, রাজনীতিতে অংশ নিত, কিম্বা সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হত, প্রয়োজনে বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিবিধানের চেষ্টায় সামিল হত; ঠিক সেভাবেই নিজের শহরের মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করেও ‘পৌর নাগরিকতার’ এক স্বতন্ত্র এক্তিয়ার গড়ে তুলেছিল, এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

প্রথমত, গ্রাম আর শহরের প্রাথমিক বিভেদ রচনা করার ঔপনিবেশিক প্রয়াস মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। মফস্বল শহরগুলির মিউনিসিপ্যালিটির প্রায় গায়ে লেগে থাকা গ্রামগুলির থেকে শহরকে আলাদা করার জন্য

বারবার শহরের সীমানা সুনির্দিষ্ট করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে।[3] এছাড়া আরও বর্ধমান শহরের একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় মিউনিসিপ্যালিটির নাগরিকবৃন্দ পার্শ্ববর্তী গ্রামের সঙ্গে প্রায় লড়াই করে নিজেদের মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক স্বতন্ত্র 'পৌর নাগরিকত্ব'-এর স্পষ্ট প্রমাণ রেখেছিলেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে দেখা যায় বাঁকা নামক যে জলখাতের মাধ্যমে দামোদর নদীর জল বর্ধমান শহরে এসে পৌঁছতো তাতে জল প্রবাহ খুব কমে গেছে। ফলে শহর জুড়ে দেখা দিয়েছে জল সঙ্কট। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে জুজুটি গ্রামে দামোদর এবং বাঁকার মধ্যে যে জলের লকগেট আছে সেই অঞ্চলের আর একটু আগে বাঁকার পশ্চিম পাড়ের গ্রামগুলি বাঁকায় আরেকটি বাঁধ দিয়েছে। ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপিল করলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঐ গ্রামের বাঁধগুলি ভাঙার নির্দেশ দেন। এতে বাঁকায় জলপ্রবাহের কিছুটা উন্নতি হয়। সুতরাং যে নাগরিক দৈনন্দিনতায় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ তার শহুরে প্রজাদের অভ্যস্ত করতে চেয়েছিল, তা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হলে গ্রাম শহরে বৈরিতা প্রকট হয়ে ওঠে। প্রকাশিত হয় পৌর নাগরিকত্বের অস্তিত্ব।

দ্বিতীয় ভাববার মতো বিষয়টি হল, ভারতের মতো উপনিবেশে বহুধা বিভক্ত সমাজে মিউনিসিপ্যালিটি কীভাবে তার প্রভু-প্রজা (বি)সমীকরণটি বজায় রেখেছিল। এই প্রক্রিয়ায় 'পৌর নাগরিকতা'-ই বা কীভাবে প্রকাশিত হয়। ভারতের সমাজ বহুস্তরীয় এবং জটিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে শুধু শ্রেণির সাপেক্ষে সমাজকে ব্যাখ্যা করলেই সবটা বোঝা যায় না। ধর্ম, বর্ণের ব্যবধানও সমাজে প্রকট। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির প্রকল্পগুলির পরিষেবা এই বহুধা বিভক্ত সমাজে কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল এবং শহরের সমাজ কীভাবেই বা তাকে গ্রহণ করেছিল এই ব্যাপারটি সম্পর্কে ধারণা পেলে আমরা 'পৌর নাগরিকতা'-র বৈচিত্র্যময় স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পাব।

3

বর্ধমান শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প নিয়ে আলোচনার শুরুতেই দেখিয়েছি এখানে জল সরবরাহের মেইন পাইপ বড়বাজার-এ বিন্যস্ত হয় এবং সেখান থেকে সার্ভিস পাইপের মাধ্যমে শহরের অন্যত্র জল পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ, জলসরবরাহ ব্যবস্থাটি ছিল বড়বাজার অঞ্চলকেন্দ্রিক। বড়বাজার অঞ্চল মেইন পাইপের সন্নিকটে হওয়ায় এখানে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জলের ফোর্স বেশি থাকত। মেইন পাইপ থেকে সার্ভিস পাইপগুলি যত দূরবর্তী স্থানে ছিল, জলের গতিজাড্যের স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে জলের ফোর্স কম হত। বড়বাজার অঞ্চলটি ছিল ১৮৭০-এর দশকের বর্ধমানের একেবারে কেন্দ্রস্থল। বর্ধমান রাজবাড়ির দরবার মহল, অন্দরমহল, দেওয়ানি বাড়ি, চাঁদনিচক পেরিয়েই শুরু হচ্ছে বড়বাজার। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শহরের সম্পন্ন মানুষদের বসবাস। বর্তমানেও যদি আমরা এই অঞ্চলের পুরোনো বাড়ি এবং পরিবার থেকে এই অঞ্চলের বিন্যাস বোঝার চেষ্টা করি, তাহলেও বিষয়টা আমাদের সামনে পরিষ্কার হবে। উগ্রক্ষত্রিয় (যারা বাংলার বাইরে থেকে রাজাদের জমিদারিতে যোদ্ধা হিসেবে কাজ করতে আসেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বিস্তর স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হন), রাজাদের আত্মীয়, খুব বিশ্বস্ত, গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী এবং গ্রামে অনুপস্থিত শহরে বসবাসকারী জমিদার---এঁরাই মূলত রাজবাড়ি-বড়বাজার এলাকায় বসবাস করতেন। সুতরাং, মিউনিসিপ্যালিটি তার পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে শ্রেণি-বর্ণ ভিত্তিক বৈষম্যকেই প্রশ্রয় দিয়েছে, একথা বলাই যায়।

এরপর বর্ধমান শহরেরই আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কিছু নিয়মাবলী তৈরি হয়, যেখানে বর্ধিত হারে জলকর আদায়ের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই হারে জলকর দাঁড়ায়, মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে থাকা স্থাবর সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্যের প্রায় ৬ শতাংশ। অন্যদিকে, আবার এই নিয়মাবলীতে বলা ছিল যে, জলের কলের ১/৩ মাইল দূরবর্তী অঞ্চল থেকে জলকর আদায় করা যাবে না। এই দুই নিয়মের গেড়োয় বেশ ফাঁপরে পড়েন বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা। এই নিয়ে

মিউনিসিপ্যালিটিতে মিটিং-ও হয় বহু। প্রয়াগ লাল পাণ্ডে নামে ওয়ার্ড C-এর এক বাসিন্দা তাঁদের উপর ১৮৮৪-এর নতুন জলকর যাতে না চাপানো হয়, সে জন্য মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকে চিঠি লেখেন। তিনি লেখেন, এই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা খুবই গরিব। গৃহকর দিয়ে আরও অতিরিক্ত জলকর দেওয়া তাঁদের উপর অত্যাচারের সামিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকেই বলা হয় এই চিঠিতে যা লেখা আছে, তা সর্বৈব সত্য নয়। শেষ পর্যন্ত নিয়মটি বলবৎ হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বর্ণ বা বিত্ত ভেদে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ডকে ঘিরে শহরবাসীর নিজেদের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে বিভিন্নতার কণ্ঠস্বর। এই বিষয়টি 'পৌর-নাগরিকতা'-র জটিল সঞ্চারপথকেই তুলে ধরে।

এই বিষয়ে আরও কয়েকটি উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। কলকাতা বা বহরমপুর শহরে পাইপের মাধ্যমে গঙ্গা জল সরবরাহ করা কিন্তু নিতান্ত হিন্দুদের গ্রহণযোগ্যতা পেতেই করা হয়েছিল। এছাড়া দার্জিলিং শহরে সর্বত্র ঠিক ভাবে জল সরবরাহিত হচ্ছে কি না এ বিষয়ে বার বার অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু এই অনুসন্ধান ছিল সবটাই ঔপনিবেশিক প্রভুদের আবাস-তথা স্বার্থকেন্দ্রিক। এখানকার স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীরা নিয়মিত পর্যাপ্ত জল পান কি না সেই বিষয়ে অনুসন্ধানের কোনও নথির অস্তিত্ব নেই। সুতরাং 'পৌর নাগরিকতা' বলতে যে সব সময় নাগরিকদের একটা যূথবদ্ধ কণ্ঠস্বর এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। অনেক ক্ষেত্রেই একই শহরে বিভিন্ন রকম নাগরিক দাবি-দাওয়াও পৌর নাগরিকত্বের বহুধা বিস্তৃত সঞ্চারপথকেই চিহ্নিত করে।

তৃতীয় বিষয়টি হল মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার মাধ্যমে রাষ্ট্রের 'Disciplining' প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াও প্রকারান্তরে 'পৌর নাগরিকতা'-কে প্রকাশিত হওয়ার একটি সুযোগ করে দিয়েছিল। যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে বহরমপুরের জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণের অনুদানের ভার মহারানি স্বর্ণময়ী দেবী যখন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন,

এই শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প বর্ধমান বা আরার মতো ভাল করে তৈরি করতে হবে। সুতরাং নাগরিক জীবন যাপনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে পাইপের জলের হেজিমনি গঙ্গা তীরবর্তী একটি শহরও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছে। কারণ অন্যান্য শহরের দৃষ্টান্তে তারা এতটাই বিমোহিত। অন্যদিকে, বর্ধমান শহরে যখন নদীর জলের অপ্রতুলতার কারণে পাইপের মাধ্যমে যথেষ্ট জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না, তখন কিন্তু বার বার এই জল সরবরাহের পরিমাণ কীভাবে বাড়ানো যায় সেই নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, ওপর মহলে জানিয়েছেন, এবং শহরবাসীও তার পুরোনো জলের অভ্যেসে ফিরে যেতে পারেনি। এই সচেতন নতুন অভ্যেস তো একরকম ভাবে 'পৌর নাগরিকতার'-ই পরিচয়।

পৌর নাগরিক বিপিন চন্দ্র পাল তাই শহরে থাকার নানারকম 'সচেতন' প্রচেষ্টা এবং পদ্ধতির কথা মেনে নিচ্ছেন। আর *'বসন্তক'* যতই মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে ব্যঙ্গ করুক না কেন, এর অন্যতম প্রকাশক প্রাণনাথ দত্ত মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বর্জন করেননি। বরং তিনি মিউনিসিপ্যালিটির রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। তাঁকে দেখা গেছে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে করদাতাদের ভোটাধিকার দাবিতে আন্দোলন ও তাতে জয়লাভ করতে।[4] এরপরেই ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে টেম্পল সাহেব পুর আইনের সংশোধন করে সাধারণ নাগরিকদের ভোটাধিকার দেন। পৌর নাগরিকত্বের বিন্যাস তাই অতি জটিল।

ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিবর্তনের পথ পেরিয়ে সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বীকৃতি, প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণ, মিউনিসিপ্যালিটির নতুন দায়িত্ব নিয়ে নবরূপে প্রকাশ, এরপর ভারতেও প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণ ও স্বাস্থ্য সম্মত করে তাকে গড়ে তোলায় মিউনিসিপ্যালিটির অবতারণা, বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং ক্রমশ এই পরিষেবায় অভ্যস্ত হতে থাকা শহরবাসীর মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক এক নতুন আত্মপরিচয়

---

[4] বসন্তক, সংগ্রহ ও টীকা চণ্ডী লাহিড়ী, নিউ এজ পাব্লিশার্স, কলকাতা, পৃ-ঙ

‘পৌর নাগরিকতা’-র আত্মপ্রকাশ। এই গবেষণাটি মিউনিসিপ্যালিটির পরিকাঠামো নির্মাণের বৈচিত্র্য এবং ‘পৌর নাগরিকতা’-র জটিল, বিবিধ সঞ্চারপথকেই চিহ্নিত করেছে।

পৌর নাগরিকতা গঠনের এই বিবিধ, জটিল সঞ্চারপথকে আমরা উপনিবেশে ‘ঔপনবেশিক আধুনিকতা’-র বিস্তারের প্রেক্ষিতেও বোঝার চেষ্টা করতে পারি। যদি উপনিবেশে ‘আধুনিকতা’ বিস্তারের ঔপনিবেশিক প্রয়াসের একেবারে গোড়ার পর্যায়ে ফিরে যাই; ‘liberty’, ‘ব্যক্তিগত সম্পত্তি’-র অধিকারবিহীন প্রায় অসভ্য ‘uncivic’ একটি দেশকে ‘সভ্য’ এবং ‘আধুনিক’ করার ‘মহান’ লক্ষ্য নিয়ে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করলেন ব্রিটিশরা।[5] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের তরফ থেকে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির এইরকম একটি বৈধতা খাড়া করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আবার Tani. E. Barlow বা তাঁকে অনুসরণ করে আরও কিছু ঐতিহাসিক এই বিষয়টির অর্থনীতি নির্ভর ব্যাখ্যা উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মূলত বলতে চেয়েছেন, শিল্প-বিপ্লব, নগরায়ণ এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ধনতান্ত্রিক পুঁজির ছড়িয়ে পড়ার সূত্রেই আধুনিকতার পরশ এসে পৌঁছোয় উপনিবেশে ।

উপরের দুটি ব্যাখ্যাই ইউরোপের আধুনিকতা এবং উপনিবেশে তার ছড়িয়ে পড়ার একটি একমুখী সরলরৈখিক পথকে চিহ্নিত করেছে। পরবর্তীকালে যদিও উপনিবেশে এই আধুনিকতার ধরন নিয়ে বিভিন্ন মতামত উঠে এসেছে। উপনিবেশে ‘আধুনিকতা’ বিস্তারের এক জটিল বহুমাত্রিক রূপকেই সেখানে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিকরা। Prashant Kidambi তাঁর *Modernity and City in Colonial India* প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই শহরগুলিকে একটা ‘সভ্য’, ‘আধুনিক’ রূপ দেওয়ার ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা শুরু হয়। শহরই হয়ে ওঠে শাসনতান্ত্রিকতা প্রতিফলনের ক্ষেত্র। এই প্রকল্পে শহরকে শুধু বস্তুগত

[5] Souurabh Dube and Ishita Banerjee-Dube ed., *Unbecoming Modern Colonialism, Modernity and Colonial Modernities,* Sudipta Sen, ‘Uncertain Dominance: The Colonial State and Its Contradictions, Routledge, London & Newyork, page-152

বা প্রাযুক্তিক দিক থেকে রূপান্তরিত অবয়ব দেওয়া হয় না, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ এমনকি শাসনতান্ত্রিক যৌক্তিকতা স্থাপনের ক্ষেত্র হিসাবেও নির্মাণ করা হয়। কিদাম্বির মতে, “The term ‘modernity’ may be said to refer not only to some material changes, i.e. industrial or print capitalism, or system of sewage or sanitation, but also to new institutional spaces, such as museums, public libraries, and voluntary associations, as well as new sensibilities, of individualism and bureaucratic rationality.” [6] Sunil Khilnani তাঁর ‘*The Idea of India* ‘ বইতে দেখিয়েছেন কিভাবে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী পর্যায়ে শহরগুলি ঔপনিবেশিকদের ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন, “Colonial urban planning and policies showed a more focused concern with defence, sanitation, order and above all the display of the new imperial power.”[7]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঔপনিবেশিক শহরের ‘আধুনিক’ নির্মাণে তার বাহ্যিক এবং অন্তরঙ্গে যে পরিবর্তনগুলি সূচিত হল তার মাধ্যমে শহরবাসী কতটা আধুনিক হয়ে উঠল?

একদল ঐতিহাসিক (Edmand Leach, S.N. Mukherjee, প্রমুখ) দাবি করেছেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের এই ‘আধুনিকতা’-র প্রকল্পে শুধু মাত্র সমাজের উঁচু শ্রেণির কতিপয় মানুষ সামিল হতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার পরশ পেয়ে আধুনিক হয়েছিলেন তারা।

অন্যদিকে Gyan Prakash দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিকদের এই ‘আধুনিকতা’-র প্রকল্পটি ছিল একটি ‘all powerful discourse within its totalizing discourse ‘. যা শহরবাসীকে

---

[6] Prashant Kidambi, *Modernity and city in colonial India,* https://egyankosh.ac.in

[7] Sunil Khilnani, *The Idea of India* , Penguin India, 2004, page- 87

একপ্রকার খাঁচাবন্দী করে রেখেছিল।[8] পার্থ চ্যাটার্জীর বক্তব্যও খানিকটা একইরকম। তিনি বলেছেন ঔপনিবেশিক আধিপত্য শহরে এতটাই বেশি ছিল যে, শহরবাসীর কোনও নিজস্ব 'agency' ছিল না।[9] তাই শহরের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষিত 'আধুনিক' শহরবাসীও একাত্ম বোধ করতে পারেননি। এইসব বক্তব্যে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা নির্মাণের সাফল্য সম্পর্কে কিছু সংশয় প্রকাশ পাচ্ছে।

ঔপনিবেশিক পরিসরে শহরবাসীকে একই রকম ভাবে দেখার এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে একই গত ফেলার ক্ষেত্রে, কিছু স্বাতন্ত্র্যের দাবি উঠে এসেছ কোনো কোনো ঐতিহাসিকের তরফ থেকে। তারা বলেছেন, ঔপনিবেশিক শহরে public sphere গড়ে ওঠা এবং এর প্রকৃতিকে পাশ্চাত্যের হবহু প্রতিচ্ছবি হিসেবে ধার্য করার মধ্যে যেমন ভুল থেকে যায়, ঠিক সেই রকমই ভুল থেকে যায় এই পরিবর্তনগুলির প্রতি নাগরিক প্রতিক্রিয়াকে একমুখী ভাবে চিহ্নিত করার মধ্যেও। Neeladri Bhattacharya বলেছেন, ভারতীয় public sphere কোনও ভাবে 'homogeneous' বা 'unitary space' নয়।[10] তাই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বহুমাত্রিকতার আভাস পেতে এই আধুনিকতা কীভাবে দেশীয় জনগণের গ্রহণ-বর্জন ও রাষ্ট্রের সঙ্গে জটিল সমীকরণের ভিত্তিতে নির্মিত হল তা বোঝা খুব দরকার। এই প্রসঙ্গে Sourav Dube-এর একটি বক্তব্য খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, আধুনিকতার মোড়কে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে একটা 'disciplinary' প্রয়াস ছিল একথা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু এর বিপরীত একটা প্রক্রিয়াও ছিল।যাদের ওপর ঔপনিবেশিক

---

[8] Gyan Prakash And Kevin M. Kruse ed., *The Spaces of The Modern City Imaginaries, Politics And Everyday life,* Princeton University Press, UK, 2008, page-7

[9] Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments Colonial And Postcolonial Histories, Princeton University Press, UK, 1993, Page-52

[10] Rajeev Bhargava & Helmut Riefeld (ed.), Civil Society, Public SpherevAnd Citizenship, Neeladri Bhattacharya, *Notes Towards a Conception of the Colonial Public,* Sage Publication, New Delhi – Thousand Oaks-mLondon, 1998

সরকারের আধুনিকতার এই 'disciplinary' প্রয়াস প্রযুক্ত হয়েছিল তারাও একে প্রভাবিত করেছিল। Sourav Dube-এর বক্তব্য ধার করে বললে দেশীয় জনতার ভূমিকা বিচার করে তাদের এক্ষেত্রে 'historical actors' এবং 'social actors' এই দুইয়ের তকমাই দিতে হয়। "... historical actors who have been active participants in proceses of modernity - social actors who have been both *subject* to these processes, but also *subjects* shaping these processes.[11] সুতরাং 'আধুনিক' হয়ে ওঠার দ্বিমুখী প্রক্রিয়ায় দেশীয় সাবজেক্টদের অংশগ্রহণের কিছুটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল এবং তারা নিজেদের মতো করে তাকে প্রভাবিত করেছিল সে কথা স্বীকার করতেই হবে। মিউনিসিপ্যালিটিতে অংশগ্রহণ অন্তত কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের বাতাবরণ তৈরি করেছিল। এর কার্যকারিতা ও নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করার মধ্যে দিয়ে আধুনিকতার পালাবদলে শহরবাসীও সক্রিয়ভাবে সামিল হচ্ছিল। সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক 'পৌর নাগরিকতা'। তাই এই 'পৌর নাগরিকতা'-র গড়ে ওঠাকে ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে সাবজেক্টদের 'আধুনিক' হয়ে ওঠার বহিঃপ্রকাশ হিসবেও দেখা যেতে পারে। শেষপর্যন্ত তাই 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা' নিছক উপনিবেশস্থাপনকারীর আধুনিকতা হয়ে থাকে না, 'উপনিবেশিত'ও সেখানে বড়ো ভূমিকা পালন করে।

[11] Souurabh Dube and Ishita Banerjee-Dube ed., *Unbecoming Modern Colonialism, Modernity and Colonial Modernities,* page-xi

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি

Anand Nikhil, 'Municipal Disconnect: On abject water and its urban infrastructures', *Ethnography* 13(4) 467-509, 2012

Annesley James, *Researches into the causes, nature and treatment of the more prevalent diseases of India and of warm climates generally,* 3rd edn, London, Longman & co.,1885,

Arnold David ,*' Colonising the body: State Medicine and Epidemic disease in Nineteenth Century India'*, University of California Press,1993,

Balfour Lady Betty, The History of Lord Lytton's Indian Administration, London: Longmans, 1899

Bhargava Rajeev & Helmut Riefeld (ed.), Civil Society, Public Sphere And Citizenship, Sage Publication, New Delhi –Thousand Oaks-mLondon, 1998

Bhattacharya Debraj, *Of Matters Modern and the Experience Of Modernity In Colonial and Postcolonial South Asia*, London, New York, Calcutta: Seagull, 2008.

Bhattacharya Parimal, *No Path in Darjeeling is Straight Memories of a Hill Town*, Speaking Tiger Publishing PVT. LTD., New Delhi, 2017

Buchanan .W.J , 'Notes on Old Darjeeling, Bengal Past And Present', *Journal of the Calcutta Historical Society*, Vol.II, October, No-6, 1907

Burchell, Graham et. Al(eds.), *The Faucoult Effect: Studies in Governmentality*, Chicago, University Of Chicago Press,1991.

Chakrabarty, Dipesh, 'Open Space/Public Place: Garbage, Modernity and India', *South Asia* XIV,no.1. 1991 (15-31)

Chakrabarty, Dipesh, *Provincialising Europe: Postcolonial Thought and Historacal Difference* , New Delhi, OUP, 2001

Chartier, Roger, *A History Of Private Life*, Cambridge Mass,Belknap Press Of Havard University Press, 1989

Chatterjee, Partha, *The text Of Power: Emerging Disciplines In Colonial Bengal*, Kolkata, Stree, 1993

Chatterjee, Partha, *The Black Hole Of Empire: History Of a Global Practice of Power*, Ranikhet Permanent Black,2013

Chatterjee Partha, The Nation and Its Fragments Colonial And Postcolonial Histories, Princeton University Press, UK, 1993

Clark W, *The Drainage Of Calcutta*, A Paper read at the Bengal Social Science Congrss, held at the Town Hall, Calcutta, on the 2nd February 1871, Calcutta, Thacker, Spink and Co., 1871,

Cohen William A, and Rayan Johnson, *Filth: Dirt, Disgust and Modern Life, Minneapolis*, University Of Minnesota Press, 2005

Corbin Alain, *The Foul And The Fragrant: Odor and The French Social Imagination*, Cambridge Mass, Havard University Press, 1986

Cunningham , Bissel,W, 'Between Fixity and Fantasy: Assesing The spatial Impact Of Colonial Urban dualism', *Journal Of Urban History 37*, no.-2,2011,

Datta Partha, 'How Modern Planning came to Calcutta', *Planning Perspectives* 28, no.1,2013

Deb Roy Rohan(Ed.), *Locating The Medical: Explorations in South Asian History*, New Delhi, OUp, 2018

Dube Ishita, Medicine , *Race And Liberalism in British Bengal, Symptoms Of Empire*, Abingdon, Routledge, 2010

Dube Sourabh and Ishita Banerjee-Dube ed., *Unbecoming Modern Colonialism, Modernity and Colonial Modernities,* Routledge, London & Newyork,

Foucault Michel, *Power: Essential Works Of Foucault 1954-1984,* The Birth Of Social Medicine, Penguin, UK,

Gandy Mathew, 'Rethinking urban metabolism: Water, space and the modern city', *City*, Vol-8, No.-3

Hamlin, Cristopher, *Public Health And Social Justice In The Age Of Chadwick, Britain, 1800-1854,* Cambridge, New york CUP, 1998

Harrison, Mark, *Climates And Constitution, Health, Race, Environment and British Imperialism, 1600-1850,* New Delhi, OUP, 1999

Harrison, Mark, *Public Health in British India, Anglo-Indian Preventive Medicine, 1859-1914,* Cambridge, CUP, 1994

Harvey, David, *Justice, Nature And Geography Of Differences*, Oxford (Blackwell), 1996

Jackson, Lee, *The Dirty Old London Victorian Fight Against Filth*, London, New haven, Yale University Press, 2014

Johnson, James, *The Influence Of Tropical climates On European Constitution, including original observations on the nature and treatment of the disease of Europeans on their return from Tropical climates*, 7th edn, London, John Churchil,1856

Jones, William, "The third anniversary discourse on the Hindus" in "*The Collected works of William Jones"* Garland Cannon ed., NYU Press, vol-3,

Joyce, Patrick, *The Rule Of Freedom: Liberalism And The Modern City, London*, Verso, 2003

Khilnani Sunil,*The Idea of India* , Penguin India, 2004,

Kidambi, Prashant, *Making Of An Indian Metropolis: Colonial Governance and Public Culture in Bombay 1890-1920*, Aldershot, Ashgate, 2007

Mukherjee, S.N, *Calcutta: Essay in Urban History, Calcutta*, Subarnarekha, 1993

Nair, Janaki, 'Beyond Nationalism,Modernity, Governance and New Urban History For India', *Urban History*36. No.-2, 2011

O'Malley, L.S.S. Bengal District Gazetteer, Calcutta, page-57, 1907,

Otter, Chris, 'Making Liberalism Durable: Vision And The Civility In The Late Victorian City', *Social History*, 27, No.-1, 2002

Otter, Chris, *Victorian Eye A Political History Of Light And Vision In Britain, 1800-1910*, Chicago, University Of Chicago Press,

Pande, Ishita, Medicine , *Race And Liberalism in British Bengal, Symptoms Of Empire*, Abingdon, Routledge, 2010

Petersen, Alan.R and Robin Burton, *Foucault, Health And Medicine*, London & New York, Routledge, 1997

Pirenne Henri, *Economic And Social History Of Medieval Europe*, London & New York, Routledge, 1936

Poovey, Mary, *Making a Social Body: British Cultural Formation, 1830-1864,* Chicago, University Of Chicago Press, 1995

Pradhan Queeny, *'Empire in the Hills: Simla, Darjeeling, Ootacamund, and Mount Abu, 1820-1920',*

Prakash, Gyan, 'Civil Society, Community And The Nation In Colonial India', *Entografica*,VI, No.1, 2002

Prakash Gyan And Kevin M. Kruse ed., *The Spaces of The Modern City Imaginaries, Politics And Everyday life,* Princeton University Press, UK, 2008

Ray, A, K, *A Short History Of Calcutta, Towns and Suburbs*, Calcutta ,Riddhi, 1982

Ray, Rajat Kanta, *Urban Roots Of Indian Nationalism: Pressure Groups And Conflict Of Interests In Calcutta City Politics, 1875-1939,* Vikas, 1979

Benjamin Ward Richardson, *Hygeia: A City Of Health,* LONDON, MACMILLAN, 1876

Samanta, Arabinda, *Living With Epidemics In Colonial Bengal: 1818-1945,* New Delhi, Manohar, 2017

Sennett, Richard, *Flesh And Stone: The Body And The City In Western Civilisation*, New York, W.W. Norton, 1994

Simms F.W, *Report on the Establishment of Water-Works to Supply the City of Calcutta,* Calcutta,

Military Orphan Press

Smith .David. B. , *Report on the Drainage and Conservancy of Calcutta*, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1869

Sreemani, Soumitra, *Anatomy Of A Colonial Town: Calcutta, 1756-1794,* Calcutta , Firma, 1994

সামন্ত অরবিন্দ, *রোগ রোগী রাষ্ট্র, মহামারীর নির্মাণ এবং বিনির্মাণ,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* ষষ্ঠ খণ্ড, , পৌষ ১৪১৭,বিশ্বভারতী

ব্যবহৃত পত্রপত্রিকা:

Bipin Chandra Pal, The Calcutta Municipal Gazette, Ed. By Arun Kumar Roy, Information & public Relation Department Kolkata Municipal Corporation, Kolkata, 2010

বসন্তক

https://www.ub.uniheidelberg.de/Englisch/fachinfo/suedasien/zeitschriften/bengali/overview.html

থেকে প্রাপ্ত

ব্যবহৃত অপ্রকাশিত গবেষণা:

Sengupta Kaustubh Mani, 'Planned Spaces, Intimate Places: Ordering A City And Creating A Neighbourhood In Colonial Calcutta', Centre For Historical Studies School Of Social Sciences, Jawaharlal Neheru University.

ব্যবহৃত ওয়েবসাইট:

1. Bandyopadhyay Ritajyoti, Intervention – "Why Do Empty Streets Threaten Democracy?"

https://antipodeonline.org/2020/06/25/empty-streets

2. Christopher Hamlin, Edwin Chadwick and the Engineers, 1842-1854: Systems and Antisystems in the Pipe-and-Brick Sewers War, Technology and Culture, Vol.33, No.4. (Oct, 1992), http://links.jstor.org/sici?sici=0040-165X%28199210%2933%3A4%3C680%3AECATE1%3E2.0.CO%3B2-A

3. Prashant Kidambi, *Modernity and city in colonial India,* https://egyankosh.ac.in

ব্যবহৃত আর্কাইভের নথিসমূহ:

JUDICIAL PROCEEDINGS, SEPTEMBER 1872, (WBSA)

MUNICIPAL,HEAD-A.COLL-3,FILE-3 , DEC 1885

MUNICIPAL,MUNICIPAL BRANCH, FILE :M1-W/12, OCTOBER 1893, (WBSA)

MUNICIPAL,MUNICIPAL BRANCH, FILE :M2-R/9, JANUARY 1898, (WBSA)

MUNICIPAL DEPARTMENT, , FILE NO.- M 1-W/3, , JANUARY,1903

MUNICIPAL,MUNICIPAL BRANCH, FILE :M1-W/6, JUNE 1903, (WBSA)

MUNICIPAL , BRANCH MUNICIPAL, M 22-A/22, NOVEMBER 1904, (WBSA)

MUNICIPAL DEPARTMENT, , FILE NO.- M 1-W/9, NOV 7,1894

MUNICIPAL DEPARTMENT, BRANCH MUNICIPAL, M 25-W/12, DECEMBEBER 1894,

MUNICIPAL DEPARTMENT, BRANCH MUNICIPAL, FILE NO.- 134 M, , JULY,1894,

MUNICIPAL DEPARTMENT, FILE NO.-M1-W/9,, JULY ,1894,

MUNICIPAL DEPARTMENT, FILE NO.-770, , JULY,1894,

MUNICIPAL DEPARTMENT, FILE NO.- M 1-W/5, MARCH,1897

GENERAL, BRANCH SANITATION, , MARCH 1869

MUNICIPAL DEPARTMENT, BRANCH SANITATION, COLL -4, FILE-4, , NOVEMBER -1881

MUNICIPAL DEPARTMENT, BRANCH SANITATION, COLL-3, FILE-6, JULY 1883

JUDICIAL PROCEEDINGS, JULY-1868

FINANCIAL PROCEEDINGS, BRANCH- MUNICIPAL, , JULY-1879

FIANCIAL DEPARTMENT,MUNICIPAL(MIS), COLL-8, , AUGUST-1878

MUNICIPAL, FILE-M3L-5 ,NOVEMBER-1892

JUDICIAL, BRANCH-MUNICIPAL , AUGUST-1876

FINANCIAL, BRANCH-MUNICIPAL, FILE-41, MARCH 1879

FINANCIAL, BRANCH-MUNICIPAL, JULY 1879

MUNICIPAL,FILE-M-1W-11 ,AUGUST-1893

MUNICIPAL,BRANCH-MUNICIPAL M-W-11/3,December- 1893

MUNICIPAL,FILE M1-W/4, , JANUARY 1896

MUNICIPAL, FILE M1-W/8, , JANUARY 1898

MUNICIPAL, FILE- M 1-W/8, , MAY 1898

MUNICIPAL, FILE- M1W-1, , MARCH,1903

MUNICIPAL, FILE M-2R-17, NOVEMBER 1899

MUNICIPAL, FILE-M1W-5, JULY 1904

MUNICIPAL, FILE NO.- M1W-1, MAY-1905

MUNICIPAL, FILE NO.- M3-L/3/7, MAY-1900

MUNICIPAL, FILE NO.- M1W-1/9, MARCH-1903

MUNICIPAL, FILE NO.-173/8, JUNE-1907

MUNICIPAL, FILE NO.- 17/5, , OCTOBER-1907